# নক্ষত্রের জাল

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

**কথাকলি**
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা ১৩৬৯

প্রকাশক :

প্রকাশচন্দ্র সিংহ

১ পঞ্চানন ঘোষ লেন

কলিকাতা ৯

মুদ্রক :

জিতেন্দ্রনাথ বসু

দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া

৩।১ মোহনবাগান লেন

কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ :

কুমার অজিত

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাঃ লিঃ

দাম : পাঁচ টাকা

'সিনেমা জগৎ' পত্রিকায় 'নক্ষত্রের জাল' ধারাবাহিকভাবে দেড় বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। বেশ কিছু চিঠি, এই রচনা সম্পর্কে পত্রিকা-দপ্তরে এসেছে, কিছু এসেছে আমার ঠিকানায়।

যাঁরা প্রশংসা করেছেন তাঁদের এই সুযোগে সকৃতজ্ঞ-ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর যাঁরা জানতে চেয়েছেন যে কাহিনীগুলো সত্য কি না, তাঁদের কাছে শুধু এইটুকুই নিবেদন করব, খাঁটি সোনা দিয়ে যেমন অলঙ্কার-নির্মাণ সম্ভব নয়, কিছু খাদ মেশাতেই হয়, জীবন সম্বন্ধেও তাই। তা ছাড়া our life is of mixed yarn, good and evil-ই কেবল নয়, real and fantastic woven together.

পরিশেষে একটা কথা শুধু উল্লেখ্য, কয়েকটি চরিত্রে নাম ধাম অপরিবর্তিত রেখেছি। অনিবার্য কারণে অন্য কয়েকটি চরিত্রে কাল্পনিক নামের মুখোস পরাতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি নামে, ধামে, আচারে বা আচরণে কারো সঙ্গে মিল হয়ে যায়, সেটা আকস্মিক বলে ধরে নিয়ে আমাকে কৈফিয়ৎ দেবার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবেন।

অলমতি বিস্তরেণ।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

## এই লেখকের ঃ

॥ উপন্যাস ॥

অন্যতমা
অন্য দিগন্ত
অবরোধ
অভিসারিকা
অভিষেক
আরাকান
ইরাবতী
উপকূল
ঋতুরঙ্গ
কস্তুরীমৃগ
তরঙ্গের পর
দূরের মালঞ্চ
নারী ও নগরী
পূর্বরাগ
বনকপোতী
মৃত্তিকার রং
মেঘলোকে
চন্দনবাঈ

॥ গল্প-গ্রন্থ ॥

চন্দনকুঙ্কুম
প্রজাপতি মন
পঞ্চরাগ
প্রান্তিক
মৃগশিরা
সপ্তকন্যার কাহিনী
সুরবাহার
স্বপ্নমঞ্জরী
শঙ্খলিপি
ছায়ানট ( যন্ত্রস্থ )

॥ উৎসর্গ ॥

আমার জীবনের সবচেয়ে কাছের

দুটি নক্ষত্র

তপতী ও কার্তিককে

ক্যাপটেনের চোখ থেকে বাইনোক্যুলারটা ধার করলাম।

সারা জাহাজের লোক এদিকের ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে। সার দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে রেলিং ধরে। এমন কি তুদিন ধরে কেবিনের যে তরুণীটি ক্রমান্বয়ে বমি করছিল, স্বামীর দেহে ভর দিয়ে সেও ইজি-চেয়ারে এসে বসেছে।

বাইনোক্যুলারটা চোখে দিতেই নজরে পড়ল। দিকচক্রবালে গাঢ় কাল রেখা। তরঙ্গের প্রান্তে তটের ইশারা।

রেঙ্গুন ছেড়েছি বৃহস্পতিবার। রবিবারের আগে জমি নজরে ঠেকার কথা নয়। বিস্মিত হলাম শনিবারের সকালে অথৈ জলের পারে স্থলের অস্পষ্ট রেখা দেখে। ক্যাপটেনকে জিজ্ঞাসা করলাম।

হেসে বললেন, বাংলাদেশ নয়, আন্দামান। অবশ্য এখান থেকে অনেক মাইল দূরে।

এ পথে বহুবার যাতায়াত করেছি। সমুদ্রের প্রতিটি আলোক-স্তম্ভ, প্রতিটি তরঙ্গ প্রায় চেনা। কোনবার আন্দামান চোখে পড়েনি। পড়ার কথাও নয়।

কিন্তু এ পথে আন্দামান?

পাইপ-চাপা মুখে ক্যাপটেন হাসলেন, পথ আমরা বদলেছি। সোজা পথে জাহাজ যাবে না।

এ কদিন ক্যাপটেনের সঙ্গে কিছু অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। সম্বল ছিল একটা পার্লোফোন আর কয়েকটা রেকর্ড। কিছু বিলিতী গানও ছিল। ইংরেজ বন্ধু আর বান্ধবীদের মনোরঞ্জনের জন্যে কিনেছিলাম।

ক্যাপটেন এক রেকর্ড দশবার করে শুনলেন। মাঝে মাঝে

পরিবেশ ভুলে ওয়ালজ্-এর ভঙ্গীতে ঘুরে নিলেন কয়েক পা। গুন গুন করে ভুল সুরে দু-এক কলি গাইলেন।

আসল কথাটা বললেন ডিনারের পর।

পাশাপাশি ডেক চেয়ারে বসে ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাসের তিরস্কার দেখছিলাম, আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, চ্যাটার্জী, কথাটা কিন্তু খুব গোপনীয়।

কি ব্যাপার? দু চোখে বিস্ময়ের দীপ জ্বেলে ফিরে চাইলাম।

সোজা পথে কিছু মাইন ফেলা হয়েছে, তাই জাহাজকে ঘুরে যেতে হচ্ছে।

বুঝলাম। ইওরোপে রক্তের হোলি খেলা শুরু হয়েছে। জমির শব নিয়ে শকুনি গৃধিনীর টানাটানি। এ রক্তমেঘ শুধু পশ্চিম দিগন্তেই সীমিত থাকবে না, ছড়িয়ে পড়বে আকাশে আকাশে। ইংরেজ উপনিবেশ আগলাবার প্রাণপণ প্রয়াসে ব্যস্ত। নৌ-শক্তিতে ইংরেজ দুর্ধর্ষ, অন্ততঃ তখনও পর্যন্ত, তাই সমুদ্রে সমুদ্রে বিষের কুম্ভ ফেলে রেখেছে। বিস্মৃত হয়েছে এ যুদ্ধের অঙ্গন অন্তরীক্ষ। বিমান-ভৃঙ্গারে তীব্র হলাহল যে কোন মুহূর্তে বর্ষিত হতে পারে।

আজ, এতদিন পরে ভাবি, সেদিন আন্দামানকে বাংলার তট-ভূমি ভাবার মধ্যে নিদারুণ ট্র্যাজেডি লুকানো ছিল। উত্তরকালে দ্বিধা-বিভক্ত বাংলার নিপীড়িত অদৃষ্ট-তাড়িত বাঙালীরা সুদূর আন্দামানের বুকেই নব উপনিবেশ স্থাপন করবে, তারই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

সাল উনিশশো চল্লিশ। বাংলা ভাষাকে ভালবাসি বটে, কিন্তু বাংলাদেশকে নয়। বাংলাদেশের সঙ্গে পরিচয়ও সামান্য। যোগসূত্রও ক্ষীণ।

বেশ কয়েক বছর অন্তর কয়েকদিনের জন্য আসি। আত্মীয়-

পরিজনের সঙ্গে দেখা করতেই সময় কেটে যায়। দেশটাকে নিবিড় করে জানার অবকাশ ঘটে না।

বাংলা ভাষার সঙ্গে প্রেম কিন্তু তারামৈত্রক পর্যায়ের।

বয়স বারোর বেশি নয়।

পড়া ছাড়া একমাত্র নেশা ঘুড়ি ওড়ানো। ঘুড়ি নয়, ওটা যেন আমার মন। ইঁট, কাঠ, পাথর ছাড়িয়ে মেঘলোকে গিয়ে ওঠে। বাতাসের ছোঁয়ায় অনুকম্পন শুরু হয়। আবার হঠাৎ সুতো ছিঁড়ে কোথায় উধাও হয়ে যায়। সুতোর জোর শক্ত হলে আর এক মনকে বেঁধে আনি।

কিন্তু এ শখও ছাড়তে হল।

একদিন বায়ুস্তরে ভাসমান রঙীন ঘুড়ি ধরতে গিয়ে একটি ছেলে অফিস ফেরত বাবার মোটরের সামনে গিয়ে পড়েছিল। ড্রাইভার ডবল ব্রেক টিপে তাকে বাঁচাল বটে, কিন্তু মরলাম আমি।

ঘুড়ি, সুতো, লাটাই সব বাবা নিজের আলমারিতে বন্ধ করলেন। আমি আশা ছাড়লাম না। সতর্ক প্রহরায় রইলাম। এমন কি হবে না, একদিন চাবির বাঁধনে বাঁধা থাকবে না তালাটি? আমার ঘুড়ি লাটাই পুনরুদ্ধারের কোন অসুবিধা হবে না?

তাই হল। প্রায় দিন পনের পর।

স্কুল ছুটি। পরীক্ষা শেষ। শুয়ে বসে সময় আর কাটে না। এ-ঘর ও-ঘর ঘোরাঘুরি করতে করতে চোখ গেল তালার দিকে। তালা খোলা। অভিভাবকরা ধারে-কাছে কোথাও নেই।

তিলমাত্র দেরী না করে আলমারির পাল্লা খুলে ফেললাম।

ঘুড়ি, লাটাই সব আছে, কিন্তু হাত বাড়াতে গিয়েই থেমে গেলাম। ঠিক ঘুড়ি লাটাইয়ের সামনে সারি সারি বাঁধানো বই।

বসে পড়লাম। একটার পর একটা বই নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলাম। গ্রন্থাবলী। বঙ্কিম, হেম, মাইকেল।

প্রথমে বঙ্কিমকে বগলদাবা করলাম। পাছে মা-র নজর পড়ে,

তাই চুপি চুপি বাগানে পেয়ারা গাছতলায় গিয়ে বসলাম। তারপর সময়ের খবর রাখিনি। প্রহরগুলো একটার পর একটা দ্রুত সরে গেছে। রোদের আলো ম্লান হয়ে আসতে খেয়াল হল। সামনে সুপারী গাছের দীর্ঘ ছায়া। নিথর, নিস্তব্ধ পুকুরের কালো জল।

উঠে পড়লাম। তারপর যন্ত্রণা শুরু হল। সারারাত ছটফটানি। এ-পাশ আর ও-পাশ। পাশবালিশ আঁকড়ে চোখ বোজবার চেষ্টা করতেই চোখের সামনে বিচিত্র সব দৃশ্য। গড় মান্দারণের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে দীর্ঘদেহী এক সৈনিক। জটাজুটধারী প্রদীপ্ত-লোচন ত্রিপুণ্ড্রকসজ্জিত কাপালিকের রোষ-কর্কশ কণ্ঠস্বর, কপাল-কুণ্ডলে! হিন্দু জগৎসিংহের সেবারতা মুসলমানী আয়েষা (এই বয়সে, এই যুগেও কল্পনা করতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। বঙ্কিম-চন্দ্রের কি দুঃসাহসিকতা!) সন্তরণরত প্রতাপের মধু কণ্ঠস্বর, 'শৈবলিনী, শৈ!'

অনেক সময় ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বসেছি বিছানার ওপর। কপালে ঘামের মুক্তা। পিপাসায় তালু শুকিয়ে কাঠ। নবকুমারের মতন অদৃশ্য কাপালিককে বলতে ইচ্ছা হয়েছে, পানিয়ং দেহি মে।

ধরা পড়লাম চারদিন পর। বাবা বোধ হয় বই গুছোচ্ছিলেন, হঠাৎ বললেন, আমার বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর এক খণ্ড কোথায় গেল?

লক্ষ্য অবশ্য মা। যদি পড়বার জন্য নিয়ে থাকেন।

গ্রন্থাবলীটি ছিল আমার নতুন ধুতির ভাঁজে। এ কদিন কেবল ঠাঁই বদল করিয়েছি। কোন জায়গাই নিরাপদ মনে হয়নি। প্রথমে বিছানার তলায় রেখেছিলাম, তারপর মনে পড়েছে সকাল বিকেল বিছানা ঝাড়া মার একটা বাতিক। সেখান থেকে সরিয়ে নীচের ঘরে অব্যবহৃত ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু মনে খটকা লেগেছে। জগৎসিংহ, ওসমান, প্রতাপের মতন বীর চরিত্রকে এভাবে

ঝুড়ি চাপা দেওয়া শুধু অন্যায় নয়, অসম্মানজনক। তাই তুলে এনে সযত্নে ধুতির ভাঁজে রেখে দিয়েছিলাম।

বাবা আর একবার খোঁজ করতেই, বইটা বের করে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, অদৃষ্টে লাঞ্ছনা আছে।

বইটা তুমি নিয়েছিলে ?

ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলাম। গলা দিয়ে আওয়াজ বের হল না।

পড়েছ ?

আবার ঘাড় কাত করলাম।

ভাল লাগছে ? বুঝতে পেরেছ কিছু ?

এবার মুখ তুললাম। বাবার কণ্ঠস্বরও যেন বেশ মোলায়েম মনে হল। নাকি, ঝড়ের পূর্বাভাষ। প্রকৃতির থমথমে নিস্তব্ধতা।

সব বুঝতে পারিনি। যেটুকু পেরেছি, ভাল লেগেছে। খুব ভাল লেগেছে।

বেশ, এবার ভয়ে ভয়ে নয়, নির্ভয়ে পড়। আমার টেবিলে বসে। যেখানটা বুঝতে পারবে না, জিজ্ঞাসা করে নিও।

বঙ্কিম, মাইকেল, হেম শেষ হল। মাইকেলের সনেট আর হেমচন্দ্রের অনেক ব্যঙ্গ কবিতা কণ্ঠস্থও হয়ে গিয়েছিল। পিতৃবন্ধুদের সামনে মাঝে মাঝে আবৃত্তিও করতে হতো।

বিপদ ঘনাল এই সময়ে।

হঠাৎ কেমন করে মনে হল, এত যখন পড়া গেল, তখন একটু আধটু লিখতে কি দোষ !

কিছুই দোষ নয়। গঙ্গামাটি রঙের কাগজ, রঙীন সুতো দিয়ে গাঁথলাম। এক্সসারসাইজ খাতার আকারে। বড় বড় করে বাংলা আর ইংরাজীতে নিজের নাম লিখলাম। বঙ্কিমচন্দ্র, হেম আর মাইকেল ঠিক কি রকম খাতায়, কি ভাবে লিখতেন, আদ্যোপান্ত গ্রন্থাবলী হাতড়েও জানতে পারা গেল না। তবু নিঃশঙ্কচিত্তে,

মৌলিকভাবে সাহিত্য-সাধনা শুরু করলাম। মিনিট কয়েক একটু দ্বিধা হয়েছিল। আমার অগণিত অদৃশ্য পাঠক-পাঠিকাদের আমি কি উপহার দেব, গদ্য না পদ্য ?

কিন্তু অবিলম্বে সে দ্বিধার নিষ্পত্তি হল। মাইকেলের শব্দ-লালিত্য, ঝঙ্কার, অনুপ্রাসে তখন শ্রবণ পূর্ণ। কবিতা দিয়েই শুরু করলাম।

আগুনের অস্তিত্ব চাপা থাকে না, অনতিবিলম্বে মটকায় গিয়ে ঠেকে। আমার ক্ষেত্রেও তাই হল।

সহপাঠিরা হাবে-ভাবে আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করল। কিছু একটা পরিবর্তন এসেছে আমার মধ্যে। টিফিনের সময় ক্লাশ ছাড়ি না। সামনে খাতা খুলে পেন্সিল কামড়ে ভাবাতুর চোখে সিলিং-এর দিকে চেয়ে মিল খুঁজি। মনের গোপন ইচ্ছা, আশ-পাশের সবাই জানুক, তাদের সঙ্গে এক ঘরে বসি বটে, এক শিক্ষকের কাছে পাঠও নিই, কিন্তু আমি তাদের অনেক ঊর্ধ্বে। নব নব প্রেরণায় আমি উন্মুখ, সৃষ্টির বেদনায় আমি অস্থির।

পৃথিবীর দৃশ্যমান প্রায় সব কিছুর ওপরেই কবিতা লিখে ফেললাম। ক্লাশের সঙ্গীরাও নিষ্কৃতি পেল না। কবিখ্যাতি ক্লাশের পরিধি পেরিয়ে বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল। অন্য অন্য ক্লাশ থেকে দু-একটা অর্ডার আসতে শুরু করল। সে ক্লাশের স্থূলতম কিংবা প্যাকাটি-লাঞ্ছিত দেহের অধিকারীকে উপলক্ষ করে কোন ব্যাঙ্গাত্মক রচনা।

তবুও সে শুধু কবিতার স্ফুলিঙ্গ মাত্র। সর্বনাশ করলেন রবীন্দ্রনাথ।

সাল তারিখ কোনটাই মনে নেই। স্কুলে গিয়েই শুনলাম পরের দিন রবীন্দ্রনাথ স্কুলে আসবেন।

রবীন্দ্রনাথ। 'সার্থক জনম আমার' আর 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে'র রচয়িতা। যাঁরা মায়াদণ্ডের স্পর্শে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল, সেই ঋষিকল্প কবি!

বাড়িতে গিয়েই আব্দার ধরলাম, ধুতি পরে কাল স্কুলে যাব মা।

মা অবাক, ধুতি পরবি কেন রে ?

বললাম, স্কুলে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসবেন। খবর পেয়েছিলাম জাভা যাবার পথে তিনি রেঙ্গুন ছুঁয়ে যাবেন। বাড়তি হিসেবে সেটুকুও মাকে জানালাম।

মা বললেন, তাতে কি হয়েছে ? কাপড় তো ভাল করে পরতে পারবি না। পথে ঘাটে হোঁচট খেয়ে মরবি। তার চেয়ে ভেলভেটের প্যাণ্ট বের করে দিচ্ছি, তাই পর।

ঘাড় নাড়লাম, উঁহু, কাপড় ছাড়া কিছু পরা চলবে না।

মনে মনে ভাবলাম, যিনি লিখেছেন, 'ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারই উত্তরীয়', তাঁর সামনে কখনও পরের পোশাকে সেজে দাঁড়ান যায় !

নিজের চেষ্টায় ধুতি পরেছি। কাছা আর কোঁচার মধ্যে সমতা রাখা সম্ভব হয়নি। কোঁচা হাঁটুর কয়েক ইঞ্চি মাত্র নীচে গিয়ে পৌঁছেছে, আর কাছাটাকে পাকিয়ে পাকিয়ে প্রায় স্কিপিং রোপ করে তুলেছি। পাছে খুলে যায়।

স্কুল শুরু হবার বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে গিয়ে পৌঁছলাম। ক্লাশে মন বসল না। কেবল আড়চোখে বড় ঘড়িটার দিকে দেখছি।

মেয়েরা শাঁখ নিয়ে তৈরি। অনেকের হাতে ফুলের মালা, থালার ওপর খৈ। কবিগুরুর আসার পথে ফুলের পাপড়ি আর খৈ ছড়িয়ে দেবে। আমার ছড়াবার কিছু নেই, বরং যত সময় এগিয়ে আসছে ছড়ানো মনটা গুটিয়ে নিচ্ছি। উৎসাহ, আগ্রহ আর কৌতূহল সংহত হচ্ছে একটি বিন্দুতে।

ফাঁকে ফাঁকে ছুটে গিয়ে বইটা খুলছি। ভেতরের পাতায় রবীন্দ্রনাথের আলেখ্য। করুণাকোমল নয়ন, তীক্ষ্ণ নাসা, সুঠাম শরীর। উত্তরকালে যাঁর দেহশ্রী দেখে মুগ্ধ হয়ে রমা রঁলা বলেছিলেন, Quielle Harmonie !

শাঁখের শব্দ হতেই তীরবেগে নীচে ছুটে গেলাম। কিন্তু বৃথা। সিঁড়িতে, চাতালে, ফুটপাথে কাতারে কাতারে লোক। শুধু আমাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকারাই নয়, পথ চলতি অজস্র লোক। সামনের মিশনারী স্কুলের ইংরেজ ছেলেমেয়ের দল। কয়েকজন পাদ্রীও রয়েছেন।

দুঃখে, হতাশায় হাত কামড়াতে ইচ্ছা হল। সাধারণ ছেলেদের তুলনায় মাথায় কিছু দীর্ঘই ছিলাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনা জানালাম, তাঁর যাদুদণ্ডের স্পর্শে যদি আরও ফিট দুয়েক লম্বা করে দিতে পারেন, তাহলে এই জনারণ্যের ওপর দিয়ে চকিতের জন্যও একবার দেবদর্শন হতে পারত।

এক হাতে খাটো কোঁচা, অন্য হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত বড় কাছা সামলাতে সামলাতে হল ঘরে নেমে এলাম।

হল ভর্তি। একেবারে সামনে সতরঞ্চ পাতা। সেখানে ছোট ছেলে-মেয়েরা বসেছে। সেখানে বসলে সম্মানের হানি হবার ষোল আনা সম্ভাবনা, অথচ পিছনে দাঁড়ালে কিছু দেখতে পাব এমন ভরসা কম। মন ঠিক করে সতরঞ্চের একপাশেই বসে পড়লাম। নীচু ক্লাশের ছেলেমেয়েদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।

স্টেজের দিকে চোখ তুলে চাইলাম। অনেকক্ষণ আর চোখ নামাতে পারলাম না।

মরালশুভ্র কুঞ্চিত কেশরাশি, আবক্ষলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু, তুষার-ধবল অঙ্গাবরণ। গলায় রজনীগন্ধার মালা। করুণামেদুর দুটি চোখে ক্লান্তির ছাপ। সম্ভবতঃ সমুদ্রযাত্রার পরিশ্রম জনিত। আতপ্ত-কাঞ্চন বর্ণ। দুটো হাত কোলের ওপর জড় করে অনেক দূরের কি যেন দেখছেন।

সঙ্গে আর কারা ছিলেন স্মরণ নেই। হয়তো সুনীতিবাবু, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। আমি তখন কেবল মিলিয়ে দেখছি। বইয়ের পাতার ছবির সঙ্গে সামনে বসা মানুষটার। ভাবছি, ইনিই

লিখেছেন, বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়। শুধু বিপদত্রাণের অভয় মন্ত্রই নয়, তাঁর লেখনীতে জেগেছে দুর্বার বেদুইনের মরুযাত্রার গান। আবার লঘু সুরে বলেছেন পুরাতন ভৃত্যের আত্মত্যাগের অশ্রুসজল কাহিনী, মাটিচ্যুত মানুষের রিক্ত গাথা, দুর্গেশ দুমরাজের মহান উপকথা।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার মতন তাঁরই গান দিয়ে তাঁকে বরণ করা হল। মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে গাইল, 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী! অয়ি নির্মল সূর্য করোজ্জ্বল ধরণী, জনকজননী-জননী।'

একটু পরেই কবিগুরু বক্তৃতা দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

ঋজু দীর্ঘ শরীর। দুটো হাত পিছন দিকে। অল্প কাঁপা গলায় শুরু করলেন। সমুদ্রপীড়ায় সামান্য অসুস্থ, সে কথাও বললেন। কিন্তু একটু পরেই মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরে সারা হলঘর গম গম করে উঠল। সেদিনের বিষয়বস্তু খুঁটিয়ে বোঝবার বয়স ছিল না, মুগ্ধ হয়েছিলাম কণ্ঠলালিত্যে আর ভাষার সম্পদে। বাংলা ভাষা প্রায় বিমাতার ভাষা। সুযোগ সুবিধা করে বাংলা বই পড়ি। সব সময় সব জায়গার অর্থ বুঝি না, কিন্তু পড়া যে নিরর্থক হত না, অন্তরের তৃপ্তি দিয়েই তা বুঝতে পারতাম। কিন্তু সেদিন বুঝেছিলাম, সে ভাষা কত ঐশ্বর্যশালিনী, কত সমৃদ্ধা ভাবসম্পদে।

বক্তৃতা শেষ হতে চোখ ফেরাতেই দেখি আমাদের প্রধান শিক্ষক হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছেন।

কি ব্যাপার, স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ পরে দর্শকের আসনে বসে আছি, সেই জন্যই কি! উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম প্রধান শিক্ষকের পিছনে আরও অনেকগুলো ছাত্রছাত্রী সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাছে যেতেই বললেন, এমন সুযোগ আর পাবে না। যাও, প্রণাম করে এস।

বুকটা কেঁপে উঠল।

চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। একটা হাত গালের

ওপর। মর্মর মূর্তির মতন। অল্প হাওয়ায় শুধু মাঝে মাঝে মাথার দু-একগাছা কেশ আর আলখাল্লার প্রান্তটুকু কাঁপছে।

প্রণামের পালা শুরু হল। প্রধান শিক্ষক সঙ্গে রইলেন।

এমনিতেই বুকের দুরু দুরু অবস্থা। নীচু হয়ে অনেক চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের একটি মাত্র পা পেয়েছি, খুঁজছি বাকিটা, এমন সময়ে প্রধান শিক্ষক হেসে বললেন, এই আমাদের স্কুলের ছোট্ট কবি। ব্ল্যাকবোর্ড খালি থাকবার উপায় নেই এর জন্য।

রবীন্দ্রনাথ হাসলেন। স্মিত হাস্য। দুটো হাত আমার দু কাঁধের ওপর রেখে মধুঢালা কণ্ঠে বললেন, সর্বনাশ, এক আসরে দুজন কবি।

মাথা তুলতে পারলাম না। সেদিন মাথা তুললেই চোখের জল দেখে ফেলত সবাই। লজ্জায়, বেদনায়, আনন্দে না দুঃখে জানি না, কিন্তু সেই মহান পুরুষের সামনে দেহমন সঙ্কুচিত হয়ে এল। কেবল মনে হল, আমি তাঁর রাজীব চরণযুগল ছুঁতে পারি নি, কিন্তু তিনি আমায় ছুঁয়েছেন হাত দিয়ে, কথা দিয়ে।

সেই প্রথম দেখা, সেই শেষ।

আর একদিন দেখা করার সুযোগ এসেছিল, কিন্তু আমি দেখা করি নি।

অনেক বছর পরে।

কলকাতায়। অফিসে কাজ করছি। ফোন এল।

কে ?

আমি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। পবিত্রদা। শেষ দেখা দেখবি তো জোড়াসাঁকোয় চলে আয়।

কয়েকদিন থেকেই তিল তিল করে তৈরি করে নিচ্ছিলাম মনটা, কিন্তু এত সহজে সব কিছুর ইতি! মন বোঝে না। গীতার তত্ত্বকথায় অনাস্থা জাগে, অমোঘ পরিণতির কথাও মানতে চায় না।

তোমার বাঁধন খুলতে লাগে বেদন কী যে। গোটা দেশ আর

সমস্ত জাতটাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছেন, সুর দিয়ে, কথা দিয়ে, তুলি দিয়ে। সে বাঁধন ছাড়াতে গেলে মর্মমূলও ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মতন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে আপার চিৎপুর রোড ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। পথে অগনিত জনস্রোত। সারা নগরীর বুকে শোকের ম্লান ছায়া।

একটু এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম। অনেক বছর আগে বর্মায় দেখা সেই স্ফটিক-শুভ্র মূর্তি ভেসে উঠল মানসপটে। সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর, ছুটি চোখে স্বপ্নের মায়া-অঞ্জন।

সে কণ্ঠ মূক, তন্দ্রাতুর সে ছুটি নয়ন চির মুদিত, ভাবতেও বুকের মধ্যে মর্মন্তুদ বেদনা অনুভব করলাম।

আর এগোতে পারলাম না। ফিরে এলাম অফিসে। আমার দেখা সেই রাজ্যেশ্বর মূর্তিই অক্ষয় হয়ে থাক হৃদয়-মানসে। আজকের স্পন্দনহীন শব আমার অদেখা থাক, আক্ষেপ নেই।

নিজেরই অলক্ষে কখন যে রবীন্দ্রনাথের সেই পূত-শুভ্র মূর্তি আর বাংলা সাহিত্য একাত্ম হয়ে গেছে, জানি না। তাই আজও সাহিত্যে মালিন্য, পঙ্কিলতা, ক্লীবত্ব দেখলেই শিউরে উঠি, বেদনা অনুভব করি, কারণ আমার একবার মাত্র দেখা রবীন্দ্রনাথের শুচিশুভ্র ঋজু মহীয়ান চেহারার সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাই না।

সন সেই উনিশশো চল্লিশ-একচল্লিশ। বাংলাদেশে ফিরেছি।

কাজের মধ্যে খাওয়া আর খোলা ছাদ ডবলডেকারে বেড়ানো। সপ্তাহে বার দুয়েক এলিস সায়েবের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার মিস্টার এলিস।

ওকালতী সনদটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আশ্বাস দিলেন, ঠিক আছে, কলকাতার বারে এন্‌রোল্ড্‌ হতে কোন অসুবিধা হবে না। যথাসময়ে খবর যাবে।

অখণ্ড অবসর যখন রয়েছে, তখন সাহিত্য করতে আর বাধা কি। সাহিত্যের খুঁট আবার কুড়িয়ে নিলাম।

ইতিমধ্যে সাহিত্য একেবারে ছাড়িনি। ছাড়া যায়ও না।

মনে আছে বয়স তখন তেরো আর চোদ্দর মাঝামাঝি। রবীন্দ্রনাথের দর্শন পাবার পর থেকে কবিতার ঢল নামল। একটা খাতা শেষ, অন্য একটা খাতার অর্ধেকের বেশি ভরে গেছে।

মাইকেলের কবিতা যেন সঙ্কটময় গিরিশিখর। খুব সাবধানে পড়তে হয়, সংস্কৃতের গা-ঘেঁষা শব্দের সিঁড়ি বেয়ে খুব সতর্ক পদক্ষেপে চূড়োয় উঠতে হয়। সেই হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছায়াচ্ছন্ন শ্যামল উপত্যকা। সর্বদা আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয় না, ঢিলেঢালা হয়ে বিশ্রাম করা চলে। দূর্বাকোমল ঘাসের ওপর নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে।

সেই বয়সে মনে হয়েছিল মাইকেলের কাব্য যেন কাপালিক কিংবা চন্দ্রশেখরের ভাষা আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা নবকুমার আর প্রতাপের মনের কথার বাহক। ব্যঞ্জনাবহ কিন্তু কঠিন নয়, অন্তহীন স্বাদ কিন্তু দুরুশ্চার্য নয়।

সেই বয়সেই 'বৃক্ষবন্দনা' নামে একটি কবিতা রচনা করলাম, রাবীন্দ্রিক রীতিতে, অবশ্য সেই বয়সের চিন্তা এবং বুদ্ধির উপযোগী।

সহপাঠীরা তারিফ করল, দু একজন শিক্ষকও আধা-প্রশংসার বাণী দিলেন। বাড়িতে যিনি পড়াতেন তাঁকেও একবার দেখালাম। তিনি কবিতার চেয়েও আমার দিকে নজর দিলেন বেশি। তাঁর চোখের ভাষা বুঝতে অসুবিধা হল না। মুখে বললেন, এই সবই করছ বুঝি? যে সময়টা ছন্দ আর শব্দের ওপর ব্যাভিচারে নষ্ট করেছ, সেই সময়টায় অনায়াসেই গোটা কুড়ি অ্যালজেব্রা আর জিয়োমেট্রির দশটা থিয়োরেম করা চলত। এসব কবিতা এখন থাক। দুমাস গরমের ছুটি আছে, সেই সময় বরং এই সব বদ-খেয়ালের প্রশ্রয় দিও।

ঘাড় নীচু করে রইলাম। কোন কথা বলি নি। ভদ্রলোক পদার্থ বিজ্ঞানে এম. এসসি। কাজেই তাঁর কাছে আর সবই অপদার্থের প্রতীক।

কবিতাটি বুকে করে বেড়াতে লাগলাম। দু একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলল, কোন কাগজে পাঠিয়ে দে না।

কিন্তু কোন্ কাগজে পাঠাব? বাড়িতে তিনটি কাগজ আসে, মৌচাক, মুকুল আর খোকাখুকু। তিনটেই ছোটদের। আমার ধারণা কবিতাটি বড়দের উপযোগীই হয়েছে। অন্ততঃ ভাব আর ভাষার দিক দিয়ে। এ-জিনিস এসব কাগজে চলবে না।

মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। রাত্রে ঘুম নেই, খাওয়ার সময় প্রতিটি ব্যঞ্জন বিস্বাদ ঠেকে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরও শত্রু বলে মনে হয়। এত বড় একটা প্রতিভা অবহেলায়, উপেক্ষায় একপাশে পড়ে থাকবে, তার রচনা এমনই অনাদৃত হবে, অথচ কারুর একটু খেয়াল নেই।

অবশেষে যোগাযোগ ঘটল।

লিউস স্ট্রীটে বাংলা বইয়ের দোকান বিশ্বাস এণ্ড কোং। বইপত্র সবই এখান থেকেই কিনতাম। মাঝে মাঝে গিয়ে দাঁড়াতাম দোকানে। ঝকঝকে তকতকে মাসিক আর সাপ্তাহিকগুলোর ওপর চোখ বোলাতাম। প্রবাসী, দীপালী, খেয়ালী, চিত্রপঞ্জী।

সেখানেই খবর পেলাম এক কর্মচারীর কাছে।

জানো খোকা, রেঙ্গুন থেকে একটা পত্রিকা বেরোচ্ছে।

রেঙ্গুন থেকে?

হ্যাঁ, নাম 'ছাত্রসঙ্ঘ'। বি. এস. এ. (বেঙ্গলী স্টুডেণ্টস অ্যাসোসিয়েশন) থেকে।

তাই নাকি। আশ্চর্য তো। বি. এস. এ-র আমি মেম্বার। খেলাধুলো করি ওখানে। গতবারে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রাইজও পেয়েছি। সেখান থেকে পত্রিকা বের হচ্ছে, আর আমি কিছু জানি না।

রীতিমত অভিমান হল, কিন্তু এ অভিমান অন্তরে পুষে রাখলে নিজেরই ক্ষতি। পরের দিনই ভাল করে 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতাটি কপি করে, একটা খাতার মধ্যে নিয়ে ক্লাবে গিয়ে হাজির হলাম।

লাইব্রেরির পিছনে একটা টেবিলের দুপাশে দুটো চেয়ার। তার ওপর দুটি কলেজের ছাত্র। সামনে স্তূপীকৃত কাগজ নিয়ে কিসের আলোচনা করছে।

জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ওইটাই নাকি ছাত্রসঙ্ঘ পত্রিকার অফিস।

খাতা বগলে চেপে আস্তে আস্তে টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে কেউ আমলও দিল না। আলোচনা পুরোদমেই চলল।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে নকল কাশির শব্দ করলাম। কাজ হল। দুজনেই মুখ তুলে চাইল।

কি চাই?

জিভ দিয়ে শুকিয়ে আসা ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিলাম। আস্তে বললাম, একটা লেখা।

আওয়াজটা বোধহয় ওদের কানে যায় নি। চশমাপরা ছেলেটি একটু জোর গলায় বলল, কি চাই? লাইব্রেরি ওদিকে। এটা পত্রিকার অফিস।

সাহস করে আমিও গলা বাড়ালাম। বললাম, আমি 'ছাত্রসঙ্ঘ'-র জন্য একটি কবিতা এনেছি।

কবিতা? এবার দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল।

মনে মনে কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম ওদের বিস্ময়ের ভাব দেখে। খাতাটা খুলে আস্তে আস্তে কবিতাটি বের করে টেবিলের ওপর রাখলাম।

একজন কবিতাটি তুলে নিয়ে গুন গুন করে পড়ল, পড়ার ফাঁকে দু-একবার চেয়ে চেয়ে দেখল আমার দিকে, তারপর পাশের ছেলেটির কানে কানে ফিস ফিস করে কি বলল।

হঠাৎ যেন আমার দিকে নজর পড়েছে, এইভাবে বলল, ঠিক আছে। কবিতাটা থাক আমাদের কাছে। আমরা পড়ে দেখব।

এতক্ষণে আমি ভারমুক্ত হলাম। অজস্র পাঠকদের মাঝখানে নিজের লিপিবদ্ধ চিন্তাকে এতদিনে ছড়িয়ে দিতে পারলাম। কবিতাটা এভাবে নিজের কাছে চেপে রাখা কতখানি অন্যায় সেটা উপলব্ধি করতেও দেরী হল না। সুরভিই যদি বিতরণ করতে না পারল তো কুসুমের বিকশিত হওয়ার সার্থকতা কোথায়।

পরের দিনই খবরটা ক্লাশে জানাজানি হয়ে গেল। অর্থাৎ আমিই সকলকে এক এক করে আড়ালে ডেকে খবরটা দিলাম।

আমি নিজে লেখা নিয়ে দাঁড়িয়েছি 'ছাত্রসঙ্ঘ'-র দপ্তরে—এ কথা বলতে মন চাইল না। বললাম কর্মকর্তাদের একজন লাইব্রেরিতে আমাকে ধরেছে লেখার জন্য। কবিতা একটা দিতেই হবে। তাই একটা কবিতা দিয়েছি।

তোর কবিতা বের হবে ছাপার অক্ষরে! ক্লাশের দু-একজন যেন সন্দেহ প্রকাশ করল। অসীম উপেক্ষায় মুচকি হাসলাম। ভাবটা যেন, পরমপিতা, এদের ক্ষমা কর। এরা কি বলছে তা জানে না।

তারপর থেকে একদিন অন্তর বি. এস. এ. লাইব্রেরিতে যেতে আরম্ভ করলাম। বই নিয়ে বসি বটে, কিন্তু চোখ থাকে 'ছাত্রসঙ্ঘ'র দপ্তরের দিকে। সেই দুটি ছেলে আর স্তূপীকৃত কাগজ। মাঝে মাঝে আরও বড় কয়েকজনও আসা-যাওয়া করেন। কিন্তু আমার দিকে কেউ একবার ফিরেও চান না। কবিতা সম্বন্ধেও কোন কথা নয়।

ইতিমধ্যে আর এক ব্যাপার ঘটল।

বোধহয় বসে বসে 'সন্দেশ' পড়ছিলাম, পিছনে দীর্ঘকায় একটি ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি দেখলেন কে জানে, একটু পরে চেয়ার টেনে পাশে বসে পড়লেন।

আকাশে মেঘের সমারোহ। এ দেশের বর্ষা শুরু হয়েছে, দীর্ঘ

আটমাস পরমায়ু। লাইব্রেরি ঘরে ভীড় কম। এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটোনো কয়েকজন।

ভদ্রলোক সোজা আমার নাম ধরে ডাকলেন। বললেন, তুমি এসব বই পড় কেন? এসব বই পড়ে কি হবে?

গলার স্বরে চমকে উঠলাম। বাইরের মেঘের গুরু-গুরুর সঙ্গে এ কণ্ঠস্বরের যেন মিল রয়েছে।

হাতের বইটা উল্টে পাল্টে দেখলাম। কেন, কি দোষ করেছে বইটা? ভাল ভাল গল্প, মজার সব ছড়া থাকে এ বইতে।

ভদ্রলোক নিজের কোটের পকেট থেকে একটা ছোট বই বের করে সামনে রাখলেন। বললেন, এ বইটা পড়ে দেখ। এইসব বই পড়ার চেষ্টা করবে।

বইটার নাম "ব্যায়ামে বাঙালী"। মলাটের ওপর স্থূলকায় একটি লোকের চেহারা।

বইটা তুলে নিলাম। বই পড়তে আমার কোন বিতৃষ্ণা নেই। কোনদিন ছিল না, আজও নেই।

বললাম, বইটা কাল পড়া হয়ে যাবে। কাল এখানেই ফেরৎ দেব আপনাকে।

না, কাল নয়, ভদ্রলোক ঘাড় নাড়লেন, তুমি সামনের শনিবার ফেরৎ দিও। তার আগে আমার দেখা পাবে না। আর এখানে নয়। রয়াল লেকের ধারে সায়েবদের রোয়িং ক্লাবের সামনে আমি থাকব। বেলা চারটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত।

আশ্চর্য লাগল। ভদ্রলোকের কথার ভঙ্গী বেশ নাটকীয়। আর কথা বলবার সময় সারাক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। জ্বলন্ত চাউনি। আরও ছেলেবেলায় পড়া বঙ্কিমচন্দ্রের কাপালিকের কথা মনে পড়ে গেল। এ দৃষ্টি মানুষকে শুধু আকৃষ্টই নয়, সম্মোহিতও করে।

বাড়ি ফিরলাম। পড়ার বই-এর ফাঁকে ফাঁকে বইটা পড়লাম।

গোবর, শ্যামাকান্ত প্রভৃতি বাংলার বীর সন্তানদের কাহিনী। বিশেষ করে ভাল লাগল শ্যামাকান্তের খালি হাতে বাঘের সঙ্গে কুস্তি করার ঘটনাটা। শ্যামাকান্তের প্রতিকৃতিটা চোখ বুঁজলে এখনও দেখতে পাই। বাঘের ছালের ওপর উপবিষ্ট ঋজু সুগঠিত দেহ। তখন বুঝি তিনি শ্যামাকান্ত নন, সোহংস্বামী। উত্তরজীবনে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।

শনিবার একটু আগেই বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশন থেকে রয়াল লেক অনেক পথ। হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কাছে যেতেই নজরে পড়ল। গোটা পাঁচেক সাইকেল ঘাসের ওপর শোয়ানো অবস্থায়। একটা গাছের নীচে গোটা পাঁচ ছয় ছেলের জটলা।

আরও এগোতেই চিনতে পারলাম। আমাদের স্কুলেরই তিনজন, তার মধ্যে একজন আমার ক্লাশের। তাদের কাছে যাওয়া উচিত হবে কি না ভাববার আগেই সহপাঠী ডাকল।

তার পাশে গিয়ে বসলাম।

আশ্চর্য, কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না। কেন এসেছি এখানে, কার নির্দেশে, কোন কথা নয়। স্কুলের কথা বলল, দু একজন শিক্ষকের পঠন-পদ্ধতির কথা, কিছু খেলাধুলার কথাও হল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর খেয়াল হল, এতক্ষণে নিশ্চয় সাড়ে চারটে বেজে গেছে। অথচ সেই ভদ্রলোকের দেখা নেই। সঙ্গের দু-একজন অতিষ্ঠ হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বার বার রাস্তার দিকে দেখছিল, তাও লক্ষ্য করলাম।

রোদের ছায়া ম্লান হয়ে এল। পৌনাবস্তির দিকে দু-একটা বাতিও জ্বলে উঠল। এখন বাড়ির দিকে রওনা না হলে দেরী হয়ে যাবে ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ। সকলেই সচকিত হয়ে উঠলাম।

একটি বর্মী ছোকরা। বয়স সতেরো আঠারোর বেশি নয়। সাইকেলের পিছনে শুকনো কাঠের স্তূপ।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে একবার দেখে নিল সবাইকে, তারপর ভাঙা হিন্দীতে বলল, শেয়া মুখার্জি আসতে পারবেন না আজকে। অন্য কাজে আটকে পড়েছেন। আজ তোমরা যেতে পার। কবে, কখন দেখা হবে, পরে জানতে পারবে।

ফিরে এলাম। দীর্ঘ পথ ভাবতে ভাবতে এলাম। নানা বিচিত্র চিন্তা।

শেয়া মুখার্জি। সেদিনের দেখা ভদ্রলোকটি মুখার্জি। কিন্তু এতগুলো ছেলেকে কেন ডাকলেন এ ভাবে? সকলেই কি বই ফেরত দিতে এসেছিল? এভাবে সকলকে এক জায়গায় ডেকে বই ফেরত নেওয়ার একি অভিনব পদ্ধতি। বাঙালী ছাড়া একজন মত্র ছেলেও ছিল, আমাদেরই বয়সী।

সব মিলিয়ে বেশ একটু গা ছমছমানি ভাব। মনে হল ব্যাপারটা ঠিক সহজ, সরল নয়। কোথায় একটা সরীসৃপ-বাঁক রয়েছে। বাড়িতে কথাটা বলি বলি করেও বলতে পারলাম না।

এর ঠিক দিন দশেক পরের কথা।

স্কুল থেকে ফিরছি, বগলে বই। সঙ্গীরা এগিয়ে গিয়েছে। আমি আস্তে আস্তে চলেছি। রাস্তা মাড়িয়ে মাড়িয়ে।

হঠাৎ ড্যালহৌসী স্ট্রীটের মোড়ে দেখা। ভদ্রলোক আর একজন বর্মী প্রৌঢ়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। তন্ময় হয়ে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেও লক্ষ্য করলেন না।

একটু অপেক্ষা করলাম। এই সময় বিরক্ত করা উচিত হবে না। সঙ্গের লোকটি চলে যাক, তারপর কথা বলব।

বিধি সদয়। প্রৌঢ়টি চুরুট ধরাবার জন্য বারকয়েক পকেট হাতড়ে রাস্তার কোণের পানের দোকানের দিকে এগিয়ে

গেলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মিস্টার মুখার্জি, সেদিন আপনি এলেন না, আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম আপনার জন্য। আপনি যে বইটা দিয়েছিলেন সেটা কবে পড়া শেষ হয়ে গেছে। বেশ বই, ভাল বই।

কথার ফাঁকে ফাঁকেই দেখলাম ভদ্রলোকের সুগৌর মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। দুটি ভ্রু কুঞ্চিত। মুখে বিরক্তির ছাপ।

আমার কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক চলতি একটা রিক্সাকে ইঙ্গিতে দাঁড় করিয়ে উঠে পড়লেন।

রিক্সা পাশের গলি দিয়ে ছুটল।

বেশ বুঝতে পারলাম, এভাবে উপযাচক হয়ে কথা বলাতে ভদ্রলোক বিরক্ত হয়েছেন। রীতিমত বিরক্ত।

যে সহপাঠী সেদিন আমারই মতন রয়েল লেকে অপেক্ষা করেছিল, ভাবলাম কথাটা একবার তাকেই বলব। মিস্টার মুখার্জির বিচিত্র ব্যবহারের কথা। কিন্তু আর একটা ব্যাপার ইতিমধ্যে ঘটাতে জিজ্ঞাসা করার সুবিধা হয়নি।

একদিন বি এস এ লাইব্রেরি-রুমে পা দিয়েই দেখলাম, এখানে ওখানে ছেলেরা গোল হয়ে কি একটা কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। একটু এগিয়েই বুঝতে পারলাম। 'ছাত্রসঙ্ঘ' প্রকাশিত হয়েছে। হলদে রঙের মলাট। পাতলা বই। দাম বোধহয় আট আনা।

'ছাত্রসঙ্ঘ' অফিসের দিকে চোখ ফেরালাম। সেখানে টেবিলের ওপর কোন কাগজপত্র নেই। চেয়ারও খালি। তাহলে আমার কপিটা জোগাড় করব কোথা থেকে ?

একটি পরিচিত ছেলের সাক্ষাৎ মিলল। আমাদের ইস্কুলেই উঁচু ক্লাশে পড়ে। নাম জানি না। এই লাইব্রেরিতে যেতে আসতে মুখচেনা হয়েছে। দেখলাম তার হাতেও এই সংখ্যা 'ছাত্রসঙ্ঘ'।

একটু দেখতে দেবেন? হাত বাড়িয়ে পত্রিকাটা চাইলাম।

পত্রিকাটি হাতে নিয়ে দ্রুত সূচীপত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম।

তারপর একটি একটি করে পাতা উল্টে গেলাম। শুরু থেকে শেষ। দেয়ালে টাঙানো পরীক্ষার ফলাফল যেমন উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে ভয় আর প্রত্যাশা মিশিয়ে দেখি, মনের অবস্থা অবিকল সেই রকম।

সামনের অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে উঠতেই সাবধান হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি পত্রিকাটা ফেরত দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

সারা পৃথিবী মুছে গেল চোখের সামনে থেকে। মনে হল এতদিন ধরে আশপাশের সমস্ত মানুষ ব্যঙ্গ করছে আমাকে নিয়ে। আর নয়, সাহিত্য-সাধনার ইতি। বাড়ি গিয়ে কবিতার খাতা তুটো খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ব। উনানের মধ্যে দেব সেই ব্যর্থ রচনার স্তূপ। পৃথিবীতে আমার অক্ষম সাধনার যেন কোন চিহ্ন না থাকে।

এদিক-ওদিক চেয়ে এক সময়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। পাশে সিনেমার ভীড়। ফুটপাথের ওপব অজস্র উপকরণ সাজানো দোকান। 'বৃক্ষবন্দনা' প্রকাশিত না হওয়াতে কারুর কোন ক্ষতি হয়নি। বিলাস-ব্যসনের কোন কমতি নেই কোথাও, মানুষের ফুর্তিরও কামাই নেই। সিদ্ধার্থের লোকসমাজ ত্যাগ করার কারণ কিছুটা বুঝতে পারলাম। ঈশ্বর জানেন, তিনিও কপিলাবস্তুর কোন পত্রিকায় কবিতা পাঠিয়েছিলেন কিনা।

পায়ে পায়ে স্টেশনের ধারে এক পার্কে এসে বসলাম। তু হাঁটুর ওপর মুখ রেখে।

এক পর্ব তো শেষ হল, কিন্তু এর পরের পর্ব? সহপাঠীদের কি বলব? কি করে দাঁড়াব তাদের সামনে! আমার ব্যর্থতার ওপর রঙ ফলিয়ে আমাকে নস্তাৎ করে দেবে। শোধ নেবে এতদিনের স্পর্ধার!

ঈশ্বর করুণাময়। যে ক'দিন স্কুলে গেলাম, কেউ কোন কথা বলল না। মনে হল 'ছাত্রসঙ্ঘ' প্রকাশিত হবার খবরই তারা রাখে না, আর রাখলেও, আমার কবিতার কথা হয়তো তাদের মনে নেই।

তারপরই মেমিও রওনা হয়ে গেলাম।

বাবা কাজ করতেন রেলওয়ে অফিসে। বছরে দুবার পাস পেতেন। তা ছাড়াও তাঁকে অফিসের কাজে মাঝে মাঝে বাইরে বেরোতে হত। বছরে দুবার আমরা সবাই যেতাম তাঁর সঙ্গে।

এই সূত্রে বর্মার প্রায় সব জায়গাতেই ঘুরেছি, অবশ্য যেখানে যেখানে রেলের যোগাযোগ আছে।

মেমিও এর আগেও গেছি। এক জায়গায় দুবার যেতে খুব ভাল লাগত না। এ যেন পড়া বই আবার পড়ার মতন। কিন্তু এবারে ভাল লাগা না লাগার প্রশ্ন অবান্তর। ঠিক এই সময়ে যে রেঙ্গুন ছাড়তে পারলাম, সহপাঠীদের কাছ থেকে দূরে যেতে পারলাম, 'ছাত্রসঙ্ঘ' যে শহর থেকে প্রকাশিত হয়, সে শহরে যে কিছুদিন আমাকে থাকতে হবে না, সেটুকুই আমার পরম সান্ত্বনা।

মেমিও শৈলনগরী। মান্দালয় থেকে ট্রেন ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ওপরে ওঠে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর। স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া।

ভেবেছিলাম পরিবেশ বদলালে শোকটা কিছুটা প্রশমিত হবে, কিন্তু ফল হল বিপরীত।

কবিতার খাতা দুটো ছিঁড়তে গিয়েও পারিনি। ড্রয়ারের একেবারে তলায় অন্য বাজে কাগজের নীচে রেখে দিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম ড্রয়ারের তলায় রেখে দিলে বুঝি মনেরও তলায় থাকবে। কিন্তু মেমিওর পাহাড়-বন-ঝরণা দেখে বুকের মধ্যে তীব্র একটা

বেদনা জেগে উঠল। দু-একটা কবিতা লিখলে আর কি ক্ষতি। এ লেখা তো আর প্রকাশের চেষ্টা করছি না কোথাও। আর জীবনে কোনদিন তা করবও না।

ক'দিন মনকে ধমক দিলাম। একলা একলা মাঠের মাঝখানে গিয়ে বসে থাকতাম। স্ট্র-বেরি আর গুজ-বেরির জঙ্গলে। জোর করে অন্য কথা ভাবতাম। পরীক্ষার কথা, সহপাঠীদের কথা। মাঝে মাঝে পড়ার বই কোলে নিয়েও বসে থাকতাম। অবশ্য একটি লাইনও পড়তাম না। একদৃষ্টে দূরের পাইন বনের পিছনে সূর্যের বিদায়ী আভার দিকে চেয়ে থাকতাম।

একদিন। সেদিন বই নিয়ে যাইনি। এমনি বসে আছি চুপচাপ। নির্জন প্রান্তর। এ দিকটায় বড় কেউ আসে না। হঠাৎ দেখলাম প্রায় আমারই বয়সী একটি মেয়ে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে এসে হাজির হল। ঘাড় অবধি সোনালী চুল, রঙীন ফ্রক। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে।

বুঝলাম সাইকেল শেখার এমন উপযুক্ত প্রান্তর কাছে আর নেই। শুধু অবারিতই নয়, নির্জনও। পদস্খলন হয়ে ভূপতিত হলে দেখবার কেউ নেই।

আমার ধারণাই ঠিক। মেয়েটি সাইকেল চড়া আরম্ভ করল। পিছনের ক্যারিয়ারে বসে দুপায়ে প্যাডেল করতে লাগল। মাতালের পদক্ষেপের মতন অসতর্ক বঙ্কিম রেখায় সাইকেল চলল। যতবারই মেয়েটি সীটের ওপর ওঠার চেষ্টা করল, ততবারই সাইকেল কাত হয়ে পড়ল একপাশে। ফ্রক থেকে ঘাসের কুচি ঝেড়ে মেয়েটি আবার উঠে দাঁড়াল। সাইকেল তুলে ধরল।

এই রকম বার কয়েক উত্থান-পতনের পর মেয়েটির নজর আমার ওপর পড়ল।

প্রথমে বিস্ময়, কিছুটা কৌতূহল, তারপর কি ভেবে সোজা এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। মেয়েটিকে এগোতে

দেখে আমি ততক্ষণে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দূরান্তের মেঘের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি।

একটু সাহায্য করবে আমাকে?

প্রথমে ভাব দেখালাম যেন কথাটা কানেই যায়নি আমার। কিন্তু বধির হওয়ারও সীমা আছে। মেয়েটি এবার ঝুঁকে পড়ল আমার দিকে, আমার সাইকেলটা ঠেলে দেবে একটু?

উঠে দাঁড়ালাম, না দাঁড়িয়ে আর উপায় ছিল না। কাজ এমন কিছু শক্ত নয়। মেয়েটি সাইকেলের ওপর জুতসই হয়ে বসতে, আমি প্রাণপণ শক্তিতে সাইকেলটা ঠেলতে লাগলাম। মেয়েটি সজোরে হ্যাণ্ডেল আঁকড়ে ধরে পা দিয়ে প্যাডেল ঘোরাতে লাগল। কিছুক্ষণ মন্দ চলল না, তারপর হঠাৎ সাইকেল কাত হল বাঁ দিকে। সেই সঙ্গে মেয়েটিও।

আমি ঠিক এই বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সাইকেলটা আমার গায়ের ওপর পড়ল। ফুটপিনের খোঁচায় একটা পা একটু রক্তাক্তও হয়ে গেল।

মেয়েটি ধুলো ঝেড়ে উঠে উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল, তোমার লাগেনি তো কোথাও?

একটা পা দিয়ে আর একটা পায়ের রক্ত মুছতে মুছতে অম্লান কণ্ঠে বললাম, না। তোমার?

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল, না। তাছাড়া সাইকেল শিখতে গেলে একটু-আধটু পড়তে হবে বৈকি।

টানা দিন দশেক এই চলল। রোদের তেজ একটু কমতেই এসে হাজির হই। কোনদিন আমি আগে আসি, কোনদিন মেয়েটি। সাইকেল চড়ার বিরতির মধ্যে নিজেদের কথাবার্তাও হয়। মেয়েটির মা-বাপ কেউ নেই। থাকে ঠাকুর্দার কাছে। পড়ে কনভেণ্টে। মেমিওতেই জন্ম। নাম মার্গারেট।

এই ক'দিনে আমিও সাইকেল চড়া শিখেছি। শুধু চড়াই নয়,

মাঝে মাঝে এক হাত কোমরে রেখে আর এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে মার্গারেটকে অবাক করে দিয়েছি।

কথাটা একদিন মার্গারেটই বলল। একটা কাজ করলে হয়। সাইকেল ভাড়া করতে পাওয়া যায়। ঘণ্টায় চার আনা। মার্গারেটের তো সাইকেল রয়েইছে, আমি যদি ঘণ্টা ছুয়েকের জন্য একটা সাইকেল ভাড়া করি তো ছুজনে এখান থেকে চার মাইল দূরের ফল্‌স্‌ দেখে আসতে পারি।

আমি তখনই রাজী হয়ে গেলাম। ঠিক হল পরের দিন বেলা চারটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব।

পাইনের ছায়াচ্ছন্ন সরীসৃপ-পথ। যানবাহনের উৎপাত নেই। কচিৎ ছু-একটা মোটর নক্ষত্রবেগে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। আমরা একেবারে পথের বাঁদিক ঘেঁষে চলেছি। ঝরাপাতার মর্মরধ্বনি তুলে টায়ারের তলায়। হিসেব করে দেখা গেল, ছুজনের বয়স যেমন কাছাকাছি, তেমনই পড়িও এক ক্লাসে। মাঝে মাঝে ইতিহাস আর ভূগোলের প্রশ্নের আদান-প্রদানও চলেছে। একপক্ষের আর এক পক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা।

কিছুদূর গিয়ে পথটা বেঁকে গেছে মান্দালয়ের দিকে। ছুপাশে ঝোপ। তার পিছন থেকে অবিশ্রান্ত জলধারার শব্দ কানে এল।

মার্গারেট নেমে পড়েছে সাইকেল থেকে। দেখাদেখি আমিও নামলাম। ঢালু পথ। পা টিপে টিপে নামতে হয়। সাইকেল সামলে।

একটু এগোতেই চোখে পড়ল। পাহাড়ের বুক চিরে প্রবল ধারায় জল পড়ছে। ছুধের মতন সাদা রঙ। প্রচণ্ড গর্জনে অন্য সব শব্দ চাপা পড়ে গেছে। নীচে, অনেক নীচে গিয়ে পড়েছে জলস্রোত। ছোট ছোট জলের কণা পাথরে ঠিকরে ছড়িয়ে পড়ছে চার দিকে। পাতার আওয়াজ নেই, পাখীর কাকলী নয়, এই মহাবিস্ময়ের কাছে সব মূক হয়ে গেছে।

সাইকেল দুটো গাছে ঠেস দিয়ে রেখে আমরা দুজনে পাশাপাশি বসলাম। জলপ্রপাতের এত কাছাকাছি যে জলের ফোঁটা আমাদের মুখে এসে লাগল। ভূগোলে জলপ্রপাতের যে নিরীহ নিরুত্তেজ বিবরণ পড়েছিলাম, চোখের সামনে তার ভয়াল মাধুর্য দেখে অবাক হলাম।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে খেয়াল হল, মার্গারেট তার শান ব্যাগ থেকে পাঁউরুটি আর জেলি বের করেছে। একটা পাতার ওপর দু টুকরো রুটি রেখেছে আমার সামনে। ইঙ্গিতে আমায় খেতে বলছে।

খেতে খেতেই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার আর কোন বন্ধু নেই এখানে ?

ঝাঁকড়া চুলগুলো নাড়তে নাড়তে মার্গারেট বলল, হ্যাঁ, অনেক। টনি, আইরিন, পিটার, কেট, বিল, একগাদা আছে। এখন স্কুল ছুটি কিনা, তাই তারা সব নীচে নেমে গেছে। তাদের মা-বাপের কাছে। আমার কেউ নেই, তাই সারা ছুটিটা আমায় এখানেই কাটাতে হয়।

অন্যদিকে ফিরে কথাগুলো বললেও, বুঝলাম মার্গারেটের গলার আওয়াজটা ভারী হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মার্গারেট জিজ্ঞাসা করল, তুমি চুপচাপ মাঠের মাঝখানে বসে কি কর ? এখানে তোমার কোন বন্ধু হয়নি বুঝি ?

বেশি বন্ধু আমার ভাল লাগে না, আমি জলপ্রপাতের দিকে চেয়ে উত্তর দিলাম, আমি বসে বসে ভাবি। নিঃসঙ্গ প্রান্তরে বসে ভাবতে আমার খুব ভাল লাগে।

ভাবতে ভাল লাগে ? মার্গারেটের দুটি নীল চোখে অগাধ বিস্ময়, কি এত ভাব ?

এমন সুযোগ ছাড়া সমীচীন হবে না, বিশেষ করে পথে আসতে

আসতে মার্গারেটের ইতিহাসের কয়েকটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারিনি, সে পরিতাপের বাষ্প বুকের মধ্যে জমা ছিল। মার্গারেটের চেয়ে আমি যে কত উর্ধ্বলোকের জীব সেটা না জানানো পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। গম্ভীর গলায় বললাম, আই অ্যাম এ পোয়েট।

ইউ আর এ হোয়াট?

আরও গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, এ পোয়েট।

মার্গারেট হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠল। বলল, পোয়েট? রিয়েলি? ইউ রাইট পোয়েম্স্?

গলার গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললাম, আই ডু।

ইন ইংলিস্?

নো, ইন বেঙ্গলী। মনে মনে একটু আক্ষেপ হল। দু-একটা ইংরেজী কবিতা চেষ্টা করলেই হত। বাংলায় যখন লিখতে পারি, তখন ইংরাজীতে আর অসুবিধাটা কোথায়। মনে মনে ইংরেজী কবিতার চরণ মেলাবার চেষ্টাও করলাম। সুবিধা হল না। ফল্স্-এর সঙ্গে কল্স্ মেলে, কিন্তু কিসের আহ্বান আর কাকে আহ্বান, ঠিক করে উঠতে পারলাম না।

মার্গারেট বিড় বিড় করে বলল, এ পোয়েট! দেন ইউ মাস্ট মিট মাই গ্র্যাণ্ডপা। হি ইজ অলসো এ পোয়েট।

মার্গারেটের ঠাকুর্দাও কবি? আশ্চর্য লাগল। এ কথাটা এতদিন কেন বলেনি মার্গারেট। রবীন্দ্রনাথের পরে জীবন্ত কবি আর নজরে পড়েনি। ইংরেজ কবি দেখতে পাব ভাবতেও মনে উল্লাস জাগল। ব্রাউনিং আর সুইনবার্নের কবিতা ক্লাসে পড়েছি। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ আর গোল্ডস্মিথের দু-একটা কবিতা বাড়িতে পড়েছি। কি ধরনের কবিতা লেখেন মার্গারেটের ঠাকুর্দা? সুইনবার্নের মত ছন্দ-মধুর, না ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মতন ভাবগম্ভীর।

কবে দেখা করতে যাবে বল? হি উইল বি সো প্লিস্ড্ টু মীট এ

ইঅও পোয়েট লাইক ইউ। জলপ্রপাতের চেয়েও মার্গারেট মুখর হয়ে উঠল।

কাল, কালই যাব। আমি উত্তর দিলাম।

ঠিক আছে, মার্গারেট উঠে দাঁড়াল, চল, আমরা রওনা হই। কাল স্টেশনের কাছে তুমি থেকো। বেলা পাঁচটা নাগাদ আমি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

রেল স্টেশনের ওপরে ছোট্ট কাঠের বাংলো। সাদা রঙের গেট। চারপাশে তারের বেড়া। সামনে কতকগুলো ফুলের গাছ। একটি বৃদ্ধ মস্ত কাঁচি হাতে বাগান তদারক করছেন। আধময়লা পোশাক। জামার আস্তিনে তালিগুলো এত দূর থেকেও নজরে এল।

ওই যে আমার ঠাকুর্দা। মার্গারেট হাত দিয়ে দেখাল।

সম্ভবত মার্গারেট আমার কথা তার দাদুকে আগেই বলে রেখেছিল। ভদ্রলোক মুখ তুলে দেখেই গেটের কাছ বরাবর এগিয়ে এলেন।

মার্গারেট দাদুর একটা হাত আঁকড়ে ধরে বলল, যে কবির কথা তোমায় বলেছিলাম, এই সেই কবি। এর নাম হচ্ছে, মার্গারেট থেমে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি নাম তোমার? এত আলাপ তোমার সঙ্গে, অথচ নামটাই জানি না।

আমি হেসে নামটা বললাম।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা হাত আমার কাঁধের ওপর রেখে বললেন, ভেতরে এস এইচ এন। চা খেতে খেতে আলাপ করা যাবে।

ছোট্ট ঘর। তাও মাঝখানে পর্দা টাঙিয়ে দুভাগ করা হয়েছে। বোধহয় ওপাশে মার্গারেটের পড়ার ঘর। এক কোণে কাঠের একটা টেবিল। ওপরে সাদা অয়েলক্লথ পাতা। তার ওপর কিছু বই।

দেয়ালে গোটা চারেক ছবি। তার মধ্যে একটা মার্গারেটের, একটা রাজারাণীর। বাকি দুটো নিসর্গ শোভার।

চা এল, সঙ্গে টম্যাটো স্যাণ্ডউইচ আর প্লাম কেক। একটি কেরেন মহিলা ট্রে করে নিয়ে এল। ট্রে থেকে টেবিলে নামিয়ে রাখল মার্গারেট।

তোমার প্রিয় কবি কে? আচমকা বৃদ্ধটি জিজ্ঞাসা করলেন।

তখন কবিতা পড়েছি বটে কিন্তু প্রিয়তর প্রিয়তমের বিচার করিনি। সে বয়সে করা সম্ভবও নয়। যে কবিতায় মারপ্যাঁচ কম, যে কবিতা সহজবোধ্য, সেই কবিতা ভাল লাগে। সেই কবিকেও। কিন্তু উত্তর একটা দিতে হবে। উত্তরের আশায় ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন, তাই বললাম, সুইনবার্ন।

চুরুটের ছাই ফেলতে ফেলতে ভদ্রলোক মাথা নীচু করে হাসলেন। বিড় বিড় করে বললেন, আরও পরে, আরও বড় হলে শেলীকে ভাল লাগবে। শেলী unique. More eastern than western.

কথাগুলো কানে এল বটে কিন্তু অর্থ হৃদয়ঙ্গম হল না। শেলীর পরিচয় তখনও কিছু পাই নি।

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললাম, আপনি কবিতা লেখেন? আপনার কবিতা শোনবার জন্যই এসেছি।

তুমিও তো লেখ?

হ্যাঁ, কিন্তু সে বাংলায়। সে তো আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনার কবিতা শোনান।

আশ্চর্য লাগল। বৃদ্ধের সারা মুখে লজ্জার আরক্ত আভা। দুটি চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল। নিজের কথা মনে পড়ে গেল। ক্লাসে কোন ছেলে কবিতা শুনতে চাইলে আমার মুখচোখের অবস্থাও ঠিক এমনই হত। লজ্জা, সঙ্কোচ, আগ্রহ, উৎসাহ সব মিলিয়ে বিচিত্র এক অনুভূতি। এই ব্যাপারে বুঝি বয়সের কোন ব্যবধান থাকে না। চৌদ্দ থেকে চৌষট্টি—সব এক।

দেয়ালের পাশে কাঠের শেল্‌ফ। পাশাপাশি অনেকগুলো বই দাঁড় করান। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে মোটা দেখে একটা বাঁধানো

বই টেনে নিলেন। দু-এক মিনিটের একটু ইতস্তত ভাব। কি বুঝি ভাবলেন আমার দিকে চেয়ে, তারপর বইটা খুললেন।

খুলতে টের পেলাম, বই নয় খাতা। পরিষ্কার সাদা কাগজ। দুপাশে যথেষ্ট মার্জিন। মাঝখানে টাইপ করা কবিতা।

বৃদ্ধ আবেগভরা কণ্ঠে কবিতা পড়া শুরু করলেন। নানা বিষয়ের কবিতা, নানা ছন্দের। রামধনু, পাইনের বন, নশ্বর জড়জীবন, এমন কি রেলগাড়ির কাব্য পর্যন্ত বাদ নেই।

ভদ্রলোক একটানা পড়ে যাচ্ছেন। সামনের দিকে পাশাপাশি আমি আর মার্গারেট। মার্গারেট দুটো হাত দু গালের ওপর রেখে নিবিষ্ট মনে কবিতা শুনছে। খুবই স্বাভাবিক, এ কবিতা বহুবার সে শুনেছে দাদুর মুখে। হয়তো অবসর সময়ে খাতা পেড়ে নিয়ে নিজেও পড়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার চোখ-মুখের একাগ্র ভঙ্গি দেখে একটুও বুঝতে অসুবিধা হল না, কবিতার সঙ্গে কবিকে মিশিয়ে না ফেললে এভাবে তন্ময় চিত্তে কবিতা শোনা যায় না। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টাকেও ভালবাসতে হয়।

হঠাৎ মার্গারেট বলল, সেই কবিতাটা পড় দাদু।

কোন্‌টা? মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করেই ভদ্রলোক থেমে গেলেন। জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই—উত্তর বুঝি মার্গারেটের দু চোখের তারায় ফুটে উঠেছে।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ঘাড় নীচু করে চুপচাপ বসে রইলেন, তারপর পাতা উল্টে রুদ্ধ কণ্ঠে কবিতার নামটা আস্তে আস্তে পড়লেন। To Susan.

একটা হাত বাড়িয়ে মার্গারেট আমার বাহুমূল ছুঁল। আমি মুখ ফেরাতে বলল, That's grandma.

কবিতা হিসাবে নিজের স্ত্রীর উদ্দেশে রচিত লেখাটি কেমন হয়েছিল, এতদিন পরে বিশ্লেষণ করে বলতে পারব না। হয়তো ছন্দোবদ্ধ শোকোচ্ছ্বাস কিংবা আবেগপ্রবণ স্মৃতির অর্ঘ্য। কিন্তু এই

মাপকাঠিতে কবিতাটির বিচার চলে না। আমি অন্য কিছু দেখেছিলাম।

অশ্রুভারাক্রান্ত দুটি চোখ, স্ফীত নাসারন্ধ্র, আরক্তিম গণ্ড, শুধু কবিতা পাঠ নয়, প্রতি ছত্রে যেন নিজেকে নিবেদন করা। লোকান্তরিতা প্রিয়ার সমাধি মূলে শ্বেতগোলাপের মাল্যদান। যতি, ছন্দ, ভাষা আর নীরস কবিতার ব্যকরণ দিয়ে ও জিনিসের মূল্যায়ণ চলে না।

বললাম, চমৎকার। খুব ভাল লেগেছে। এটি বোধহয় শ্রেষ্ঠ কবিতা।

ভদ্রলোক জামার আস্তিনে দুটো চোখ মুছে নিয়ে ম্লান হেসে বললেন, দুবার ফেরত এসেছিল।

ফেরত ?

হ্যাঁ, দুবার পাঠিয়েছিলাম Railaway Journal-এ। প্রথমবার বললে, কবিতাটি বড্ড বড় হয়েছে, একটু ছোট করতে হবে। এ কবিতার অঙ্গচ্ছেদ করা আমার পক্ষে কত মর্মান্তিক বুঝতেই পারছ, তাও আমি লাইন দশেক কেটে আবার পাঠিয়েছিলাম। কবিতাটি কিন্তু এবারেও ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এবার ফেরত দেবার কারণ ?

খাতাটা মুড়ে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, এবারের কারণ এটা নাকি কবিতাই হয় নি। কিন্তু আসল কারণ যে সেটা নয়, তা বুঝতে আমার দেরি হয় নি।

কি আসল কারণ ?

আসল কারণ, একটা ড্রাইভারের লেখা কখনও পত্রিকায় ছাপা যায়। তাহলে পত্রিকার ইজ্জত যাবে যে। এটা ঠিক বোঝবার মতন বয়স তোমার নয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, কোনদিন যেন এসব তোমাকে বুঝতেও না হয়।

বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম। অলক্ষে রাখীবন্ধন হয়ে গেল। এক অনভিজ্ঞ কিশোরের সঙ্গে পৃথিবীর [illegible] হেমলকের বিষে জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধের। বয়সের তারতম্য নিশ্চিহ্ন হল।

আশ্বস্ত হলাম। আমার কবিতা না ছাপা হওয়ার যুক্তিসঙ্গত একটা কারণ এতদিন পরে পাওয়া গেল! সত্যিই তো, নীচু ক্লাসের একটা হাতের রচনা কখনও ও ধরনের পত্রিকায় মুদ্রিত হতে পারে। পত্রিকার দামই যে কমে যাবে। তা কবিতাটি যতই ভাল হোক।

সেবারে অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করেছিলাম বৃদ্ধের সঙ্গে। এমন কি আমার লেখা দু একটা মারাত্মক ইংরাজী অনুবাদ করে শুনিয়েও ছিলাম। সব বলেছিলাম, শুধু একটা কথা বলতে পারি নি। বলতে পারি নি, আমার লেখা কবিতা ফেরত আসেনি বটে, কিন্তু ছাপা হয় নি।

এরপর দীর্ঘ বার বছর পরে মোমিয়ো গিয়েছিলাম। এরমধ্যে প্রতি বছর নতুন নতুন জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। তবে বৃদ্ধের কথা ভুলি নি।

বার বছর পরে যখন যাই, তখন আমি স্বাধীনভাবে ওকালতী শুরু করেছি। একটা ছোট মামলার ব্যাপারেই মেমিয়ো যেতে হয়েছিল। সিনিয়রের নির্দেশে।

কোর্টের কাজ শেষ হতেই বেরিয়ে পড়লাম, মক্কেলের হাতে নথিপত্র দিয়ে। বললাম, আমি একজন পুরোনো পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করে তারপর হোটেলে ফিরবো।

এবারেও গেটের কাছে দেখা। তবে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সঙ্গে নয়, সেই কেরেন পরিচারিকার সঙ্গে।

একটা গাছের নীচে বসে মহিলা কি বুনছিল, আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখ তুলল।

বারোটা বছর যেমন এক কিশোরকে পূর্ণ যুবক করে তুলেছে, তেমনি একদা যুবতী পরিচারিকাটির সারা দেহে রেখে গেছে নির্মম স্বাক্ষর। তাকে প্রৌঢ়ার আলখাল্লা পরিয়েছে।

প্রথমে মার্গারেটের নাম করলাম।

মার্গারেট নেই। স্বামীর কাছে চলে গেছে ইয়েমেদিনে।

মার্গারেটের দাত্থ?

পরিচারিকা উঠে দাঁড়াল। হাতের সংকেতে আমাকে যাবার অনুরোধ জানিয়ে এগিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে।

ইতিমধ্যে ইতস্তত কয়েকটা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। অখ্যাত দু-একটা মাসিকে দু-একটা গল্প। মক্কেল-ভজনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সাধনা চলছে।

মার্গারেটের দাত্থরও এতদিনে নিশ্চয় আরও দু-একটা খাতা ভরে উঠেছে। বলা যায় না, মিথ্যা কৌলীন্যের স্পর্শকাতরমুক্ত কোন পত্রিকায় তাঁর দু-একটা কবিতা ছাপাও হয়ে থাকতে পারে।

আসুন। এক হাতে পর্দা সরিয়ে পরিচারিকাটি এক পাশে দাঁড়াল।

একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কোণের দিকে ছোট একটা খাট। শতছিন্ন অপরিষ্কার চাদর। বালিশের অবস্থাও তথৈবচ। তার ওপর হাড় আর পাঁজরের জীর্ণ স্তূপ।

চিনতে পারছেন? একটু এগিয়ে নিজের নামটা বললাম, বারো বছর আগে আসার কাহিনীও। আপনার কবিতা শুনতে এসেছি। হাতে অফুরন্ত অবসর। শোনান নতুন কবিতা।

কোন উত্তর নেই। আধ অন্ধকারে ভদ্রলোকের মুখটাও স্পষ্ট

দেখতে পাচ্ছিলাম না। দু-এক পা এগিয়েছিলাম, পরিচারিকাই আলো জ্বেলে দিতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কোটরগত চোখ, চোয়াল ঝুলে পড়েছে, বেঁকে গেছে সারা মুখ, দুটো ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

মাথার বালিশের পাশে পুরোনো কবিতার খাতা।

পরিচারিকাই ব্যাপারটা বলল। মাস দুয়েক আগে বাগানে কাজ করতে করতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। ধরাধরি করে বাড়ির মধ্যে আনা হয়েছিল। ডাক্তার বললেন, স্ট্রোক। ক' মাস যমে-মানুষে টানাটানির পর পরমায়ু টুকুই শুধু রয়ে গেল। ডানদিকটা সম্পূর্ণ অবশ। কথা বলতে পারেন না। ওঠা-হাঁটা করতেও নয়। কোনরকমে চামচে করে করে গলা ভাত আর দুধ খাইয়ে দেওয়া হয়।

একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম ভদ্রলোকের দিকে। তাঁর দুটি চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে কুঁচকে কুঁচকে যাচ্ছে গালের মাংস। কি বুঝি বলার চেষ্টা করছেন। দুর্বার প্রয়াসে সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আর কোন কাজ নেই। কেবল অপেক্ষা। সুসানের কাছে যাবার আগের কয়েকটা যন্ত্রণাময় দিন। সেগুলো পার হবার ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা।

কবি আর কোনদিন কলম ধরতে পারবেন না—আর কোনদিন আবৃত্তি করতে পারবেন না স্বরচিত কবিতা।

ভদ্রলোক কি একটা ইশারা করলেন। চোখের ইশারা।

পরিচারিকা বলল, ওঁর ইচ্ছা আপনি কাছে বসে ওঁর লেখা দু-একটা কবিতা পড়ে শোনান।

তখনই চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। ইতিমধ্যে আরও অনেক নতুন কবিতা লিখেছেন। নতুন সুর, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। মাটি, জল, আকাশ নিয়ে অপরূপ কাব্য।

গোটা দশেক কবিতা পড়লাম। সব শেষে পাতা উল্টে উল্টে পুরোনো একটা কবিতায় ফিরে এলাম। দীর্ঘ বারো বছর আগে শোনা এক কবিতায়। To Susan.

কয়েকটা লাইন পড়তেই পরিচারিকা আমায় থামিয়ে দিল।

থাক, আর পড়বেন না, ওঁর কষ্ট হচ্ছে। কোনরকম ভাবে উত্তেজিত হওয়া ওঁর শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

খাতা থেকে মুখ তুলে দেখলাম, সারা মুখ আরক্ত। বিস্ফারিত দুটি চোখ। দুটি ঠোঁটের দ্রুত কম্পন। বুকের মধ্যে অসহনীয় এক যন্ত্রণা, মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া।

খাতা বন্ধ করে উঠে পড়লাম। বিদায় নেবার আগে তাঁর দেহে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলাম। কপালে হাত রাখলাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে দুটো চোখ মুছিয়ে দিতে গিয়েও থেমে গেলাম। পবিত্র অশ্রুর স্রোত। এ অশ্রু মুছিয়ে দেওয়া পাপ।

নির্জন পথ ধরে ফিরে এলাম। দুপাশে পাইন, ইউক্যালিপটাস আর সিলভার ওকের অতন্দ্র প্রহরা। এলোমেলো হাওয়ায় পাতায় পাতায় অস্ফুট গুঞ্জন।

মনে হল, খুব অস্পষ্টভাবে, প্রায় রিক্ত আর্তকণ্ঠে যেন কারা আবৃত্তি করছে—

"Susan unkind !
How could you leave me behind
And depart for land unknown
oh how !"

উনিশশো চল্লিশ সাল। বাংলাদেশে ফিরেছি। এলিস সাহেবের কাছে আনাগোনা করছি। সপ্তাহে একবার। সনদ পেলেই কোর্টে বেরোব।

এর আগে বর্মায় বছর দুয়েক প্র্যাকটিশ করেছি। বরফ-ভাঙার পর্ব শেষ হয়েছে। নিজের ওপর কিছুটা বিশ্বাসও এসেছে।

তবে কলকাতা হাইকোর্টে গেলেই কেমন দমে যাই। উত্তর-মেরুতে পেঙ্গুইন পাখীর সমাবেশের মতন রাশি রাশি গাউনপরা জীব। পথে, বারান্দায়, কোর্ট-ঘরে। সদাব্যস্ত ভাব। মহামূল্য সময় এক তিল নষ্ট করার উপায় নেই।

এ কায়দা আমাদের জানা। আমরাও সব সময় এমন একটা ভাব করেছি, যেন একসঙ্গে পাঁচটা এজলাসে কেস উঠেছে। দাঁড়াবার সময় নেই। বিশেষ করে পরিচিত লোক দেখলে তো কথাই নেই। গাউনটা ওড়াতে ওড়াতে বলি, চলি ভাই, এ. ডি. এমের ঘরে একটা কেস আছে। বড় জবরদস্ত ম্যাজিস্ট্রেট। একটু দেরি করলেই অন্য কেস ডেকে বসবে।

পরিচিত লোকটির কাছ থেকে সরে গিয়ে এ. ডি. এমের কোর্টে ঢুকে পড়ি। সামনের চেয়ারে বসে পুরনো ব্রিফের পাতা ওল্টাই গভীর মনযোগে।

এ পেশার এটুকুও প্রয়োজন। সন্ন্যাসীর যেমন ছাই, ঐন্দ্রজালিকের যেমন লাঠি, ডাক্তারের যেমন স্টেথস্কোপ, উকিলের তেমনই ভড়ং।

মনে আছে জীবনের প্রথম মক্কেল একটি মহিলা। বর্মী মহিলা। আধাবয়সী। তার অভিযোগ, একটি ভদ্রলোক তাকে মারধোর করেছে। একেবারে অহেতুক। শুধু অকারণ পুলকে। মহিলার মাথায়, চিবুকে, হাতে লাঠির আঘাত।

আসামীটি জেরবাদি। অর্থাৎ তার বাপ মুসলমান, মা বর্মী। সে অবশ্য সব কিছু অস্বীকার করল। এমন কি মহিলাকে চেনে এমন কথাও বলল না।

ফি পেয়েছিলাম সতেরো টাকা। তা থেকে আবার দু টাকা মুহুরীকে দিতে হয়েছিল, কারণ কেসটা পেয়েছিলাম তারই কৃপায়।

দিন পাঁচেক কেস হয়েছিল। সাক্ষীসাবুদ সবই মহিলার দিকে। পাশাপাশি ঘরের বাসিন্দা সবাই। কাজেই একজোট।

সবাই বলল, লোকটি সহজ অবস্থায় ছিল না। প্রথমে মদির দৃষ্টি, তারপর কটূক্তি, শেষকালে একেবারে আক্রমণ।

আমি চেষ্টা করেছিলাম প্রমাণ করতে যে, লোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকে মহিলাকে মেরেছে, তাতে criminal tresspassটা প্রমাণিত হত। কিন্তু সাক্ষীরা জেরায় টিঁকল না।

মন্দের ভাল। লোকটার মাসখানেকের সশ্রম কারাদণ্ড হল। আমি খুব খুশি। যেন খুব প্যাঁচালো একটা মকদ্দমা জিতেছি, এমনই ভাব। নিজের কীর্তিকলাপ ফলাও করে মক্কেলকে বলতে গিয়েই দেখি মহিলা উধাও। অবশ্য খুব আপসোস হল না, কারণ ফিয়ের টাকা আগেই পুরোপুরি আদায় হয়েছিল।

নিজের চেম্বারে ফিরেই অবাক হলাম। সেই মহিলাটি চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বিচলিত হলাম। ভাবলাম দণ্ডটা বোধহয় মহিলার মনঃপুত হয় নি। আশা করেছিল, অন্ততঃ মাস ছয়েকের মতন কারাবাস হবে। তা হতে পারত। যদি মহিলার আঘাতটা আর একটু গুরুতর হত। একুশটা দিন যদি শুয়ে থাকতে পারত হাসপাতালে। তারপর criminal tresspassএর অমন নিরেট বেলুনটা বাজে সাক্ষীদের এলোমেলো বুলিতে শুরুতেই যদি ফেঁসে না যেত।

একটু শব্দ করেই হাতের বইগুলো টেবিলে রাখলাম।

কাজ হল। মহিলা মুখ তুলল। দুটি চোখ আরক্ত। গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা।

কি হল ?

বাবুজী, জেল কেন হল? অতদিনের জেল? ফাইন হলেও তো পারত। পঞ্চাশ টাকা, একশ টাকা যা হোক।

রীতিমত বিস্মিত হলাম। নারী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়, পুঁথিপত্রে এমন কথা পড়েছিলাম। বোঝবার চেষ্টা করিনি। প্রয়োজনও হয় নি।

কি ব্যাপার খুলে বল তো? এত দরদ তো নালিশ করতে গেলে কেন?

নালিশ করব না? রাজা নেই দেশে? দোষ নেই, অপরাধ নেই, খামোকা ঠেঙাবে যখন-তখন?

চেয়ারে চেপে বসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটি কে তোমার? স্বামী নয় নিশ্চয়?

মহিলা ঘাড় নাড়ল।

তবে? মনের মানুষ?

একবার মুখ তুলেই মহিলা ফিক করে হেসে ফেলল।

সেই থেকে আমার মনেও কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হয়ে গেল। কেস পেলেই খোঁজ করি ফরিয়াদির সঙ্গে আসামীর কোন সম্পর্ক নেই তো?

আর একটা কেসের কথা মনে পড়ছে।

Trade Markএর কেস। এক ঘিওয়ালা আর এক ঘিওয়ালার নকল করে টিন বের করেছে। দুজনের মার্কা প্রায় কাছাকাছি। মানে আইনের ভাষায়, colourable imitation.

আসামীদের পক্ষে মিস্টার পিল্লে আর আমি। ও পক্ষে ডক্টর বা হান। বর্মার এককালীন মন্ত্রী ডক্টর বা ম-র ভাই। তাছাড়া ডক্টর বা হান আইন কলেজে আমাদের অধ্যাপকও ছিলেন। ব্যারিস্টার, আইনে অগাধ পাণ্ডিত্য, সওয়াল জবাবে সাক্ষীর পক্ষে কৃতান্তের সগোত্র।

বিরাট কেস। নথিপত্রও বড় কম নয়। সেগুলো গোছানোই আমার কাজ। লাল পেন্সিল দিয়ে এজাহারগুলো দাগ দিয়ে

দিয়ে রাখছি। সাক্ষ্যের দুর্বল স্থানগুলো যাতে ঠিক চোখে পড়ে।

ডক্টর বা হান সাক্ষীকে একটা প্রশ্ন করতেই আমি প্রতিবাদ করলাম Evidence Actএর নজির দেখিয়ে।

ডক্টর বা হান গর্জন করে উঠলেন, From where did my friend learn his law ?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলাম, From my learned friend on the opposite.

সারা কোর্ট-ঘরে চাপা হাসির লহর। ম্যাজিস্ট্রেটও মুখ ঘুরিয়ে হেসে নিলেন।

ডক্টর বা হান আরক্ত মুখে টেবিলের ওপর থেকে তাঁর চশমাটা কুড়িয়ে নাকে বসিয়েই হেসে ফেললেন।

আমাকে ভোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কলেজে প্রায় সব অনুষ্ঠানেই আমার কিছু কিছু অংশ থাকত। আবৃত্তি, বিতর্ক, শেষকালে মুড কোর্ট।

কেসটা মুলতুবী হতে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। নিজের প্রগল্‌ভতার জন্য ক্ষমাও চেয়েছিলাম।

তিনি স্মিত হেসে বলেছিলেন, যুদ্ধে যেমন দয়া প্রদর্শন সর্বনাশ ডেকে আনে, এজলাসেও তাই। সুযোগ পেলেই বিপক্ষকে ঘায়েল করবে। তবে অন্যায় ভাবে নয়।

ওকালতীর কথা থাক। সাহিত্যের কথায় আসি।

একদিন সকালে হাইকোর্টের ছাপমারা এক লম্বা খাম এসে পৌঁছল আমার ঠিকানায়। হৃষ্টচিত্তে খামটা খুলেই মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। এলিস সাহেবের চিঠি। লিখেছেন, আমাকে এদেশের কোর্টে প্র্যাকটিশ করতে হলে হিন্দু ল আবার পরীক্ষা দিতে

হবে। রাজী থাকলে যেন অবিলম্বে এলিস সাহেবের সঙ্গে দেখা করি।

রাজী তো ছিলামই না, তবু এলিস সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। মনের ঝাল মেটাবার জন্য।

আমাকে দেখেই এলিস সাহেব স্বাগত অভ্যর্থনা করলেন। কে একজন সামনে বসেছিল, তাকে সরিয়ে আমায় বসতে বললেন।

আউং শানের একটা কথা মনে পড়ল। ইংরেজের দন্তবিস্তার করে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী।

চিঠিটা এলিস সাহেবের সামনে ফেলে বললাম, হিন্দু ল পরীক্ষা দিয়েছি, আমাদের এল. এল. বি কোর্সে হিন্দু ল-ও একটা বিষয় ছিল। তাছাড়া আপনি তো আমার সার্টিফিকেট দেখেছেন, ফাইনালে আমার পোজিসনও ভাল ছিল।

এলিস সাহেব হাসলেন। তথাগত প্যাটার্নে। তারপর বললেন, পরীক্ষায় ভাল করেছেন বলেই তো আমি জানি পরীক্ষা দিতে আপনি পশ্চাৎপদ হবেন না।

শেষ চেষ্টা করলাম, এ ছাড়া কি আর কোন উপায় নেই?

আমি তো দেখছি না। বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, কাজেই আপনাকে হিন্দু ল-এর একটা পেপার পরীক্ষা দিতেই হবে।

এলিস সাহেবের সামনে থেকে চলে এলাম। চোখে জল এসে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে আকাঙ্খা ছিল উকিল হব। নামী উকিল। আর্গুমেণ্ট শুনতে ভিড় জমে যাবে কোর্টে। ক্রস-একজামিনের ফরসেপ দিয়ে সাক্ষীর মিথ্যা ভাষণের অন্ত্র চেপে ধরব। দেশে-বিদেশে নাম হবে।

সে আশায় জলাঞ্জলি। জীবনের তুটো সাধের একটা নিশ্চিহ্ন হল। আর একটা বাকি রইল। সাহিত্যের সেবা করব। প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হবে। সম্পাদকের ঝাঁক এসে দাঁড়াবে বাড়ির দরজায়। সমালোচকের দল তীক্ষ্ণ বল্লম উদ্যত

করেও নামিয়ে নেবে আয়ুধ। বলবে, না, শক্তি আছে লেখকের, নবীন হলেও কাঁচা নয়, আধমরা তো নয়ই।

কিন্তু শুধু সাহিত্য রুটি দেবে না, সেটুকু জানতাম। অন্তত উনিশশো চল্লিশ সালে। তাই আর একটা কাজ বাড়ল। চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত দেওয়া, আর দুরু দুরু বুকে ইণ্টারভিউর প্রতীক্ষা করা।

তারই ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যও চলল। বেশির ভাগই কবিতা। এ ছাড়া আর একটা নেশাও পেয়ে বসল। সাহিত্যিকদের দেখবার। জলজ্যান্ত। একই শহরে যখন তাঁরা ঘোরাফেরা করছেন, তখন মুখোমুখি দেখা হয়ে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কিন্তু দেখা হলে চিনব কি করে? সাহিত্যিকদের অন্তর, দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো সাধারণ মানুষের চেয়েও ভিন্ন, কিন্তু তাঁদের বাহ্যিক আকারে কোন প্রভেদ থাকার কথা নয়।

ফলে চাদর জড়ানো কোন ভদ্রলোককে কিংবা ঢুলু ঢুলু স্তিমিত নেত্রের অধিকারী কাউকে দেখলেই বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকি। মনে মনে জানা সাহিত্যিকদের নামগুলো আউড়ে যাই আর আন্দাজ করি ইনি কে হতে পারেন।

এই সময় পাড়ার একটি বন্ধু খবর আনলেন। বিস্ময়কর খবর। তখন চারু অ্যাভিনিউতে আমাদের নতুন বাড়ি হয়ে গেছে। ভবানী-পুরের পৈত্রিক আমলের বাড়ি ছেড়ে আমরা টালিগঞ্জের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করেছি।

তারই কাছে এক পেট্রল পাম্প। রসা রোডের ওপরে। সেই পেট্রল পাম্পের পিছনে নাকি এক সাহিত্যিক-সভা বসে। সভার নাম খাটিয়া সমিতি।

নামটা পুরোমাত্রায় অসাহিত্যিক, খানিকটা ভীতিপ্রদও। তবু বন্ধু যখন বললেন, সেখানে আসেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাধিকা-রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা, মাঝে মাঝে ছিটকে-ছাটকে

আরো বড় গ্রহেরও আমদানি হয়, তখন একদিন গিয়ে হাজির হলাম।

দূর থেকে দেখেই হতাশ হলাম।

প্রায় অন্ধকার গলি। সম্বল বলতে একটি টিমটিমে গ্যাসের বাতি। অক্সিজেন ঠেকানো রোগীর অবস্থা। রাস্তার একপাশে একটি খাটিয়া। তার ওপর জনকয়েক ভদ্রলোক বসে আছেন।

কাছে যেতে দৃশ্যটা আরও পরিষ্কার হল।

খাটিয়ার একপাশে এক মসীকৃষ্ণ বর্ণের ভদ্রলোক একটা খাতা থেকে কি পড়ছেন। মাথায় অবিন্যস্ত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। পানের রসে ঠোঁট প্রথম ভাগে বর্ণিত টিয়াপাখির ঠোঁটেরই অবস্থা। আর একদিকে নাতিদীর্ঘ একজন। উজ্জ্বল দুটি চোখ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। দুলে দুলে লেখাটা শুনছেন।

আমরা যেতেই দুজনে মুখ তুলে চাইলেন।

উজ্জ্বল-চোখ আনন্দিত, মসীকৃষ্ণ একটু বিরক্ত, বোধহয় পাঠে বাধা হওয়ায়।

কি খবর? ইনি কে?

আমার সঙ্গের বন্ধুটি পরিচয় দিলেন। নাম-ধাম। আরও বললেন, ইনি বর্মা থেকে এসেছেন। সাহিত্যে খুব অনুরাগ।

এবার মসীকৃষ্ণ সদয় হলেন। একটু সরে বসে বললেন, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

খাটিয়ার দুপাশে দুজনে বসলাম। ভারসাম্য রক্ষা করে।

আলাপ হল। যিনি পড়ছেন তিনি সুশীল জানা। আর শুনছেন রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। আজ শনিবার, তাই আসরে ভিড় নেই। অন্যদিন একটা খাটিয়ায় ধরে না।

পড়া চলল। গল্পটির নাম বোধহয় 'ভঙ্গুর'। গল্পটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হবে। তার আগে পাণ্ডুলিপি পড়া হচ্ছে। যদি কারো কোন মতামত থাকে।

শুধু সাহিত্য নয়। ভেতর থেকে চা এল, সঙ্গে ইলিশমাছ ভাজা। জানলাম রাধিকাবাবু ওখানেই থাকেন। পেশা ওকালতী। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু পশার জমেছে। তবে উকিলের সাহিত্যের নেশা থাকলে সর্বনাশ হয়।

উত্তরকালে এ সর্বনাশের চেহারা রাধিকাবাবুর জীবনেও দেখেছি।

ঘরে জনকয়েক মক্কেল বসে আছে। তাদের সঙ্গে মকর্দমার কথা হচ্ছে। জটিল আলোচনা। হঠাৎ আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম। বগলে খাতা। অর্থাৎ কিছু আনকোরা কবিতা আর গল্প।

আমাদের দেখে রাধিকাবাবু হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, এই যে আপনারা এসে গেছেন। তারপর মক্কেলদের দিকে চেয়ে বললেন, আজ তো আর হবে না। এঁরা এসে গেছেন, এবার আমাদের জরুরী মিটিং আরম্ভ হবে।

মক্কেলরা একবার আমাদের দিকে চোখ বুলিয়ে সখেদে বলল, কিন্তু আমাদের কেসটা যে কাল কোর্টে উঠবে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, দ্রুত হাত নেড়ে রাধিকাবাবু তাদের সমস্যার নিষ্পত্তি করে দিলেন, কাল ভোরে এস। সাড়ে ছটার মধ্যে। সব দেখে দেব। অগত্যা তারা মকর্দমার কাগজপত্র বগলে নিয়ে প্রস্থান করল। আমরা ঘরে ঢুকে বসলাম।

কালটা বর্ষা। কাজেই রাস্তায় খাটিয়া পাতা সম্ভব হল না। আড্ডা জমল বাইরের ঘরে। লক্ষ্মী তাড়িয়ে সরস্বতীর সাধনা।

এই আড্ডাতেই একদিন দেখা হল।

খাটিয়ার ওপর জোর তর্ক চলছে। একটা গল্পের পরিণতি নিয়ে। তখন সাহস করে আমিও দু-একটা মতামত দিই।

হঠাৎ গ্যাস-পোস্টের পাশ থেকে কে বলল, রাধিকা, ব্যাপারটা কি? রাস্তা থেকে হল্লার আওয়াজ পাচ্ছি।

সবাই চুপ। আমিও প্রথমে ভাবলাম হয়ত প্রতিবেশীদের কেউ। চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে আপত্তি জানাতে এসেছেন।

পাঞ্জাবী পরা একটি ভদ্রলোক। চোখে চশমা। দুটো হাতে আস্তে আস্তে তালি দিচ্ছেন।

এক বৈষ্ণব ভক্তকে দেখেছিলাম সর্বদা তালি দিয়ে গৌরের নাম করতেন, এঁরও কি সেই অবস্থা?

রাধিকাবাবু শশব্যস্ত হয়ে খাটিয়া থেকে নেমে পড়লেন।

আরে পবিত্রদা! কি ভাগ্যি, আসুন, আসুন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, ইনি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

নামটা পরিচিত ঠেকল। বেশ কিছুদিন আগে 'দেশ' পত্রিকায় গোটাদুয়েক লেখা বেরিয়েছে। সম্পাদকের নাম দেখেছিলাম পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

পবিত্রদা খাটিয়ার একপাশে বসলেন। হাতের তালি তখনও থামে নি। কৌতূহলবশতঃ উঁকি দিতেই পাশ থেকে একজন বললেন, কি দেখছেন? খৈনি। পবিত্রদার আবাল্য সঙ্গী।

কথাটা পবিত্রদার কানে গিয়েছিল। হাতের জিনিসটা দাঁতের ফাঁকে ঢেলে দিয়ে বললেন, আবাল্য না হোক, আমরণ সঙ্গী।

হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেলেন। রাধিকাবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, এঁকে তো চিনলাম না।

সুশীল জানা পরিচয় করিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বর্মা থেকে এসেছেন।

বর্মা থেকে? পবিত্রদা আমার দিকে ঘুরে বসলেন, লেখেন-টেখেন নাকি মশাই?

ঘাড় হেঁট করে সলজ্জ কণ্ঠে বললাম, অল্প-সল্প।

রাধিকাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, পবিত্রদা, চেহারা দেখে লেখক চিনলেন কি করে?

পবিত্রদা হেসে বললেন, যেমন করে শিকারী বেড়াল চিনি।

গোঁফ দেখে। আরে, আমার তো এই কাজ। কত লেখকের যাওয়া-আসা দেখলাম বল তো?

তা সত্যি। এতদিন পরে বুঝতে পারি সেটা কত সত্যি। যে একলাইন লিখেছে, পবিত্রদার সেই অনুজ। তাকে টেনে নিয়ে চলেছেন সাহিত্যের এক দপ্তর থেকে আর এক দপ্তরে। প্রতিষ্ঠিত না-করা পর্যন্ত পবিত্রদার শান্তি নেই। পবিত্রদার অলক্ষে তাঁর সুহৃদরা বলে, পবিত্রদা যোগাযোগের রাজা। King of conjunctions.

এমন নিরহঙ্কার, অনলস, সাহিত্যব্রতী মানুষ আর দুটি নেই। আজও পথে-ঘাটে দেখা হলে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, হরি সায়েবের খবর কি?

অফিসের চাকরির ব্যাপারে বেশিরভাগ সময় প্যাণ্ট-কোট পরা থাকে বলেই আমার এই নব-নামকরণ।

পরে পবিত্রদা আমার বাড়িতেও এসেছেন। 'ইরাবতী'র পাণ্ডুলিপি শুনেছেন বসে বসে। যেখানে ভাল লেগেছে, তারিফ করেছেন।

ইতিমধ্যে খাটিয়া-সমিতিতে সাহস করে আমিও দু-একটা লেখা পড়েছি। কবিতা আর গল্প। কিন্তু অনেকদিন জুত-সই কোন সাহিত্যিকের দেখা পাচ্ছি না।

হঠাৎ বরাত খুলল।

কি উপলক্ষে কোর্ট বন্ধ ছিল। দুপুরবেলা ছাতা মাথায় রাধিকাবাবুর বাড়িতে এসে হাজির।

কি ব্যাপার? এই অসময়ে?

রাধিকাবাবু বললেন, তাঁর নতুন বই বেরিয়েছে 'কলঙ্কিনীর খাল'। সেই বই তিনি এক কপি দেবেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দকে। জাঁদরেল সাহিত্যিক দেখার আমার যখন এত লোভ, তখন তাঁর সঙ্গে গেলে আমার বাসনা চরিতার্থ হবে।

তিল বিলম্ব না করে তৈরি হয়ে রাধিকাবাবুর কাছে এসে দাঁড়ালাম।

চলুন।

ট্রামলাইন পার হয়ে গলি-ঘুঁজি ধরে দুজনে হাঁটতে শুরু করলাম।

উৎসাহে, উৎকণ্ঠায় আমার প্রায় বাক্‌রোধ হবার অবস্থা। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলাম, শৈলজাবাবু কি টালিগঞ্জেই থাকেন?

রাধিকাবাবু মুখ টিপে হাসলেন, কিন্তু ভাঙলেন না। অনেকক্ষণ পরে বললেন, সাহিত্যিকদের কি আর ঠিক কোন আস্তানা থাকে!

গোলমেলে উত্তর। আর ঘাঁটালাম না। কেবল মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কি ভাবে কথা শুরু করব শৈলজানন্দের সঙ্গে। তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলে কি উত্তর দেব। কয়লা-কুঠির জীবনের জাদুকর, মাটির অন্ধকারের তলায় নেমে যারা জীবিকা আহরণ করে, তাদের জীবনের রঙ নিয়ে শৈলজানন্দ ছিটোন পাতার ওপরে। হাসি-কান্নায় ঘেরা সাঁওতাল-দম্পতির ছবির টুকরো আঁকেন। তাদের বিলাস-ব্যসন, প্রেম-প্রীতির মায়াজাল।

একটু তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম, চমক ভাঙল রাধিকাবাবুর গলার স্বরে।

এই যে এদিকে।

ঘাড় তুলে দেখলাম স্টুডিওর গেট। সাইনবোর্ডে লেখা 'ভারতলক্ষ্মী স্টুডিও'।

ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর বাগান পার হতে হতে আর একবার জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, এখানে যে?

রাধিকাবাবু মুচকি হাসলেন, চলুন না, রথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে।

স্টুডিওর ফ্লোরে গিয়ে হাজির হলাম। জীবনে এই প্রথম। এ ভাবে স্টুডিওর মধ্যে সেট তৈরি করে স্যুটিং হয়, জানা ছিল

না। বর্মায় তু একবার স্যুটিং দেখেছি। কিন্তু একেবারে অন্য ব্যাপার।

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ হৈ হৈ শব্দ। একটা লোক তীরবেগে ছুটতে ছুটতে মরিয়ম জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটর এসে দাঁড়াল। তার ভেতর থেকে ঝপাঝপ তুজন পুলিস লাফিয়ে পড়ল রাস্তার ওপর। তুজনের হাতেই পিস্তল।

ভাবলাম খুনী আসামীর সন্ধান পেয়েছে পুলিস। প্রথম যে লোকটা ছুটে পালাল, সেই আসামী। এখনি একটা গুলি ছোঁড়া-ছুঁড়ি হবে। সবেগে রাস্তা পার হয়ে নিরাপদ দূরত্বে পালাবার মুখেই বাধা। গাছের ওপর থেকে চিৎকার।

মুখ তুলেই অবাক। সামনের কোকোপিন গাছের ডালে মাচা বেঁধে একজন। বিরাট এক ক্যামেরা নিয়ে বসে। আমি বোধহয় ফোকাসের আওতার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, তাই ওই চিৎকার।

এ ছাড়াও স্যুটিং দেখেছি। একবার এক সিনেমা কোম্পানি আমাদের স্কুলের ছাতটা ভাড়া করেছিল। সেও এই চোর-পুলিসের ব্যাপার। ফুটখানেক চওড়া কার্নিশ দিয়ে যেভাবে চোর দৌড়তে আরম্ভ করেছিল, তাতে তার ভবিষ্যৎ ভেবে আমাদেরই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল।

এখন শুনি, এসব বিপদের ঝুঁকি নেবার আর প্রয়োজন হয় না, ট্রিক ফটোগ্রাফিতে অসাধ্য সাধিত হয়।

শুধু সিনেমায় কেন, এখন সর্বত্রই এই 'ট্রিকে'র কারসাজী। মানুষের আসল রূপ ঢাকা পড়ে গেছে। আচারে, আচরণে, কথাবার্তায় যার যত 'ট্রিক' করায়ত্ত, বিদগ্ধ সমাজে কলকে পান তিনিই সবচেয়ে বেশি।

যাক, স্টুডিওয় এসে পৌছলাম।

একটা বড় পাথার সামনে বধূবেশী সন্ধ্যারাণী দাঁড়িয়ে। কনে-চন্দন আঁকা মমতাময়ী আনন। আয়ত চোখে স্বপ্নের ঘোর। এ

পাশে একটা গোটানো বিছানার ওপর ধীরাজ ভট্টাচার্য। বরবেশে। তখনও তিনি নটবর রূপেই আত্মপ্রকাশ করছেন, ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন নি। ছড়ানো ছিটানো ভাবে আরও কয়েকজন এদিকে-ওদিকে জটলা করছেন।

স্যুটিংয়ের ব্রেক। সবাই বিশ্রাম নিচ্ছেন।

আমি এদিক-ওদিক চোখ ফেরালাম। যাঁকে দেখতে এসেছি, তিনি কোথায় ?

চুপি চুপি কথাটা রাধিকাবাবুকে বললাম, শৈলজাবাবু কোথায় ?

রাধিকাবাবু চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন।

স্টুডিওর দরজার পাশে একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। একমাথা কোঁকড়ানো চুল ব্যাকব্রাশ করা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। সুন্দর শিল্পীজনোচিত মুখশ্রী। দুটো হাত পেছনে রেখে অনেক দূরের দিকে চেয়ে আছেন।

ভাল লাগল। মন বলল, এমনটিই খুঁজছিলাম। ভীড় থেকে স্বতন্ত্র, কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন, উদাস-দৃষ্টি রূপ-স্রষ্টা। মাটির অন্ধকার অভ্যন্তরে যারা গাঁইতি চালায়, হাঁড়িয়ার নেশায় পৃথিবী ভোলে, ভালবাসার জন্য সর্বস্ব বিলোয়,—তাদের হাসিকান্না, প্রেম-বিরহের মালা গাঁথেন শৈলজানন্দ। শুধু মানুষগুলোকেই নয়, মাটি, কয়লার চাঙড়, ট্রলি, ডেভিস ল্যাম্প—সব কিছুকে তিনি ভাল-বেসেছেন, তাই তাঁর রচনা নিখাদ। কলমের ডগায় সাঁওতাল-দম্পতির হৃদ্‌স্পন্দনটুকুও এত বাস্তব।

মুখ ঘোরাতেই চোখাচোখি হল রাধিকাবাবুর সঙ্গে। এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, কি খবর রাধিকা ?

ততক্ষণে ধীরাজ ভট্টাচার্য উঠে সেটের মধ্যে ঢুকেছেন। আমরা দাঁড়ালাম গোটানো বিছানার সামনে।

শৈলজাবাবু কাছে আসতে রাধিকাবাবু 'কলঙ্কিনীর খাল' বইটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আমার নতুন বই।

শৈলজানন্দ দ্রুত বইটার পাতা উল্টে নিলেন, তারপর বললেন, দিন দুয়েক একটু ঝামেলায় আছি, তারপরই বইটা পড়ব। নতুন বই হাতে এলে এখনও আমি পাগল হয়ে যাই।

কথার ফাঁকে ফাঁকে বার তিনেক আমার দিকে চোখ ফেরালেন।

আমি তখন মোহাবিষ্ট। জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে, কমনীয় ব্যক্তিত্বে, ভাবাতুর দৃষ্টিতে আমি সাহিত্যিক শৈলজানন্দের খোঁজ পেয়েছি। আমার মনের নিভৃতে শৈলজানন্দের যে ছবি আঁকা ছিল, তার সঙ্গে আমার সামনে দাঁড়ানো শৈলজানন্দের অদ্ভুত সাদৃশ্য।

উত্তরকালে বহু সাহিত্যিককে দেখে কিন্তু হতাশ হয়েছি। মনে আঁকা ছবির সঙ্গে চোখে দেখা চেহারার কোন মিল খুঁজে পাই নি।

শৈলজানন্দের দৃষ্টির অনুসরণ করে রাধিকাবাবুর আমার কথা মনে পড়ে গেল।

আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সাহিত্য তথা সাহিত্যিক-প্রীতিরও একটু আঁচ দিলেন।

তারপর এক অদ্ভুত কাজ করলেন শৈলজানন্দ। আমার একটা হাত ধরে বললেন, আসুন এদিকে।

টানতে টানতে একেবারে বিবাহ-সভায় নিয়ে এলেন। ততক্ষণে ধীরাজ ভট্টাচার্য আর সন্ধ্যারাণী মুখোমুখী বসেছেন। একপাশে কলাগাছ, বিবাহের যাবতীয় সরঞ্জাম, অন্তরালে শাঁখ হাতে মহিলারা।

বিয়ের আসরে আমায় শৈলজানন্দ বসিয়ে দিলেন। না, বরের আসনে নয়, সেখানে যোগ্য লোক ছিল, আমাকে বসালেন কলাগাছের কাছে সিঁড়ির ধাপে। নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে।

আমার অবস্থা খুবই সঙ্গীন। কিছু ভয়, কিছু উত্তেজনা, কিছু কৌতূহল। সব মিলে বিচিত্র এক অনুভূতি।

আলো জ্বলল, ক্যামেরার হাতল ঘুরল, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হল। আমার দৃষ্টি কিন্তু শৈলজানন্দের দিকে।

'টেক' শেষ হতে শৈলজানন্দ আবার এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন।

উঠুন, পিঁড়ি ধরতে হবে।

মানে, সন্ধ্যারাণীকে পিঁড়িশুদ্ধ ঘোরাতে হবে ধীরাজ ভট্টাচার্যের চারপাশে। বার সাতেক। আমি একলা নয়, আমার মত আর একজন দীর্ঘ চেহারার ছোকরাও তৈরি ছিল।

আমার কপালে বেশ ঘাম জমেছে। বুকের স্পন্দন স্বকর্ণে শুনতে পাচ্ছি।

খুব মৃদুগলায় বললাম, না, আমি পারব না।

সেকি ? ভয় না লজ্জা ?

আমি মনে মনে বললাম, দুইই। তারপর দ্রুতপায়ে আসর ছেড়ে রাধিকাবাবুর পাশে গোটানো বিছানার ওপর এসে বসলাম।

রাধিকাবাবু হাসলেন, কি, পালিয়ে এলেন কেন ?

রাধিকাবাবুকে উত্তর দিলাম, পরের বিয়ে দেখতে আমার ভাল লাগে না।

এ ঘটনার অনেক বছর পরে।

সব পেয়েছির আসর-এর উদ্যোগে সাহিত্যিকরা অভিনয় করছেন 'ভাড়াটে চাই।'

স্বপনবুড়োর এক চিঠি এসে হাজির। অভিনয়ে আমাকে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

স্কুল কলেজ জীবনে অভিনয় কয়েকবার করেছি।

প্রথম অভিজ্ঞতার কথা মনে আছে। রীতিমত তিক্ত অভিজ্ঞতা। বই 'ভক্তির ডোর'। আমি সেজেছি শ্রীকৃষ্ণ। তখন বয়স বছর বারোর বেশি নয়। স্কুলের স্টেজে থিয়েটার। এক পার্শী ভদ্রলোক

এসেছেন রঙ মাখাতে। আমি শ্রীকৃষ্ণ সাজব শুনে প্রথমেই আমাকে নিয়ে পড়লেন।

পকেট থেকে ননীচোরার হামাগুড়ি দেওয়া এক ছবি বের করে পিন দিয়ে দেওয়ালে আটকালেন, তারপর চলল আমার সর্বাঙ্গে গাঢ় নীল বর্ণ লেপন। নবদূর্বাদল শ্যাম। রং মাখানো হতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন। মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হল খুশিই হলেন। তারপর হাত পায়ের চেটোয় আলতা মাখালেন। সব শেষ হতে ময়ূরপুচ্ছ, পীতধড়া, অবশেষে মোহনবাঁশী।

নীলবর্ণ শৃগাল সেজে অভিনয় করলাম। গায়ের নীল রংটা বোধ হয় বেশ একটু চটচটে ছিল, কারণ, শেষ দৃশ্যে ভক্তকে আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গে দুজনে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গেলাম। এই জন্যই শাস্ত্রে বলেছে, ভক্ত আর ভগবান একাত্মা। এক দেহ।

যাক, অভিনয় শেষ হল। এবার বাড়ি ফেরার পালা। পার্শী ভদ্রলোক অভিনয় শুরু হবার সঙ্গেই চলে গেছেন। তাঁর অন্য জায়গায় বায়না ছিল।

তা থাক, কিন্তু আমি পড়লাম মুশকিলে। জল দিয়ে রগড়াতেই নীলবর্ণ ঘন নীলবর্ণ হয়ে দাঁড়াল। এরপর তেল দিয়ে চেষ্টা করলাম। তাতে রঙের ঔজ্জ্বল্য বাড়ল। একটা দেবোপম জ্যোতি। কাপড় ঘসলাম। দু এক জায়গায় চামড়া ছড়ে গেল, কিন্তু রঙ তথৈবচ।

এবার চোখ দিয়ে জল পড়তে আরম্ভ করল। একটু বোধহয় ফোঁপাতেও শুরু করেছিলাম। গ্রীনরুম খালি। যে যার সরে পড়েছে।

এভাবে পথ দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আমার দেবত্বকে পথচারীরা বিশেষ খাতির করবে এমন মনে হল না। একমনে শ্রীকৃষ্ণকেই ডাকছি, ভক্তের সংলাপগুলো আউড়ে যাচ্ছি, এমন সময় বিধি সদয় হলেন।

আমাদের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ( বাস্তব জীবনে ইনি ছিলেন প্রধান শিক্ষকের সহধর্মিনী ) গ্রীনরুমে ঢুকেই রোরুদ্যমান অবস্থায় আমায় দেখতে পেলেন। হাতে ধরে বাড়ি নিয়ে গেলেন। গ্লিসারিন আর সাবানের কল্যাণে বহু কষ্টে 'নীলত্ব' থেকে মুক্তি পেলাম। জীবনের প্রথম অভিনয়ের সেই 'নীল দর্পণ'-এর স্মৃতি এখনও হৃদয়ে অমলিন। পরবর্তী অভিনয়ের রাত্রে রঙ মাখতে বসেই বহুবার শিউরে উঠেছি।

শখের অভিনয়ে এমন ঘটনা বহু অভিনেতার জীবনেই ঘটে। আমারও ঘটেছিল।

আর একটা ব্যাপারের কথা মনে পড়ছে। কলকাতায় আমাদের পাড়ায় একবার 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় হয়েছিল। চাণক্য সেজেছিলেন আজকের খ্যাতনামা কৌতুক-অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি চন্দ্রগুপ্ত। মহারাজ নন্দের ভূমিকায় ছিলেন শৌখীন একটি ছোকরা। তাঁর নামটা মনে পড়ছে না, তবে এটুকু মনে আছে, তিনি নিজের পোশাক নিজে এনেছিলেন বাড়ি থেকে। শুধু পোশাক নয়, এক বোতল সিরাপও এনেছিলেন। মদ্যপানের দৃশ্যে ব্যবহার করবেন বলে।

নন্দের রাজসভার দৃশ্যে আমি উইংসের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। সে দৃশ্যে আমার পার্ট ছিল না। লক্ষ্য করলাম নন্দ প্রত্যেকবারই মদিরাপাত্র মুখে ছুঁইয়েই মুখ বিকৃত করছেন। আশ্চর্য লাগল। ঐতিহাসিক নন্দের ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির খোঁজ রাখি না, তবে নাটকের নন্দ ঘোরতর মদ্যপ, আসবে অন্তহীন আসক্তি এটুকু জানতাম। সেই নন্দের মদে বিতৃষ্ণা। বিস্মিত হলাম।

তারপর যথারীতি নন্দ হত্যার পর, নিরালায় পেয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ মশাই, মদের পাত্র মুখে ঠেকিয়ে নামিয়ে রাখছিলেন কেন? মহারাজ নন্দের তো এমনটি হবার কথা নয়।

আমার কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক যেন ফেটে পড়লেন, রাখুন মশাই, আর জীবনে আপনাদের ক্লাবে প্লে করতে আসছি না।

হল কি ?

হল কি! নন্দ ক্ষেপে উঠলেন, পয়সা খরচ করে সিরাপ কিনে এনেছিলাম আয়েস করে খাব বলে, আর কে মশাই সিরাপটুকু খেয়ে বোতলে আলতা ভরে রেখেছে। দুএক চুমুক খেয়েই মেজাজ বিগড়ে গেল। ভাগ্যিস হত্যাটা চট করে হয়ে গেল, তাই বাঁচোয়া।

কাজেই শখের থিয়েটার সম্বন্ধে একটু ভীতি ছিল, বিশেষ করে সাহিত্যিকদের অভিনয়। যার যা ইচ্ছা সংলাপ বলবেন বানিয়ে বানিয়ে, যে দৃশ্যে প্রবেশ করার কথা নয়, সে দৃশ্যে ঢুকে আর প্রস্থান করতে চাইবেন না।

অনেক ভেবে-চিন্তে চুপচাপ বসে রইলাম।

দিন সাতেক পরেই দ্বিতীয় পত্রাঘাত। অত্যন্ত জরুরী। বুধবার বিকেলে যেতেই হবে।

অগত্যা। শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের তিনতলায়। মেঝেয় ঢালা সতরঞ্চ পাতা। ইতস্ততঃ কয়েকজন বসে আছেন। তাঁদের কাউকেই চিনি না। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। সম্ভবতঃ এঁদের অনেকের লেখা পড়েছি, কিন্তু মানুষটিকে চিনি না।

একটু পরেই শৈলজানন্দ এলেন। বুঝতে পারলাম এ যজ্ঞের ইনিই হোতা। শৈলজানন্দ নিজে যে সু-অভিনেতা তা জানতাম, কিন্তু অভিনয় শিক্ষক হিসেবে তিনি যে কত উঁচুদরের, তার পরিচয় পেলাম 'ভাড়াটে-চাই' এর মহলার দিনগুলোয়। অক্লান্ত কর্মী, এক সংলাপ বার বার শেখাতে কোন বিরক্তি নেই, একেবারে আনকোরা অভিনয়েচ্ছু সাহিত্যিককে মেজে-ঘষে মঞ্চযোগ্য করে তুলতে অসীম উৎসাহ।

আসল কথাটা বললাম কয়েকদিন পর।

এক রবিবার মহলা ছিল। মহলা শুরু হয়েছিল বেলা সাড়ে চারটেয়, আমি গিয়ে পৌঁছলাম পাঁচটা নাগাদ। সম্ভবতঃ সময়টা আমার শুনতে ভুল হয়ে থাকবে।

আমি যখন গিয়ে হাজির হলাম, তখন সাহিত্যিকরা একে একে বাড়ি ফিরছেন।

শৈলজানন্দ মোটরে উঠতে যাচ্ছেন, আমি মুখোমুখি পড়ে গেলাম।

এই যে হরিনারায়ণ এসেছে রিহার্সাল দিতে। শৈলজানন্দ মন্মথ রায়ের দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললেন।

আমি নিরুত্তর। উত্তর দেবার কিছু ছিলও না। লজ্জা ঢাকতে মাথা নীচু করে রইলাম।

কিঁ, বাড়ি ফিরবে তো? শৈলজানন্দ এবার আমার দিকে ফিরলেন।

ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

উঠে এস গাড়িতে। আমি ধর্মতলার দিকে যাব।

গাড়িতে উঠলাম। যেতে যেতে শৈলজানন্দ অনেক কথা বললেন। তাঁর সাহিত্য-জীবনের আদি কথা। তাঁর সিনেমা-পরিচালনার পতন-অভ্যুদয়ের ইতিহাস। সেই সুযোগে আমি বলে ফেললাম কথাটা।

বহু বছর আগে তিনি হাত ধরে আমাকে বিয়ের আসরে বসিয়ে দিয়েছিলেন দর্শক রূপে। বললাম, বইটার নাম 'নন্দিনী'।

সব শুনে সশব্দে হেসে উঠলেন। আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, বল কি হে, তুমি তো তাহলে খুবই ভাগ্যবান। স্টুডিওতে প্রথম গিয়েই চান্স পেয়ে গিয়েছ।

.তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে বললেন, 'নন্দিনী' আমার

মানসকন্যা। বইটার ওপর আমার কেমন একটা দুর্বলতাও আছে। তাছাড়া সে যুগে বইটা পয়সাও দিয়েছিল খুব।

তারপর বহুবার শৈলজানন্দকে দেখেছি। নির্বিরোধ, উদারচিত্ত, আমেজী মানুষ। দেখা হলেই বুকে টেনে নিয়েছেন। একদিনের ঘটনার কথা বলি।

লিণ্ডসে স্ট্রীটে এক বইয়ের দোকানে মনোমত বই খুঁজছি। নিবিষ্টচিত্তে বই দেখছি একটার পর একটা। হঠাৎ একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে মৃদু ধাক্কা লাগল। তিনি বিপরীত দিক থেকে বই খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে আসছিলেন।

ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখি শৈলজানন্দ।

আরে হরিনারায়ণ, কি খুঁজছ?

বললাম, মোরাভিয়া।

আমি কাম্যু। আমি তো খুঁজে হায়রাণ। তুমি দেখ তো পাও কিনা।

একটু খোঁজার পরেই মোরাভিয়ার একটা বই পেলাম, অবশ্য যেটা খুঁজছিলাম সেটা নয়, কিন্তু কাম্যুর কোন বই পাওয়া গেল না।

বিদায় নেবার আগে প্রণাম করতেই শৈলজানন্দ ঘাড় নাড়লেন, উঁহু, এ প্রণাম মঞ্জুর নয়। আমার বাড়িতে আসনি কেন?

তাঁর কথায় মনে পড়ে গেল, বিজয়া দশমীর পর এই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। বললাম, যাব একদিন। নিশ্চয় যাব।

তিনি ফোন নম্বর দিলেন। একবার ফোন করে এস। জানতে পারলে বাজে ঝামেলা সরিয়ে দেব।

হেসে বললাম, আচ্ছা, যাবার আগে ফোন করব।

তাঁর বাড়িতে গেছি। অবশ্য এ ঘটনার অনেক পরে। এক প্রকাশক বন্ধুর তাগিদে।

ঘরোয়া পরিবেশে মানুষটি যেন আরও মধুর, আরও সহজ। আমি তখন একটু অসুস্থ ছিলাম। তিনি কাছে বসে রোগের বিশদ শুনলেন। হোমিওপ্যাথি একটা ওষুধের কথাও বললেন। পাছে ভুলে যাই বলে লিখে দিলেন একটা কাগজে।

শৈলজানন্দের কোন আবরণ নেই। তথাকথিত কৃত্রিমতার আবরণ। অমিয়ভাষী, অমায়িক এই সাহিত্যিক মুহূর্তে মানুষকে আপন করে নেন। একবার এঁর স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পেলে আর অসুবিধা নেই।

কথক শৈলজানন্দের মজলিসী কাহিনীতে মশগুল হয়ে যেতে হয়।

'নন্দিনী'তে আমার প্রথম চিত্রাবতরণ—কিন্তু শেষ নয়।

আর একবার বিপাকে পড়তে হয়েছিল!

এক বীমা কোম্পানিতে কাজ করি। অফিস পাঁচতলায়, চেয়ারম্যান বসেন একতলায়। কাজেই দিনে বার তিনেক লিফ্‌টে ওঠা-নামা করতে হয়।

একদিন লিফ্‌টে নামতেই এক ভদ্রলোকের প্রায় নিষ্পলক-দৃষ্টির মুখোমুখি হলাম। একটু অস্বস্তিও হল। কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ গাড়ির সেল্‌ফ্‌-স্টার্টারটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় নেমে হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে হয়েছিল। কালিঝুলি হাতে লেগেছিল। হাত থেকে মুখে লাগা বিচিত্র নয়। ভদ্রলোক সেই মসীরেখা হয়তো তদ্‌গতচিত্তে নিরীক্ষণ করছেন।

ব্যাথরুমে ঢুকে চেহারাটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম, না, মুখে কোথাও কলঙ্ক-চিহ্ন নেই। তবে ?

চেয়ারম্যানের চেম্বার থেকে ফেরবার সময়ও দেখলাম ভদ্রলোক একভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টি অধীনের দিকে।

এবারে ভদ্রলোক লিফ্‌টে আমার সঙ্গে উঠলেন। আমায় অনুসরণ করে পাঁচতলায়।

নিজের সীটে ফিরে এসে ভাবতে লাগলাম। চাকরির সুতো প্রায় ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে ছড়ান ছিল। কাজেই বহু জায়গায় যেমন ঘুরেছি, বহু লোকের সঙ্গে তেমনি আলাপও হয়েছিল। তাঁদেরই কি কেউ? না চিনতে পারার জন্য ভদ্রলোক কি মনে করলেন কে জানে।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। বেয়ারা একটা স্লিপ এনে রাখল টেবিলের ওপর। নামটা পরিচিত ঠেকল না। সাক্ষাতের কারণ লেখা আছে, ব্যক্তিগত।

সরানো ফাইলগুলো কাছে টেনে নিলাম। বাইরের লোকের কাছে একটা ব্যস্ততার ভান দেখাতে হয়। না হলে ইজ্জত থাকে না।

ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকতেই সোজা হয়ে বসলাম।

নিষ্পলক কটাক্ষকারী সেই ভদ্রলোক।

নমস্কার করে ভদ্রলোক বসলেন। আমার প্রয়োজনটা একটু ব্যক্তিগত।

হ্যাঁ, সেটা স্লিপে আপনি উল্লেখ করেছেন।

আপনাকে একটা অনুরোধ করব, যদি আপনি বিরক্ত না হন।

বলুন।

ফিল্মে অভিনয় করা সম্বন্ধে আপনি ভেবেছেন কিছু?

কৌতূহল চরমে উঠল। বললাম, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। একটু ভেঙে বলুন।

ভদ্রলোক ভাঙলেন। 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' বই উঠছে। তিনি উদ্যোক্তাদের একজন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর ভূমিকায় আমাকে নাকি চমৎকার মানাবে। দুদিনের কাজ।

গম্ভীর গলায় বললাম, মাপ করবেন। এ সব ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নেই।

ভেবেছিলাম এ কথার পর ভদ্রলোক উঠে যাবেন, কিন্তু তিনি

উঠলেন না। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, সচরাচর যে ধরনের বই বাজারে দেখানো হয়, এই বইটিকে সে পর্যায়ে ফেলবেন না। আমরা ক'জন প্রাণপাত করছি বইটার জন্য। বেছে বেছে অভিনেতা জোগাড় করছি। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতাদের সঙ্গে যাঁদের চেহারার একটু মিল আছে, তাঁদেরই কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। আপনার এই অফিসেই আমি তিন দিন ধরে আসছি। এ ধরনের বইয়ে কি আপনাদের সহযোগিতা পাব না?

ভদ্রলোকের কথার আন্তরিকতা হৃদয় স্পর্শ করল। সবদেশে সর্বকালে এই ধরনের কতকগুলো মানুষ থাকে, যাদের বুকে জ্বলে অনির্বাণ শিখা। পুরনো চিরাচরিত প্রথা আর পদ্ধতিকে তারা পুড়িয়ে ফেলে। নতুন পথে, নতুন চিন্তাধারা নিয়ে তারা এগোয়। শুধু ছায়াচিত্রে নয়, শিল্পকলায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে তারা পথ কেটে কেটে অগ্রসর হয়। সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের বাধা ঠেলে। মানুষের রুচিকে উন্নততর করার আদর্শ নিয়ে।

বললাম, একটু ভেবে বলব। কাল আসবেন।

ভাববার বিষয় ছিল। আর অকৃতদার নই। দক্ষিণ কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করেছি। আমার এই চিত্রাবতরণ তাঁরা কি ভাবে নেবেন, সেটাও বিবেচ্য। তবু শেষ পর্যন্ত অন্তরের অতৃপ্ত কামনাই জয়ী হল। এরও একটা কারণ ছিল।

জীবনে ব্যবহারজীবি হবার সংকল্প ছিল। ঘটনাচক্রে সে পেশা থেকে সরে আসতে হয়েছিল। ভদ্রলোকের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম আমার ভূমিকা অম্বিকা চক্রবর্তী আর মাস্টারদাকে আইনের কবল থেকে বাঁচানো। সাক্ষীদের সওয়াল জবাব করার ব্যাপারই নয়, বিচারপতির সামনে ছোটখাটো একটা বক্তৃতাও ছিল। আর্গুমেণ্ট।

কলকাতার কোর্টে যে স্বপ্ন সফল হয় নি, অন্তত ছায়ালোকে তার কিছুটা আস্বাদ পাব, এইটুকুই আমাকে উৎফুল্ল করে তুলল।

আমি ভদ্রলোককে বললাম, অভিনয় করতে আমি রাজী, শুধু এক সর্তে। সংবাদপত্রে, সেলুলয়েডে, প্রচার-পত্রে কোথাও আমার নামের উল্লেখ থাকবে না।

ফ্লোরে গিয়ে একটি পরিচিত মুখ খুঁজে পেলাম। চিত্রশিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় রূপদান করছেন অম্বিকা চক্রবর্তীর ভূমিকায়। ভদ্রলোক আমার চেয়েও উৎসাহী। দাড়ি-গোঁফের ব্যাপারে অন্যের ওপর নির্ভর না করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। নিজের গালের ওপরই চাষ শুরু করেছেন।

দুদিনের কাজ, দুদিনই লাগল।

তারপর চলল কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে দিন যাপন। সংবাদপত্র কিংবা পত্রিকায় নির্মীয়মান চিত্রের তালিকায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নাম দেখলেই দুরু দুরু বুকে চোখ বোলাই। না, কথা রেখেছেন ভদ্রলোক। কোথাও আমার নাম দেন নি।

বই শেষ হল। এক শুভদিনে দক্ষিণ কলকাতার 'বিজলী' সিনেমা গৃহে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'-এর প্রদর্শনী শুরু হল। অবশ্য উত্তর কলকাতায় কোন্ সিনেমায় শুভমুক্তি হয়েছিল, খোঁজ রাখিনি।

সেদিন সকালেই বাড়ি থেকে বেরোলাম। উদ্দেশ্য একটা টিকেট কিনে প্রথম 'শো'টাই দেখব। অন্তত নিজের ভূমিকাটুকু।

বিজলীর সামনে নেমেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। বেশ ভীড়। ভীড় যে কেবল বইটার জন্য তা নয়, বিজলীর প্রশস্ত চত্বরে শহীদ বেদী তৈরি হয়েছে। ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন। অনেক দেশ-নেতাদের ছবিও টাঙানো হয়েছে। অগ্নিযুগের বিপ্লবী আত্মা আর বাংলাদেশের চিন্তানায়কদের।

ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল। এ আমাদের অন্য ধরনের বই।

ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। বুঝলাম সেদিনের টিকেট পাবার আশা দুরাশা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্টিল ছবিগুলো দেখতে লাগলাম।

আর বেশি দেখতে হল না। একটা ছবির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

গাউন গায়ে বক্তৃতারত আমার ছবিটি একেবারে সামনে টাঙানো। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে একটুও সাদৃশ্য নেই। সে সাদৃশ্য আনার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও হয়নি। অথচ আমার মনে আছে পেণ্টার দেশপ্রিয়র একটি ছবি সামনে রেখে আমায় রঙ মাখাতে বসেছিলেন। এক ঘণ্টার ওপর সময় নিয়েছিলেন, শুধু মাঝখানে সিঁথি দিয়ে চুলের কসরৎ করতে। গোটা দশেক চশমা এসে জড় হয়েছিল। বহু প্রয়াসে ঠিক চশমাটা বাছাই করা হয়েছিল। এত চেষ্টা সত্ত্বেও ক্যামেরার ঈগলচক্ষু ক্ষমা করেনি। আমার নির্ভেজাল চেহারাটাই তুলে ধরেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলাম। স্টিল ছবি টাঙাতে পারবেন না, ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন কোন চুক্তি অবশ্য করিনি। করার প্রশ্নই ওঠেনি। দশ মিনিটের ভূমিকার এ অপপ্রচার অচিন্তনীয়।

তা ছাড়াও আর একটা কথা মনে পড়ল। বিজলীর প্রায় বিপরীত দিকেই আমার শ্বশুরালয়।

এক সকালে সরকারি টিকেট আঁটা লম্বা সাইজের এক খাম এসে হাজির। ভুল ঠিকানার বিসর্পিল গলি বেয়ে।

চিঠিটা খুললাম। বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ। জাজেস কোর্ট রোড। আলিপুর। মাসখানেক আগে বিজ্ঞাপন দেখে ছেড়েছিলাম, তারই উত্তর।

চিঠিটা পড়েই হতাশ হলাম। যে তারিখে আমাকে সাক্ষাৎ করতে বলা হয়েছে, সে তারিখ পার হয়েছে দিন তিনেক আগে। ভুল ঠিকানার জন্যই চিঠিটা কিছু বিলম্বে হাতে এসেছে।

বাড়িতে কিছু বললাম না, কারণ বাড়ির সকলেই আমার

চাকরি করার বিরুদ্ধে। তাঁদের ইচ্ছা আমি হিন্দু ল পরীক্ষা দিয়ে কোর্টে ভাগ্য পরীক্ষা করি। কিন্তু আমি তাতে নারাজ। ঠিক করলাম খামটা নিয়ে দেখা করব। চিঠিটা যে মাত্র আজ হস্তগত হয়েছে, খামের ওপরের শীলমোহরই তার সাক্ষ্য দেবে।

সাক্ষাতের স্থান ছিল গভর্নমেণ্ট টেস্ট হাউস। সময় একটা থেকে দুটো। ঠিক সেই সময়েই হাজির হলাম।

অফিস আর ল্যাবরেটরি পাশাপাশি। এসিড আর ফাইলের গন্ধ মিশে গিয়েছে। চলতে চলতে নজরে পড়ল একটা বোর্ড। লেখা এন্. এন্. সেনগুপ্ত।

বেয়ারার হাতে স্লিপ দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। জানি এসব ব্যাপারে ভেতরে ঢোকার অনুমতি মেলে অনেক পরে। অনেক সময় অনুমতি মেলেও না। বেয়ারা ফিরে এসে সেকশনের বড়বাবুর কাছে নিয়ে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারা সামনে এসে দাঁড়াল।

যাইয়ে সাব।

পরনে কোট, প্যাণ্ট, টাই ছিল বলেই বোধ হয় এই সম্বোধন।

ভেতরে গেলাম।

টেবিলের ওপারে সুশ্রী, সুদর্শন একটি প্রৌঢ়। বুদ্ধিদীপ্ত, শানিত চেহারা। ঢুকতেই সামনের খালি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন।

বসলাম। খামটা দেখিয়ে সব বললাম।

ভদ্রলোক বিচলিত হলেন। খামটা টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উল্টেপাল্টে দেখলেন। তারপর টেলিফোনের হাতল তুলে ধরলেন।

পুট মি অন্ টু মিঃ গিল্‌মোর—

চাপা গলায় কিছুক্ষণ কথা হল। একটু পরে আমার দিকে ফিরে

বললেন, আপনি অনুগ্রহ করে কাল একবার এই সময় আসতে পারবেন ?

বিস্মিত হবারও একটা সীমা আছে। আমি চাকরীপ্রার্থী। এতদিন দরখাস্ত পাঠানোর পর বিধি সদয় হয়েছেন। তাও মাত্র আধা সদয়। সাক্ষাতের দিন পার হয়ে গেছে। লগ্ন পার হয়ে যাওয়া অনূঢ়া মেয়ের মতন আমার মনের অবস্থা। দুরু দুরু বুক। ছল ছল চাউনি দুটি চোখের। এ সময় এমন সুরের কথা শুনলে হতবাক হবার কথা।

ঘাড় নেড়ে বললাম, বেশ, কালই আসব।

গেলাম পরের দিন। এবার অন্য ব্যাপার। বিরাট এক টেবিলের দুপাশে জন পাঁচেক। বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, আর দাক্ষিণাত্যের মাঝখানে একটি ইংরেজও আছেন। তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

জীবনে চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার এই প্রথম। বুকের স্পন্দন যে স্বাভাবিক ছিল, এমন বড়াই করব না। কিন্তু সব কিছু বেশ ভালই লাগছিল। বিশেষ করে আমি বর্মা ফেরৎ শুনে দু একজন যখন বর্মার রাজনৈতিক আর সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন, তখন আর কোন অসুবিধা হল না। দাক্ষিণাত্য বর্মা দেশের দু একটা ভাষার নমুনা জানতে চাইলেন। বললাম।

দিন চারেক পরে খবর পেলাম চাকরিটা হয়েছে। পরের সোমবার থেকে কাজে যোগ দিতে হবে।

গুটি পনেরো কেরানী। চারটি বেয়ারা, একটি দপ্তরী। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একজন, দুজন অফিসর, মিস্টার গিল্‌মোর আর পার্থসারথী। এই নিয়ে আমাদের সংসার। বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ।

প্রাসাদোপম এক অট্টালিকার একতলা। ওপরে থাকেন প্রাসাদের মালিক মিস মে-বল।

অফিস বলে মনেই হয় না। আলিপুরের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে ফুলের বাগান ঘেরা নিরিবিলি আস্তানা। অফিস্ জীবন ঠিকমত শুরু হবার আগেই অফিসকে ভালবেসে ফেললাম। এ একেবারে তারামৈত্রক ভালবাসা।

আমার কাজ প্রায় শ দেড়েক ফাইলের রক্ষণাবেক্ষণ করা। টেস্ট-হাউস থেকে ফোন আসে, ড্রাইশেল ব্যাটারীর ফাইলটা পাঠিয়ে দেওয়া হোক। দশ মিনিটের মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি ফাইল-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। বহু কষ্টে উদ্ধার করি ড্রাই-শেল ফাইলের শুক্তি। সেটি বেয়ারার হাতে চালান দিয়ে তবে নিস্কৃতি।

একেবারে আনকোরা অফিস। সব টেবিল চেয়ার এসে পৌঁছয় নি। স্টিল-র‍্যাকের অর্ডার গেছে, কবে আসবে সরকার জানেন। ফাইলগুলো মেঝেয় ঠেস দিয়ে গান্ধারীর মতন শতাধিক পুত্র পাহারা দিই। যে ফাইলগুলো ঘন ঘন দরকার পড়ে, সেগুলো রাখি হাতের কাছে, যেমন, আগার-আগার, পিরেথ্রিয়ম, এসেটিক অ্যাসিড প্রভৃতি।

নির্বিবাদেই ছিলাম, হঠাৎ উপদ্রব শুরু হল।

এক দুপুরে বসে বসে একটা ফাইল পড়ছি, হঠাৎ পায়ের ওপর নরম তুলতুলে কি একটা এসে পড়ল। চেয়ে দেখি, ঝাঁকড়া লোমওয়ালা এক কুকুর। কিন্তু কুকুরের এত বিজ্ঞান-স্পৃহা ভাবতেও পারি নি। আচমকা ফিতে কামড়ে টার্টারিক অ্যাসিডের ফাইলটা নিয়ে বিদ্যুৎবেগে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

সর্বনাশ। ডক্টর ভর্মা দিনে দুবার ফাইলটা চেয়ে পাঠান! একটু দেরী হলেই ফোনের ওপর ফোন। এ ফাইলের কোন ক্ষতি হলে

এত কষ্টে সংগ্রহ করা চাকরি থাকা প্রায় অসম্ভব। খোদ ভারত সরকারের তাঁবের চাকরি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বলে একেবারে দোতলায় চলে এলাম।

বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে একটি বৃদ্ধা মহিলা। শুভ্র বেশ, শুভ্র কেশ, গায়ের রংও মোমবাতি-সদৃশ! দুহাত কোলের ওপর রেখে ভাবনায় তলিয়ে গেছেন। এমন একটা বয়সে এ পারের রঙ রস সব মুছে যায়। ওপারের গৈরিক প্রশান্তি হয়ত ফুটে ওঠে। মুখে চোখে ভেসে ওঠে লাইফ বিয়ণ্ড-এর অনন্ত রহস্য।

হতভাগা কুকুরটা দেখলাম ফাইলটা পেতে তার ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছে।

ভেবেছিলাম পায়ের শব্দে মেমের ধ্যানভঙ্গ হবে, কিন্তু তা হল না। ওপরে উঠে কাশলাম, তবুও না। শেষকালে জোর গলায় বললাম, এক্সকিউজ মি।

মেম ঘাড় ফেরালেন। উঠলেন না। বসে বসেই বললেন, কি চাই?

কি চাই বললাম।

মেম তাড়াতাড়ি উঠে কুকুর তাড়িয়ে ফাইলটা আমার হাতে দিলেন। দেবার সময় লক্ষ্য করলাম, আঙুলগুলো থর থর করে কাঁপছে।

একটু ভুল করলাম। ফাইলটা বগলদাবা করে বলে ফেললাম, আপনার কুকুরকে একটু সাবধানে রাখবেন। সরকারের জিনিসপত্র এভাবে নষ্ট হলে আমাদেরও অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

মুহূর্তে মেমের মুখের সাদা রঙ রক্তিমে পরিণত হল। দুটো হাত মুঠো করে প্রায় তেড়ে এলেন আমাকে।

হোআট? কি, তুমি আমাকে সরকারের ভয় দেখাচ্ছ? আমি তোয়াক্কা করি তোমাদের সরকারের? আমার কুকুরের লোম যদি তোমরা ছোঁও তো টানতে টানতে তোমাদের সব কটাকে আমি কোর্টে নিয়ে যাব।

মেমের চীৎকারটা বেশ একটু জোরেই হয়েছিল। নীচে নেমে দেখি সিঁড়ির কাছে জন দুয়েক সতীর্থ জড় হয়েছে। খোদ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও দাঁড়িয়ে আছেন কোমরে হাত দিয়ে।

ব্যাপারটা তাঁকেই বললাম। অবশ্য একটু রঙ চড়িয়ে।

কাজ হল। আহমেদ সায়েব তেতে উঠলেন। আঠার বছর বয়সে ভারত সরকারের অফিসে ঢুকেছেন। একটানা নিমক খেয়েছেন ছত্রিশ বছর। সরকারকে গালাগাল নিজেকে গালাগাল দেওয়ার সামিল মনে করেন।

এত বড় আস্পর্ধা। আহমেদ সাহেব হন হন করে তিন-চার ধাপ উঠে পড়লেন, তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হাউ ওল্ড ইজ সী?

আমি বললাম, সত্তরের ওপর বলেই মনে হল।

ব্যাস, আহমেদ সায়েব নিরুত্তাপ হয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, বুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে কি হবে? আমি ভাবলাম জোয়ান বয়সের কেউ।

বিচিত্র মানুষ। পরেও লক্ষ্য করেছি, অফিস ছুটি হবার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রাম প্রায় খালি, তাও উঠছেন না।

আশ্চর্য লেগেছিল। পরে অফিসেরই একজন সহকর্মী বলেছিল, সমস্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরা বাড়ি না পৌছনো পর্যন্ত আহমেদ সায়েব ট্রামে উঠবেন না। এই এক অদ্ভুত নেশা যৌবন-উত্তীর্ণ ভদ্রলোকের। ছাতিতে ভর দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। ঝড়ের ঝাপটা, বৃষ্টির ফোঁটা কিছুই স্থানচ্যুত করতে পারে না তাঁকে।

যারা আহমেদ সায়েবের সঙ্গে সিমলায় ছিল, তারা বললে, এ রোগ তাঁর বহুদিনের।

যাক, মিস মে-বলের কথায় ফিরে আসি।

দিন দশেক পরে আবার ঘটল ব্যাপারটা।

এবারে ফাইল নয়, গোটান একটা নক্সা।

প্রায় কুকুরের পিছন পিছন ওপরে উঠলাম। পাল্লার নীচ দিয়ে কুকুর ঘরের মধ্যে উধাও। ধারে-কাছে কেউ নেই।

বিপদে পড়লাম। নক্সাটা সেদিন সকালে দিল্লী থেকে এসে পৌঁছেছে। টেস্ট হাউস থেকে খবর এলেই পাঠাতে হবে। ফোন এলে কি করে বলব, ফাইল কুকুরের হেফাজতে।

দরজার কড়া ধরে নাড়লাম। বার তিন চার। ভেতর থেকে কাংস্যকণ্ঠ ভেসে এল, হু ইজ দেয়ার?

পরিচয় দিলেই চিনবেন, এমন অবস্থা নয়। কাজেই কোন উত্তর না দিয়ে কড়া নাড়তে লাগলাম।

কাজ হল। স্লিপার ঘষড়াতে ঘষড়াতে মিস মে-বল বেরিয়ে এলেন মারমূর্তিতে।

কি চাই তোমার? যখন-তখন ওপরে এসে কেন শান্তিভঙ্গ কর?

বিনীত স্বরে বললাম, যখন-তখন আসি না। আর একবার মাত্র এসেছিলাম। সেও প্রয়োজনে। আজকেও তাই।

কুকুরের নক্সা-অপহরণের কথা বললাম। নক্সাটা না পাওয়া গেলে আমার অন্ন উঠবে, সে আভাসও দিলাম।

মনে হল বৃদ্ধা একটু নরম হলেন। বললেন, যাক, তোমার স্বর এবার ভদ্রোচিত হয়েছে। আগের বারের মতন সরকারের হুমকি আমায় দেখাও নি।

বলতে বলতে মিস মে-বল থেমে গেলেন। আমার দৃষ্টির অনুসরণ করে দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালেন, তারপর আশ্চর্য ভিজে গলায় বললেন, কে জান?

ঈশ্বর জানেন কেন এ দুর্মতি হল। বললাম, আপনার স্বামী।

বৃদ্ধা পলকে আরক্তিম হয়ে উঠলেন। সারা মুখে বিদায়ী সূর্যের আভা। অনেক বছরের ছেড়ে আসা যৌবন আবার বুঝি পায়ে পায়ে ফিরে এল দেহের দেহলীতে।

ডোণ্ট বি সিলি, আমি চিরকুমারী। আমার কোনদিন বিয়ে হয় নি।

তবে?

এ ফটো স্যর আলেকজাণ্ডার ককরেনের।

নামটা পরিচিত ঠেকল না। পরিচিত যে ঠেকে নি, চোখ-মুখের ভাবেই বোধ হয় সেটা বোঝা গিয়েছিল। মিস মে-বল বললেন, দিল্লীর বড় অফিসর ছিলেন। এক ডাকে সবাই চেনে।

তবুও ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না। দিল্লীর বড় অফিসরের প্রতিকৃতি আলিপুরের এক চিরকুমারীর বাড়ির দেয়ালে ঝুলে থাকার রহস্য বোঝা গেল না।

মিস মে-বল আরও বললেন, আমার বাবার কাছেই মানুষ। লেখাপড়ার খরচ সবই বাবাই জুগিয়েছেন। আমরা এক সঙ্গেই ভারতবর্ষে এসেছিলাম। এ বাড়িতেও অনেক বছর কাটিয়ে গেছে। বিয়েও করেছে এ বাড়ি থেকেই। এক দো-আঁশলা ফিরিঙ্গির মেয়ের মধ্যে ও যে কি দেখল যিসাস জানেন। এ বিয়ে করার জন্য ওকে নিজের সমাজে অনেক অপদস্থ হতে হয়েছে। চাকরী-জীবনে আরও উন্নতি হত, কিন্তু বড়লাটও এই বিবাহের ব্যাপারটা প্রীতির চোখে দেখেন নি। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ও ক্লারাকে ছাড়ে নি।

জানি না, এ আমার চোখের ভুল কিংবা মনের ভ্রম কি না, তবে স্পষ্ট যেন দেখলাম, মিস মে-বলের দুটি চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। গলার স্বর বেশ ধরা-ধরা।

আলেকজাণ্ডার ককরেনের ছায়া কতখানি পড়েছিল মিস মে-বলের মনের ওপর আমার তা জানার কথা নয়। এতদিন পরে সে হিসাব-নিকাশ কষার কোন মানেও হয় না। কিন্তু তবু যেন অলক্ষে কোথায় একটা যোগসূত্র রয়েছে, মিস মে-বলের দেয়ালে আলেকজাণ্ডারের ছবি থাকার। স্বপ্নরচনা আর স্বপ্নমেধের দুর্জ্ঞেয় কাহিনী।

দাঁড়াও, তোমার নক্সাটা এনে দিই। মিস মে-বল ঘুরে দাঁড়ালেন। গাউনের আস্তিনে চোখ মুছলেন, তারপর পর্দা সরিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

মিনিট পাঁচেক পরেই ফিরে এলেন। নক্সাটা হাতে করে। একটু রূঢ় কণ্ঠে বললেন, নাও, তোমার নক্সা। আর তোমার ওপরে আসবার কোন প্রয়োজন হবে না। টোবিকে আমি বেঁধে রাখব।

আমি নক্সা নিয়ে নীচে নেমে এলাম।

সম্ভবতঃ মিস মে-বল কুকুরটাকে বেঁধেই রেখেছিলেন, কারণ তারপর থেকে তার অত্যাচার আর আমাকে সহ্য করতে হয় নি।

কিন্তু আমি আর একবার ওপরে উঠেছিলাম। সে অনেক পরে। অফিসে একটা ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের পত্তন করেছিলাম। পিছন দিকের লনে খেলা হত। একটা টুর্নামেণ্টের ব্যবস্থাও হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল ফাইনাল খেলার দিন আহমেদ সায়েবকে সভাপতি করে বিজয়ী খেলোয়াড়কে পুরস্কার দেওয়া হবে।

কিন্তু আহমেদ সায়েব থাকতে পারলেন না। খোঁজ নিয়েছিলেন খেলার শেষে শুধু চা আর বিস্কুটের আয়োজন হয়েছে। চাঁদার ব্যাপার, কাজেই এর বেশি কিছু করা সম্ভবও হয় নি। আহমেদ সায়েব শরীর খারাপের ছুতোয় সরে দাঁড়ালেন।

তার পরের অফিসর মিস্টার বেদান্তম। খালি পা, গলায় টাই। গোঁড়া ব্রাহ্মণ। আমি টিফিনের সময় ডিম খাচ্ছি দেখে তিন দিন

আমার সঙ্গে কথা বলেন নি। তিনিও রাজী হলেন না। বললেন, তামিলনাদ সভায় কীর্তন আছে, সেখানে যাবেন।

মুস্কিলে পড়লাম। একটা মালাও আনা হয়েছে সভাপতির জন্য। গিলমোর সাহেবের বড় চেয়ারটা লনে নামানো হয়েছে। সব ঠিক, কেবল সভাপতি নেই।

দু একজন রেগে বলল, ঠিক আছে, দরকার নেই সভাপতির। যে জিতবে টেবিল থেকে সেই প্রাইজ নেবে। এ বরং নতুন ধরনের হবে।

কিন্তু মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। এত আয়োজন সব ব্যর্থ হবে একটা সভাপতির অভাবে।

হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল। সহকর্মীদের অপেক্ষা করতে বলে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে এলাম।

মিস মে-বল চা পান শেষ করে সবে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে দেখে ভ্রুকুঞ্চিত করলেন।

বললাম, আপনাকে অনুগ্রহ করে একবার নীচে আসতে হবে। আমাদের ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে হবে।

আমাকে? কিছু হর্ষ, কিছু কৌতূহল, কিছু সন্দেহ পাঞ্চ করা বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে।

হ্যাঁ, অফিসের সবাই আপনাকে চাইছে। আপনাকে আসতেই হবে।

রিয়েলি? প্রায় ছেলেমানুষের মতন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন মিস মে-বল। বললেন, একটু দাঁড়াও, পোশাকটা বদলে আসি।

প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর দাঁড়াতে হল। মিস মে-বল সেজে-গুজে বাইরে আসতেই অবাক হলাম। সিল্কের গাউন। বেশ দামী। মাথায় ছোট টুপী। তাতে কাগজের রঙীন ফুল। দু হাতে দস্তানা। মনে হল গালেও বোধহয় রঙ ছুঁইয়েছেন।

মিস মে-বলকে নিয়ে বসালাম সভাপতির চেয়ারে। গলায় মালাও দেওয়া হল। খেলার মাঝখানে চায়ের কাপ আর বিস্কুট। তারপর খেলা শেষ হতে মেডেলের বাক্সটা তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললাম, কিছু বলুন আপনি।

চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে মিস মে-বল উঠে দাঁড়ালেন। জড়ানো কণ্ঠস্বর। একটু পরেই গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলেন। শ্রোতার সংখ্যা পরিমিত। আমরা কজন আর পথ চলতি কয়েকজন এসে জুটেছে। সবাই গোল হয়ে লনের ওপর বসেছি।

মিনিট কুড়ি বললেন সভাপতি। খেলাধূলা মানুষের জীবনে অপরিহার্য অঙ্গ। শরীর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মনও গড়ে ওঠে। মনের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধন হয়, এই সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। চমৎকার বললেন। যেমন ভাষা, তেমনই সুস্পষ্ট উচ্চারণ। অভিভূত হলাম।

সব শেষ হতে তাঁকে সঙ্গে করে সিঁড়ি অবধি পৌঁছে দিলাম। তাঁর কার্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, অদ্ভুত হয়েছে আপনার বক্তৃতা। স্পোর্টস আপনি এত ভালবাসেন তা তো জানতাম না।

সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে মিস মে-বল ঘুরে দাঁড়ালেন। রেলিংয়ে ভর দিয়ে। খুব চাপা অস্পষ্ট গলায় বললেন, ইউ সী, আলেকজাণ্ডার ওয়াজ এ স্পোর্টস্‌ম্যান।

অন্ধকার। সিঁড়িতে বাতি জ্বলে নি। তমসা ভেদ করে মিস মে-বলের আর্ত, রিক্ত কণ্ঠস্বর যেন বাতাসকে চিরে চিরে দিল। বঞ্চিতা, ভাগ্য-নিপীড়িতা করুণ হৃদয় নতুন রূপে, নতুন পরিচয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আমার সামনে।

উত্তরকালে মিস মে-বলকে নিয়ে গল্প লেখার চেষ্টা করেছি তাঁর বুভুক্ষু হৃদয়কে কেন্দ্র করে, কিন্তু পারি নি। বেদনার সে তীব্রতা

ফোটাবার শক্তি এখনও আমার কলমে আসে নি। আরও অপেক্ষা করতে হবে।

সমবয়সী সহকর্মী আমরা তিন জন। নিখিল চট্টো, পিয়ারী বন্দ্যো আর আমি। বসতামও পাশাপাশি চেয়ারে, কাজেই হৃদ্যতাটাও একটু গভীর হয়েছিল।

হৃদ্যতার আরও একটা কারণ ছিল।

অফিসের রমেশ দপ্তরীর কাজ শুধু ফাইল ঠিক করা বা স্টোর-রুম থেকে কাগজপত্র বের করে দেওয়ার মধ্যেই সীমিত ছিল না, আরও বৃহত্তর কাজের ভার ছিল তার ওপরে। আধময়লা শার্টের তিনটি পকেট বোঝাই ছিল ফটো। কুমারী মেয়েদের। আর একটা লাল লম্বা খাতাও ছিল, তাতে মেয়েদের নাম, ধাম, পিতৃপরিচয়, শিক্ষা, এমন কি রাশি, লগ্ন, বয়স সব থাকত। সারা অফিসে অবিবাহিত আমরা তিন জন, কাজেই রমেশ দপ্তরীর নজর ছিল আমাদের ওপরই বেশি।

ওই তিনজনের মধ্যে আমার চাকরি তখনও কাঁচা, কাজেই বিয়ের বাজারে আমি লোভনীয় পাত্র নই। পিয়ারীর জন্য তার দিদিমা কোথায় মেয়ে ঠিক করে রেখেছেন। সে মেয়ে গোকুলে বাড়ছে। নিখিল চট্টোর তিন পুরুষে কেউ কোথাও নেই। খিদিরপুরে এক মেসে থাকে। বিয়ে করার প্রয়োজন তারই সবচেয়ে বেশি। নিখিলেরও আপত্তি ছিল না। ভাল মেয়ে পেলে সে রাজী।

রমেশ দপ্তরীরও সেটা জানা ছিল। তাই টিফিন হলেই নিখিলের সামনে এসে দাঁড়াত।

একটা খবর ছিল।

খবর মানে নতুন কোন পাত্রীর ফটো এনেছে। সেইটাই দেখাতে চায়।

মেয়ে দেখতে কেমন ?

পকেট থেকে ফটোর স্তূপ বের করে একটা বাছতে বাছতে রমেশ বলত, অগ্নিবর্ণা। এসব রমেশের বাঁধা গৎ। ট্যারা মেয়েও তার কাছে মৃগনয়না। ব্রহ্মতালু থেকে যার চুলের বহর সাত ইঞ্চির বেশি নয়, সেও সুকেশিনী। আর গায়ের রঙ নিতান্ত আলকাতরা-সদৃশ না হলেই অগ্নিবর্ণা।

এ রকম নতুন ফটো রমেশ প্রায়ই দেখাত। মাঝে মাঝে নিখিলকে নিয়ে পাত্রী দেখতেও যেত। কোন কোন দিন পিয়ারীও সঙ্গে থাকত। আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। ওরাও কেউ বলে নি, এসব বিষয়ে আমারও উৎসাহ ছিল কম।

কিন্তু একদিন সব কিছু নতুন রূপ নিল।

সেদিন সকাল থেকেই রমেশ নিখিলের কাছে কাছে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি রমেশ, আজ কি নতুন খবর আছে নাকি ?

সলজ্জভাবে রমেশ ঘাড় কাত করল। অর্থাৎ, আছে।

মেয়ে কি রকম ? অগ্নিবর্ণা, মৃগনয়না ?

ঠাট্টাটা বোধহয় বুঝল রমেশ। চাপা গলায় বলল, আজ্ঞে, তার চেয়েও বেশি। একেবারে নিখুঁত সুন্দরী।

আমরা হেসে উঠলাম, কিন্তু টিফিনের সময় ফটো দেখে আমাদের হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী। একমাথা কোঁকড়ান চুল স্তবকে স্তবকে নেমে এসেছে সুডৌল মুখটি ঘিরে। আয়ত নয়ন, সু-ছাঁদ অধরোষ্ঠে চাপা হাসি। বাস্তবিকই এমন মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না।

রমেশ অনর্গল বলে গেল, মেয়ের মা নেই। রিটায়ার্ড বাপ সম্বল। ওই একটি মাত্র সন্তান। বাড়ি কালীঘাটের কাছে পোটোপাড়ায়।

নিখিল উদাস কণ্ঠে বললে, কি করবে তোমরা ঠিক কর।

বুঝলাম, নিখিলের মনে রূপের ছোঁয়াচ লেগেছে।

আমি বললাম, কি আর করব। মেয়েটিকে দেখে আসব একদিন। ফটো দেখে ঠিক বোঝা যায় না। এতে অনেক কারসাজি থাকে।

তাই ঠিক হল। শনিবার বাড়ি ঘুরে তিনজনে কালীঘাটে দমকলের স্টেশনের সামনে অপেক্ষা করব। রমেশ এসে আমাদের নিয়ে যাবে।

জীবনে মেয়ে দেখতে যাওয়া আমার এই প্রথম। সিল্কের মাদ্রাজী চাদর কিনেছিলাম অনেকদিন আগে। সেটা কাঁধে ফেলবার আর সুযোগ পাচ্ছিলাম না, এই অবকাশে সেটি অঙ্গে চড়ালাম। পরিপাটি করে সাজলাম। বাড়ির লোকদের পূর্ণমাত্রায় বিস্মিত করে।

কালীঘাটে পৌঁছে দেখলাম সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। নিখিল আড়চোখে বারবার আমার বেশবাসের দিকে চাইছে দেখে আমি অভয় দিলাম, মা ভৈঃ। আমি তোমার প্রতিযোগী নই। আসল রাতে তোমারই হবে চূড়ান্ত সাজ। আমরা সেদিন ইতর জন।

ঠিক গঙ্গার ধার দিয়ে রাস্তা। সংস্কারের অভাবে উপল-বিষম। সূর্যের ম্লান আলোয় অস্পষ্ট। টেপাকল ঘিরে স্ত্রী-পুরুষের ভিড়।

একটা টিনের দোচালার কাছে এসে রমেশ থামল। শীর্ণতর গলি। পাশাপাশি দুজন চলা দুস্কর।

একটু এগিয়ে রমেশ হাঁক পাড়ল, গাঙ্গুলীমশাই আছেন নাকি? গাঙ্গুলীমশাই! বার দুয়েক ডাকার পরেই দরজা খুলে গেল। একটি স্থূলকায় প্রৌঢ় আপ্যায়নের ভঙ্গীতে দুহাত বাড়িয়ে বললেন, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।

রমেশের পিছন পিছন আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

গুটি চারেক ফোল্ডিং চেয়ার। মনে হল, আজকের জন্যই যেন ভাড়া করে আনা। একটি টুল। কোণের দিকে কাঁঠাল-কাঠের নড়বড়ে তক্তপোষ।

প্রাথমিক কথাবার্তার পরে মেয়ে দেখানোর আয়োজন হল। মেয়ের মা নেই রমেশের কাছে শুনেছিলাম, কিন্তু আর কোন আত্মীয়ও নেই, তা ভাবিনি। ব্যাপার দেখে মনে হল, মেয়ে যেন নিজেই সাজগোজ করছে। বাপের কথার উত্তরে মেয়ের চাপা গলা শুনে সেই রকমই ঠেকল।

মিনিট পনেরো পরেই মেয়ে এসে দাঁড়াল। আমরা নড়ে-চড়ে বসলাম।

রমেশই বলল, আপনি ওই তক্তপোষেই বসুন। এঁরা দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করবেন।

মেয়ে বাপের কাছে বসল। পরনে ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ। চুল খোলা। অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। দু হাতে দু গাছা করে সোনার চুড়ি।

ফটোর চেয়ে মেয়ে অনেক সুন্দরী। দুধে-আলতা রঙ, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ। এ মেয়ে সত্যিই অগ্নিবর্ণা, মৃগনয়না, সুকেশিনী।

নিখিল আর আমি চুপচাপ বসে রইলাম। যা প্রশ্ন করার পিয়ারীই করল।

নাম, লেখাপড়া, সাংসারিক কাজের অভিজ্ঞতা, শেষকালে সঙ্গীত-চর্চার ফিরিস্তি। মেয়ের বাপ উঠে গিয়ে হারমোনিয়ম নিয়ে এলেন। গোটা দুয়েক শ্যামাসঙ্গীত হল। মোটামুটি মিঠে গলা।

জলযোগান্তে আমরা বিদায় নিলাম। বললাম, রমেশের মারফৎ খবর পাঠাব। নিখিলের যে খুব পছন্দ হয়েছে, সেটা তার চোখ-মুখেই প্রকট হয়ে উঠেছে। কোন দিক দিয়েই অপছন্দ হবার মেয়ে নয়। নিখিল ভাগ্যবান।

রাস্তায় নেমে রমেশ বিদায় নিল। সে যাবে ভবানীপুরের দিকে। আমরা তিনজন একটু এদিক-ওদিক বেড়িয়ে বাড়ি ফিরব।

পুরো দশ গজও যাই নি, হঠাৎ বামাকণ্ঠ—শুনুন!

পিছন ফিরেই অবাক হলাম। এইমাত্র দেখে-আসা মেয়েটি। এখনও পোশাক পর্যন্ত বদলায় নি।

তিনজনেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আমি ভাবলাম, আমাদের মধ্যে কেউ হয়ত রুমাল ফেলে এসেছি, তাই দিতে এসেছে মেয়েটি। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম আমার রুমাল ঠিকই আছে।

মেয়েটি আরো এগিয়ে এল। চাঁদিনী রাত নয়। আকাশেও একটি তারাও নেই। গ্যাসের অ্যানিমিক দীপ্তি আলোর চেয়ে অন্ধকারকেই যেন নিবিড় করে তুলছে। সামনের শুরকির কলের চিমনি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। আঘাটায় বাঁধা নৌকা থেকে মাঝিদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

সব ছাপিয়ে মেয়েটির কণ্ঠ শোনা গেল, আপনাদের মধ্যে পাত্র কে জানি না। যেই হোন, একটা কথা তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।

এবারেও পিয়ারী বলল, বলুন কি আপনার কথা?

আমাকে কি আপনার পছন্দ হয়েছে?

মেয়েটির নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হলাম। কিছুক্ষণ আগে দেখা শান্ত শিষ্ট মেয়েটি এভাবে প্রগল্‌ভা হয়ে উঠল কি কারণে!

একটু ইতস্তত করে বললাম, যদি বলি পছন্দ হয়েছে—

যদি শোনেন মেয়েটির জন্মের দোষ আছে, তাহলেও আপনাদের এ পছন্দ টিঁকে থাকবে তো?

আচমকা এলোমেলো হাওয়া। শুরকির কলের কুণ্ডলাকৃতি কালো ধোঁয়াটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। নাম-না-জানা গাছের পাতায় শিরশিরানি। মেয়েটির ময়ূরকণ্ঠি শাড়ির আঁচল বাতাসে দুলছে।

এতক্ষণ পরে, এই প্রথম নিখিল কথা বলল, তার মানে?

তার মানে, আমার মা আমার বাবার বিয়ে-করা স্ত্রী ছিল না। আমরা তিন পুরুষে পোটোপাড়ার বাসিন্দা। বাবা আসতেন মাঝে মাঝে, তারপর সব ভাসিয়ে দিয়ে রয়েই গেলেন এখানে। আপনারা ছেলেমানুষ। এসব ব্যাপারে অনেক খোঁজখবর করতে হয়, অভিভাবক সঙ্গে আনতে হয়। এ ছুনিয়ার আপনারা কতটুকু জানেন।

কথাটি শেষ করে মেয়েটি আর দাঁড়াল না। মনে হল যেন অন্ধকারেই মিশে গেল। মেয়েটি যে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার চিহ্নও কোথাও নেই।

অনেকক্ষণ আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে রইলাম। চুপচাপ। যখন খেয়াল হল, তখন রাত হয়েছে। আকাশে ময়ূরকণ্ঠি রং। তারার চুমকি বসানো এখানে-ওখানে। এপাশে-ওপাশে আলো জ্বলে উঠেছে। ছু-একটা বাড়ি থেকে গানের শব্দ আসছে, ঘুঙুরের আওয়াজ।

কে জানে, একটু আগে নিজের পরিচয় বহন করে যে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে এ গলিরই নিষ্পেষিত আত্মা কিনা।

বিধি বাদী। খোদ ভারত সরকারের চাকরি করা বরাতে সইল না।

ছুর্দম সিঙ্গাপুর। সিন্ধুশকুনের মত ডানা প্রসারিত করে সমস্ত প্রাচ্য ভূখণ্ড রক্ষা করছে। তীক্ষ্ণ নখরে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবে শত্রুর স্পর্ধা, ইস্পাত-কঠিন চঞ্চুতে বিদীর্ণ করবে অরাতির হৃদপিণ্ড।

সেই সিঙ্গাপুর দখল করল পীতজাতি। ইংরাজের আভিজাত্য, তার দম্ভ, তার শক্তি। মুহূর্তে 'মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে হল তার সীমা'। ইংরাজ পশ্চাদপসরণ শুরু করল। 'পোড়া-মাটি' নীতির পথ ধরে।

ঠিক হল, আমাদের অফিসও সরে যাবে সিমলা শৈল-শিখরে।

কলকাতা আর বুঝি নিরাপদ নয়। যে কোন লগ্নে পীত খর্বকায় দস্যু নেমে আসতে পারে কলকাতার বুকে। নেমে আসার আগে বিমান-ভৃঙ্গারে হলাহল ছিটিয়ে দেবে সারা শহরের ওপর।

যে লগ্নেই আসুক, সে লগ্ন যে শুভ গোধূলি লগ্ন হবে না ইংরাজের পক্ষে, সেটুকু বুঝতে তাদের অসুবিধা হয় নি।

ফাইলের স্তূপ বাক্সজাত হল। সারা অফিসে সাজ সাজ রব।

আমি পড়লাম মুশকিলে। কয়েকমাস আগে পিতৃবিয়োগ হয়েছে। বাড়িতে শোকাচ্ছন্ন মা আর ছোট ভাই। এ সময়ে বাইরে যাওয়া আমার পক্ষে সমীচীন নয়।

মা-ও বেঁকে দাঁড়ালেন। আমার বাইরে কোথাও যাওয়া চলবে না। বিশেষ করে এই অনিশ্চিত সঙ্কটময় মুহূর্তে।

সহকর্মীদের কথাটা বলতে তারা ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের নাগপাশের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এখন কারো পক্ষেই চাকরি ছাড়া মানে ভারত সরকারকে বিব্রত করা, আর সে কাজ শত্রুতা-সাধনেরই নামান্তর।

হাতে সময়ও বেশি নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে একদিন গিলমোর সাহেবের কামরায় গিয়ে ঢুকলাম।

কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তুললেন।

কি? কি চাই?

কি চাই বললাম। মা আর ভাইয়ের অসহায়তার কথা উল্লেখ করে, এমনি সময়ে তাদের ছেড়ে যাওয়া যে কত নীচ স্বার্থপরতার কাজ হবে তাও বললাম ভারী গলায়।

গিলমোর সাহেব কিছুক্ষণ হাতের কলম দাঁতে চেপে কি ভাবলেন, তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, কিন্তু সরকারী চাকরি তুমি ছেড়ে দেবে? এ চাকরি কেউ ছাড়ে না। একবার ছাড়লে সরকারের অন্য অফিসে চাকরি পাওয়াও দুষ্কর হয়। চাকরির রেকর্ডই খারাপ হয়ে থাকে।

হঠাৎই মুখ থেকে বের হয়ে গেল, কিন্তু মায়ের আদেশেরক কাছে আর কোন সমস্যার কথাই আমি ভাবতে পারছি না। মা বলেছেন, এখন আমার কলকাতা ছেড়ে যাওয়া চলবে না।

ঠিক এই ধরনের কথা বোধহয় সেকেন্দার শাহ একবার বলেছিলেন। মায়ের এক বিন্দু অশ্রু সহস্রযোজন সাম্রাজ্য-বিস্তারের চেয়েও গুরুত্ব-পূর্ণ। তার বহু পরে প্রায় একই ধরনের কথা বললাম আমি।

ঈশ্বর জানেন, সেকেন্দার শাহর গল্পটা গিলমোর সাহেবের পড়া ছিল কিনা, কিন্তু ঠোঁটের কোণে বোধহয় একটু হাসির আভাস দেখেছিলাম।

হাতের কাজে মন দিয়ে আস্তে বললেন, কাল সকালে দেখা কর। এ বিষয়ে সঠিক জানাব।

পরের দিন গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, তুমি একটা দরখাস্ত কর। তোমার পদত্যাগপত্র যাতে গ্রহণ করা হয়, সে চেষ্টা আমি করব। কোন কারণ দেখাবার প্রয়োজন নেই, শুধু লিখো ব্যক্তিগত কারণে কলকাতা ছাড়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বন্ধন মুক্তি। প্রায় 'লিখে দিল বিশ্ব-নিখিল দু লাইনের পরিবর্তে'। আবার শিক্ষিত বেকার। দশটা-পাঁচটার বাঁধন নেই। বসে বসে কেবল খবরের কাগজ পড়ি। মনে মনে হিসাব করি, কত দ্রুত-গতিতে এগিয়ে আসছে জাপ সৈন্য।

বোধ হয় দিন কুড়ি পরের ব্যাপার।

দেশপ্রিয়-পার্ক থেকে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন নাম ধরে ডাকল।

ফিরে দেখলাম খদ্দর-পরিহিত একটি ভদ্রলোক মোটরের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছেন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। গিয়েই চিনতে পারলাম।

রেঙ্গুনের বেঙ্গল একাডেমির ভূতপূর্ব ইতিহাসের শিক্ষক, আর আমাকে বাংলা পড়াতেন বাড়িতে।

কি করছ আজকাল?

কিছুই যে করি না, এমন একটা কথা একদা-শিক্ষকের সামনে বলতে লজ্জা বোধ করলাম। সত্যগোপন করে বললাম, চাকরি করি ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অফিসে।

কি কাজ?

কেরানীর।

ভদ্রলোক নাসিকা কুঞ্চিত করলেন, ছি, ছি, এখনও বিদেশী সরকারের তাঁবে চাকরি! ছেড়ে দাও।

বললাম, তারপর?

ভদ্রলোক পকেট থেকে আইভরি-ঝকঝকে একটা কার্ড বের করে আমার হাতে দিলেন, সম্ভব হলে কাল আমার সঙ্গে দেখা করো।

মোটরটা অদৃশ্য হতে কার্ডটার দিকে চোখ ফেরালাম।

একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, এ ছাড়া, এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি, কেমিক্যাল কোম্পানি, কাপড়ের মিলের চেয়ারম্যান।

আশ্চর্য লাগল। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধান। একশো কুড়ি টাকা মাইনের সাধারণ এক শিক্ষক, এদেশে যাঁরা অলিতে-গলিতে হাজারে হাজারে ঘুরে বেড়ান বাড়তি টিউশনের আশায়। শিক্ষার আসন থেকে দীক্ষার সিংহাসনে, কোন মায়াদণ্ডের স্পর্শে সম্ভব হল—সে কথাই ভাবতে লাগলাম।

বেশবাসে কোন রূপান্তর ঘটে নি, দেহের কাঠামোর কোন পরিবর্তন নয়, কিন্তু লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়েছেন। কুবেরের প্রিয়ভাজন।

পরের দিন দেখা করলাম। মনে হল, নিয়োগপত্র বোধহয় টাইপ করাই ছিল। যেতেই হাতে দিলেন। সতীর্থ দু-একজন ডিরেক্টরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, আমার প্রিয়

ছাত্র। আরো দু-একটা সদ্‌গুণেরও উল্লেখ করেছিলেন, বোধহয় ব্যাঙ্কে চাকরি করতে হলে সে রকম দু-একটা সদ্‌গুণ থাকা প্রয়োজন।

নতুন চাকরি-জীবন শুরু হল ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে।

খুব উঁচু একটা চেয়ার, আমার সিংহাসন। সামনে তিন নম্বর লেজার—আমার সাম্রাজ্য। চারদিকে বিচিত্র মানুষের সমাবেশ, বিচিত্র চরিত্র, বিচিত্র আচরণ।

পরের হিসাব রাখতে রাখতে মাঝে মাঝে মাঝে নিজের হিসাবের খতিয়ান করি। বসে বসে ভাবি, জীবনে স্বপ্ন ছিল উকিল হবার, বিখ্যাত ব্যবহারজীবি, কিন্তু হাবুডুবু খেতে খেতে লেজার-কীপারের ঘাটে এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে আবার কোন আবর্তে তলিয়ে যাব, কে জানে!

দিন পনেরোর মধ্যে ডাক এল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছ থেকে। গিয়ে দাঁড়াতে জিজ্ঞাসা করলেন, কাজকর্ম কেমন লাগছে?

বললাম, ভাল।

সেভিংস-লেজার থেকে তোমায় কারেন্ট-লেজারে বসাব আজ থেকে। তারপর, ক্লিয়ারিং বিল, অ্যাকাউন্টস্ সব ডিপার্টমেন্টে ঘোরাব। মন দিয়ে সব শিখে নাও।

তথাস্তু।

তাই হল। মাসখানেকের মধ্যে সব ডিপার্টমেন্ট ঘোরা হল। প্রায় বুড়ি-ছোঁয়া গোছের।

আবার গিয়ে দাঁড়ালাম ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মুখোমুখি।

তোমাকে অ্যাকাউন্টেন্ট করে পাঠাচ্ছি বেনারস ব্রাঞ্চে। সাত-দিনের মধ্যে রওনা হতে হবে। তৈরি হয়ে নাও।

সর্বনাশ। আবার কলকাতা ছাড়ার প্রস্তাব। সেকেন্দার শাহর কায়দায় ইংরাজকে দ্রব করা গিয়েছিল, কিন্তু এখানে সে মতলব খাটল না।

কিন্তু—

কোন কিন্তু নয়। বাঙালীর ছেলেকে সব জায়গায় যেতে হবে, নইলে এ জাতের অর্থনৈতিক মৃত্যু অবধারিত। দেখছ না, সমস্ত জাত এসে জুড়ে বসেছে বাংলা দেশে। ব্যবসার প্রসারের জন্য আমাদেরও সব শহরে ঘাঁটি করতে হবে। কোন অসুবিধা হবে না। যাও।

এটুকু বুঝলাম, আমি কলকাতায় থাকি, সর্বনিয়ন্তার এ ইচ্ছা নয়। সুতরাং বাক্স-বিছানা বাঁধতেই হল। সেই সঙ্গে মনও।

ব্যাঙ্ক গোধূলিয়ার মোড়ে। লাল দুতলা মনোরম বাড়ি। নীচের তলায় ব্যাঙ্ক। ওপরের তলায় থাকেন ম্যানেজার আর সাব-অ্যাকাউণ্টেণ্ট।

ম্যানেজার অসুস্থ ছিলেন, আমাকে স্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিলেন গোপীবল্লভ গোস্বামী, সাব-অ্যাকাউণ্টেণ্ট।

গৌরবর্ণ বাবাজী-সুলভ চেহারা। গলায় কণ্ঠি, নাকে রসকলি, মুখে, গৌর পার করো হে।

আমি কামরা থেকে নামতে বিস্ময়-আবিষ্ট কণ্ঠে বললেন, আরে, এ যে একেবারে পোলাপান!

কথাগুলো বললেন বিশুদ্ধ পদ্মাপারের ভাষায়।

তারপর টাঙ্গায় আসতে আসতে অ্যাকাউণ্টেণ্টের গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে আমাকে রীতিমত ভয়গ্রস্ত করে তুললেন।

তিন জনের সংসার।

ব্যাঙ্কেরই একটি ছোকরা পিয়ন দুবেলা রান্নাবান্না করে দেয়। জিনিসপত্র সস্তা। দুধটিও নির্জলা। স্বাস্থ্যেরও কিছু উন্নতি দেখা গেল।

ডান দিকের কামরায় ম্যানেজারবাবু বসেন, মাঝখানে গোপী-বাবুকে ঘিরে কেরানীকুল, একেবারে বাঁ দিকে ছোট একটা ঘরে বিরাট ক্যাশবই আর জেনারেল লেজার সমেত আমি।

মক্কেলদের মধ্যে বিধবার সংখ্যাই বেশি। গঙ্গাস্নানে যাবার সময় আমার ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর দুটো টাকা রেখে কেউ কেউ বলেন, টাকা দুটো জমা করে নিও বাবা। চান সেরে ফেরবার মুখে রসিদটা নিয়ে যাব।

কি নামে জমা দেব।

জগত্তারিণী দেবী। আমায় সবাই কালীজগা বলেই ডাকে। গায়ের রংটা দেখেছ তো!

মহিলা হাতটা আমার সামনে প্রসারিত করে দেন। মসীকৃষ্ণ বর্ণ। শক্ত, সমর্থ চেহারা।

মহিলা চলে যেতে গোপীবাবুকে ডেকে বলি, টাকা দুটো জগত্তারিণী দেবীর নামে জমা করে রসিদটা আমায় দেবেন তো!

জগত্তারিণী না জগৎপালিনী?

মন নিঃসংশয় ছিল, গোপীবাবুর সন্দেহের খোঁচায় চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমতা আমতা করে বললাম, জগত্তারিণীই তো বললেন। খুব কালো রং।

গোপীবাবু হাসলেন, দেখতে হবে না, তাহলে জগৎপালিনী। একেবারে পাকা রং। গঙ্গায় নামলে ঘোলা জল কালো হয়ে যায়। কিনলেন গোলাপজাম, বাড়ি গিয়ে দেখলেন হাতের ছোঁয়ায় সব কালোজাম হয়ে গেছে।

এহেন অকাট্য যুক্তির পরে তর্ক করতে আর আমার আগ্রহ হল না। সম্ভবত আমি ভুল শুনে থাকব। টাকা দুটো জগৎপালিনী দেবীর হিসাবেই জমা হয়ে গেল।

এক-আধবার নয়, প্রায়ই এ রকম হ'ত। দুজনকেই দেখেছি। চেহারায় অদ্ভুত সাদৃশ্য। রঙে তো বটেই।

এরপর থেকে নাম বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাগজে লিখে নিতাম, যাতে গোলমাল না হয়।

গোপীবাবু প্রায়ই আক্ষেপ করতেন, আরে মশাই, হেড অফিস কেবল বলে কাজ বাড়াও। কাজ বাড়াব, না, তারিণী-পালিনীর গোলমাল মেটাব, বলুন ?

এ তো এমন কিছু গোলমাল নয়, গোপীবাবুকে এর চেয়েও মারাত্মক এক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

প্রতি শনিবার ম্যানেজার এলাহাবাদ যেতেন। তীর্থে নয়, শ্বশুরবাড়ি। শনিবার সকালে যেতেন, ফিরতেন সোমবার প্রত্যুষে। কাজেই শনি আর রবি এই দু রাত শুধু গোপীবল্লভবাবু আর আমি।

এক শনিবার মাঝরাতে আচমকা দরজায় ধাক্কা। সঙ্গে সঙ্গে গোপীবল্লভ গোস্বামীর চিৎকার।

আরে মশাই, উঠুন, শিগগীর উঠুন, সর্বনাশ হয়েছে।

ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। ভাবলাম আগুন, তারপর মনে হল ডাকাতি। কিন্তু ডাকাতির আশঙ্কা কম। বেশির ভাগ টাকাই শনিবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেফে যা পড়ে থাকে তা এত সামান্য যে ডাকাতদের মজুরী পোষাবে না।

দরজা খুলতেই গোপীবল্লভবাবু ছিটকে ঘরের মধ্যে এসে পড়লেন, সর্বনাশ হয়েছে মশাই। ব্যাঙ্কের গুদাম ঘরে মহম্মদ।

চমকিত হলাম। তার মানে। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার ব্যাপার নাকি ? কই, কোথাও তো কোন গোলমাল নেই। একমাত্র গোপীবল্লভবাবুর চিৎকার ছাড়া কোথাও কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

আরে, দাঁড়িয়ে আছেন কি ? নীচে আসুন। ম্যানেজার নেই, সব দায়িত্ব তো এখন আপনার।

আমাকে আর যেতে হল না, গোপীবল্লভবাবুই টেনে আমাকে নিয়ে চললেন।

একতলায় গুদামঘর। তার পাশেই ছোট একটা কামরা। রাজ্যের অব্যবহৃত জিনিসে ঠাস বোঝাই। ভাঙা চেয়ার, টেবিল, পুরনো লেজার, খসখসের পর্দা। ঘরটি তালা দেওয়া থাকে। চাবি দরওয়ানের কাছে।

দরজার কাছেই একটি অবগুণ্ঠনবতী। তার পাশে একটি জোয়ান হিন্দুস্থানী। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্কের প্রৌঢ় দরোয়ান।

কি ব্যাপার?

অবগুণ্ঠনবতী ঘোমটাটা আবক্ষ টানল। জোয়ান ছোকরা মুখ ঢাকল তুটি হাতে।

আর কি ব্যাপার, গোপীবল্লভবাবু শুরু করলেন, রাত্রে আমি বার তুই তিন উঠে গুদামঘর দেখি তা তো জানেন? তালা টেনে দেখি, কোথাও কোন জানলা খোলা আছে কিনা সেদিকে নজর দিই। অনেক টাকার মাল রয়েছে তো। সাবধানের মার নেই। একটু আগে উঠে গুদাম ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কানে খুট-খাট আওয়াজ গেল। প্রথমে ভাবলাম ইঁতুর, তারপর ফিসফাস কথার শব্দও শুনতে পেলাম। চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কান পেতে। গুদাম ঘরে নয়, আওয়াজ আসছে পাশের কামরা থেকে। দরজায় বার কয়েক ধাক্কা দিতেই এই তুই মূর্তি বেরিয়ে এল। আমাদের দরোয়ানের ছেলে আর ঝাড়ুওয়ালী। প্রথমে তো কথাই বলে না, তারপর ধমক দিতে বলে কি না, মহম্মদ। এত জায়গা থাকতে ব্যাঙ্কের ঘরে মহম্মদ।

ব্যাপারটা কিছুটা বুঝলাম। এই তুই প্রণয়ী নির্জন প্রকোষ্ঠে প্রেমগুঞ্জনে মত্ত ছিল, গোপীবল্লভবাবুর চিৎকারে তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। তার ধমকে দরোয়ানের ছেলেটি স্বীকার করেছে মেয়েটির সঙ্গে মহব্বতের কথা। গোপীবল্লভবাবুর ভাষাজ্ঞানের কল্যাণে মহব্বত মহম্মদে পরিণত হয়েছে।

ম্যানেজার আসা পর্যন্ত ব্যাপারটা মুলতুবী রাখা হল।

গোপীবল্লভবাবুকে ঠিক উচ্চারণটা বলতে যেতেই তিনি ক্ষেপে গেলেন।

রাখুন মশাই, ওরা করবে অন্যায় কাজ, আর আমাদের ভাষা ঠিক রাখতে হবে!

বিকেলে সময় কাটাবার আস্তানা ছিল দুটি। একটি মোহন অ্যাণ্ড কোম্পানির কাপড়ের দোকান আর একটি দশাশ্বমেধ ঘাট রোডে ডাক্তার চৌধুরীর ডিসপেনসারী। দ্বিতীয়টিতেই আড্ডা জমত বেশি। দু একদিন উকীলরা আসতেন। আইনজীবি নয়, বিখ্যাত শিল্পী উকীলেরা। সেদিন চিত্রকলা নিয়ে তুমুল আলোচনা চলত। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, সারদা উকীল, যামিনী রায়, বিদেশের র‍্যাফায়েল, মাইকেলেঞ্জেলো, ভিঞ্চি। পিকাসো আর ভ্যান গগকে নিয়ে আলোচনার রেওয়াজ তখনও চল হয়নি।

প্রকৃত আড্ডায় যেমন হয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, স্বাস্থ্য-নীতি, সাহিত্য, চুটকি কিছু বাদ যেত না। আমি একপাশে বসে চুপচাপ শুনে যেতাম। প্রথম কারণ জ্ঞান পরিমিত, দ্বিতীয় কারণ বয়সেও বোধ হয় সকলের ছোট ছিলাম। নিজের মতামত দিতে সাহস হত না।

একদিন কিন্তু দিতে হল।

ডাক্তার চৌধুরীই কথাটা পাড়লেন।

বললেন, কাল ভারি মজা হয়েছে। ডিসপেনসারি থেকে বাড়ি গিয়ে দেখি আমার স্ত্রীর এক মামাতো ভাই এসে হাজির। বড় চাকরি করে ছোকরা। বেরিলিতে থাকে। বহুদিন আগে বিয়ের সময় যখন দেখেছিলাম, একেবারে বাচ্চা। অফিসের কি একটা কাজে এখানে এসেছে। রাত্রে এক ঘরেই দুজনে শুয়েছিলাম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল ঘরের মধ্যে কে যেন ঘুরে

বেড়াচ্ছে। আমি আবার অন্ধকারে ঘুমোতে পারি না। ঘরে একটি কম-জোর নীল বাতি জ্বলছিল। সেই আলোতেই দেখলাম, আমার শ্যালকটি কোণের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু দাঁড়িয়ে নেই, টেবিল থেকে পেপার ওয়েট, আমার পাইপ, ছোট অ্যাস-ট্রে তুলে নিয়ে নিজের জামার পকেটে রাখছে। তারপর আবার সরে এল এদিকে। আলমারির ওপরে ছোট ছোট ওষুধের শিশি ছিল, তারই কয়েকটা নিয়ে পকেটে রাখল।

আমি মশারির মধ্যে বসে বসে ঘামছি। এ আবার কি ব্যাপার। যে জিনিস কটা শ্যালক পকেটজাত করেছে, সেগুলোর দাম কানা কড়িও নয়, অন্তত ওর কাছে। কিন্তু মাঝরাতে এই বিসদৃশ আচরণের কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না।

উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে। শ্যালককে একেবারে হাতে-নাতে ধরলাম।

ভদ্রলোক আরক্ত হয়ে উঠল। মহামূল্য জিনিস অপহরণ করলে চোরের যে অবস্থা হয়, অবিকল সেই রকম। কোন রকমে পকেটের জিনিসগুলো টেবিলের ওপর উজাড় করে দিয়েই ছুটে নিজের বিছানার মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

আমার কিন্তু আর ঘুম এল না। পরের দিন স্ত্রীর কাছে শুনলাম শ্যালকটির নাকি এই রোগ আছে। কোথাও গেলে তাকে সামলে সামলে রাখতে হয়। এমন কি পথে বেড়াতে গেলেও ফেরার সময় পকেট ভর্তি গাছের পাতা, নুড়ি, ইঁটের টুকরো এসব পাওয়া যায়। এ কি রোগ বলুন তো?

কোণের চেয়ারে একটি ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, এরকম রোগের কথা মনস্তত্ত্বের বইতে আছে। একে বলে, চৌর্যোন্মাদ। ক্লেপ্টোম্যানিয়া।

ক্লেপ্টোম্যানিয়া? ডাক্তার চৌধুরী ভ্রু কোঁচকালেন, কি বানান?

ভদ্রলোক বানান করে বললেন, Cleptomania.

আমি আর থাকতে পারলাম না। বিষয়টা আমারও জানা ছিল। আমিও মনোবিদ্যার ছাত্র ছিলাম। অ্যাবনর্মাল সাইকোলজিতে ক্লেপ্টোম্যানিয়ার কথা পড়েছি, দেশী বিদেশী নানা উদাহরণ সমেত।

বললাম, না, ও বানান নয়। বানান হচ্ছে, Kleptomania.

ভদ্রলোক আমার প্রগলভতায় ক্ষেপে উঠলেন, কখনও না। আমি যে বানান বলেছি সেটাই ঠিক।

উঁহু, আমি ঘাড় নাড়লাম।

ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, হতেই পারে না। আসুন, কত টাকা বাজী?

আপনিই বলুন। আমিও নাছোড়বান্দা।

শেষে ঠিক হল পাঁচ টাকা। এ টাকা কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। সবাইকে জিলাপী খাওয়াতে হবে।

ডাক্তার চৌধুরীর বাড়ি থেকে অভিধান এল। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন এসে পৌঁচেছেন।

অভিধান খুলে দেখা গেল আমার কথাই ঠিক। বানানটার শুরু 'কে' দিয়ে, 'সি' দিয়ে নয়।

ম্যানেজার সানন্দে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। সকলে সাধুবাদ করলেন। জিলাপী এল। সবাই খেলাম আনন্দ করে, কেবল সেই ভদ্রলোক ছাড়া। তিনি টাকা ফেলে দিয়েই পেট খারাপের অজুহাতে বেরিয়ে গেলেন।

এর বহু বছর পরের কথা। হাতে কোন কাজ ছিল না, বসে বসে চলন্তিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল 'চৌর্যোন্মাদ' কথাটি। পাশে ইংরাজী পরিভাষা লেখা। Cleptomania.

উঠে হাতের কাছে যে দুটি ইংরাজী অভিধান ছিল, তাতে বানানটা দেখে নিলাম। লেখা আছে Kleptomania.

এক চিন্তায় পড়লাম। এবার আর কাশীর ডাক্তার চৌধুরীর

দোকানের অচেনা সেই ভদ্রলোক নন, এবারে কিছু লিখতে হবে রাজশেখর বসুকে।

দিন দুয়েক অস্বস্তিতে কাটল। তারপর ভাবলাম ভুল যখন দেখেছি, তখন আমার উচিত গ্রন্থকারের সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। নয়ত এ ভুল অভিধানে থেকেই যাবে।

সাহস করে একটা পোস্টকার্ড লিখলাম। খুব বিনীতভাবে। ছাপার ভুলের জন্যই সম্ভবতঃ এমন একটা প্রমাদ থেকে গিয়েছে। এটার সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

দিন দুয়েক পরেই চিঠির উত্তর এল। পোস্টকার্ডে। অনিন্দ্য-সুন্দর হস্তলিপিতে।

৭২ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫

১৯।১।৫৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ১৭ জানুয়ারির চিঠির উত্তরে জানাচ্ছি—Clepto-mania, Klepto—দুই বানানই শুদ্ধ। কোনও অভিধানে Clepto—কোনওটিতে Klepto—কোনওটিতে Clepto, Klepto—আছে।

চলন্তিকার শুদ্ধি রক্ষায় আপনার আগ্রহ আছে সে জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ভবদীয়

রাজশেখর বসু

প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। মনে হল বহু বছর আগে যে পাঁচ টাকা বাজী জিতেছিলাম, তাতে আমার কোন অধিকার ছিল না। সে ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা জানা থাকলে পাঁচটা টাকা না হয় মনি অর্ডার করেই ফেরৎ পাঠাতাম। যদিও পাঁচ টাকার জিলাপী আমি একলা খাইনি।

পরের দিনই রাজশেখর বসুকে ধন্যবাদ জানালাম। টেলিফোনে।

তিনি আমন্ত্রণ জানালেন। বললেন, আসুন একদিন। ওই বানানটাও দেখে যাবেন। আমার কাছে বৃহৎ অভিধান তু একটা আছে। তাতে derivationটাও পাবেন।

এবার সমস্যা ঘোরতর হল। যাওয়াটা কঠিন কিছু নয়। চারু অ্যাভিনু্য থেকে বকুলবাগান দশ-পনেরো মিনিটের পথ। কিন্তু জ্ঞান-তপস্বীর সামনে কি সম্বল নিয়ে যাব। তীর্থে অন্য কিছু সম্বল না থাকলেও, যাত্রাপথের কষ্টটুকু নিয়ে যাওয়া যায়।

তারপর আলোচনা শুধু ক্লেপ্টোম্যানিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না। আরও অনেক বিদেশী দুরূহ শব্দ ও শব্দতত্ত্বের অবতারণা হবে। ফিলোলজির বিভিন্ন সূত্র।

যতই চিন্তা করতে লাগলাম, ততই যেন আর সাহস পেলাম না। আমার এই নিঃস্বতা সম্বল করে ঋষির পাদমূলে গিয়ে বসার চেষ্টা অর্থহীন।

ভাবলাম, চুপচাপ থাকাই শ্রেয়। রাজশেখর বাবু আমাকে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেটা নিছক সৌজন্য প্রসূত, কাজেই সে আমন্ত্রণ না রাখলেও খুব ক্ষতি নেই। উনি নিশ্চয় ইতিমধ্যেই আমার কথা ভুলে গেছেন।

মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি। অমন একটা লোককে কাছাকাছি পাওয়া, তাঁর মুখ থেকে জ্ঞানের কথা শোনা, কম ভাগ্যের কথা নয়। এটুকু জানতাম গড্ডলিকা-কজ্জলী-হনুমানের স্বপ্ন-র পরশুরামের সাক্ষাৎ পাব না। পার্শীবাগানের আড্ডার রাজশেখর বসুর দর্শনলাভও আমার মতন বয়সের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্যের সান্নিধ্যলাভ, সেটুকুও কম লোভনীয় নয়।

কিন্তু তবু মনে জোর পেলাম না। বন্ধু-বান্ধবদের মারফৎ যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করেছি, তাতেও খুব ভরসা পাইনি। রসকাহিনীর রচয়িতা হলে হবে কি, ভদ্রলোক নাকি অত্যন্ত গম্ভীর, রাসভারি মানুষ। সামান্য কথা বলেন, সেটুকুও জ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে।

একদিন চাক্ষুষ দেখার সুযোগ জুটে গেল। মাননীয় মন্ত্রী বিমল সিংহের লোয়ার সারকুলার রোডের বাড়িতে সংবর্ধনা জানানো হবে রাজশেখর বসু আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পুরস্কার প্রাপ্তির উপলক্ষে। বোধহয় আয়োজন করেছিলেন 'তরুণের স্বপ্ন'র পরিচালকরা। নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। ঠেলে-ঠুলে একেবারে সামনের পংক্তিতে গিয়ে বসেছিলাম। বন্ধু-বান্ধবদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে।

রাজশেখরবাবু এলেন। শান্ত, সৌম্যমূর্তি। শরীর জীর্ণ। একজনের সাহায্যে চেয়ারে উপবেশন করলেন।

আমি পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। পরশুরামকে খুঁজে পেলাম না। মানুষটাকে ঘিরে জ্ঞানের বলয়, বিচ্ছুরিত প্রজ্ঞার জ্যোতি। এমন একটা লোকের সামনে যে গিয়ে হাজির হইনি, সেজন্য মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিলাম।

সভার কাজ আরম্ভ হল। বিভিন্ন সুরে প্রশস্তি বাচন। সে সবের উত্তরে রাজশেখর বসু গুটি কয় কথা বললেন।

আপনারা কে কি বললেন, সেগুলো আমার কানে আসেনি। সংবর্ধনার ব্যাপার, কাজেই আশা করছি, হয়তো প্রশংসাই করলেন, ভাল ভাল কথাই বললেন। কিন্তু ঈশ্বরের অসীম কৃপায় আমি কানে একটু কম শুনি, আপনাদের অনেক কথাই আমার কানে প্রবেশ করেনি। আমি কিছু কিছু লিখেছি, সে লেখা আপনাদের আনন্দ দিয়ে থাকবে, নইলে খরচ করে এ সংবর্ধনার আয়োজন আপনারা করবেন কেন? কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না। লেখা যদি ভাল লেগেই থাকে তো লেখককে দেখবার এ আগ্রহ কেন? লেখার সঙ্গে লেখকের মিল কতটুকু।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিলাম। সব সময় সব লেখকের সঙ্গে হয়তো তাঁর লেখার মিল থাকে না, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে যে থাকে তার কিছু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। গভীর পরিমিতিবোধ, প্রগাঢ় রসজ্ঞান পরশুরামের রচনাতেও, তাঁর বক্তৃতাতেও। শান্ত সমাহিত

গিরিকন্দরের অন্তরালে উচ্ছলা তটিনীর মতন, রসস্রোত আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না, কিন্তু মানুষটার কাছে এলে সে স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি কর্ণগোচর হয়।

চোখে দেখার ব্যাপারে চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত। ওই সভাতেই।

তিনি বলেছিলেন। তাঁর ভাষাতেই বলি।

আমার এক দাদামশাই তামাক খেতেন। খুব ভোর থেকে সেবন শুরু হত। প্রদীপ জ্বালিয়ে। আপত্তি জানিয়েছিলেন দিদিমা। তামাক খাওয়ার জন্য নয়, ভোর থাকতে বাতি জ্বালানোর জন্য।

তামাক খাবে খাও। সাত সকালে বাতি জ্বালানোর কি দরকার? অন্ধকারে খাওয়া যায় না? দাদামশাই অমায়িক হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, কি যে বল? যাকে খেয়ে এত সুখ, তাকে চোখে দেখব না?

সভা শেষ হবার একটু আগেই রাজশেখরবাবু চলে গেলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য।

আমার মনে কিন্তু সাহস এল। ভাবলাম এমন একটা লোকের কাছে নির্ভয়ে যাওয়া যায়। মিতভাষী ধীর স্বভাব। পাণ্ডিত্য প্রকাশের কোন প্রয়াস নয়, কেবল নিজের প্রশ্নের সমাধান মিলবে।

কিছুদিন পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পকেটে সেই পোস্টকার্ড। ওইটুকুই আমার সম্বল। পরিচয়পত্রের সগোত্র।

বকুলবাগান রোড ধরে মাঝামাঝি গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঝুলবারান্দার ওপরে শুভ্রকেশের আভাস। এটুকু শোনা ছিল, বিকালের দিকে রাজশেখর বসু বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার পেতে বসে থাকেন।

আর সাহস হল না। সেদিন সভায় প্রচুর ভীড় ছিল, তাই

মুখোমুখি বসার সাহস হয়েছিল, আজ নির্জনে নিভৃতে ওই প্রতিভার সামনাসামনি গিয়ে বসার মত মনের জোর পেলাম না।

দ্রুতপায়ে চলতে শুরু করলাম। একেবারে বিপরীত মুখে।

একবার নয়, বার বার তিনবার। শেষবারে প্রায় ফটক অবধি গিয়ে পৌঁচেছিলাম, কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারিনি। একবার বারান্দার দিকে নজর দিয়েই ত্বরিত পায়ে ফিরে এসেছি।

আশ্চর্য, মনে মনে ভেবেছি, এমন হয় না, আমি গিয়েছি, অথচ বারান্দা ফাঁকা। রাজশেখর বসু নেই। আমি কারো হাতে আমার আগমন বার্তাটুকু জানিয়ে আসতে পারি। আমার প্রতিশ্রুতি-পালন।

কিন্তু বারান্দা ফাঁকা দেখা আমার ভাগ্যে হয় নি।

অবশেষে একদিন আমার সব সঙ্কোচ, সব ভয়ের অবসানের বার্তা পড়লাম সংবাদপত্রে। বারান্দা ফাঁকা চিরদিনের জন্য। বকুলবাগান রোড ধরে চলতে চলতে বাহাত্তর নম্বর বাড়ির বারান্দায় সেই পরিচিত শুভ্র কেশ আর কোনদিন চোখে পড়বে না। কোন-দিন নয়। পোস্টকার্ডটা বের করে বার বার পড়লাম। হস্তলিপি অস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত।

শুধু বুঝি একজন মহাজ্ঞানীর মহাপ্রয়াণই নয়, একটা যুগেরও পরিসমাপ্তি, রসরচনার একটা বিশিষ্ট ধারারও ইতি।

অফিসে বসে কাজ করছি, ম্যানেজার এসে ঘরে ঢুকলেন, কন্‌গ্রাচুলেশন মিঃ চ্যাটার্জি!

ভাউচারের গোছা সরিয়ে মুখ তুললাম। কি ব্যাপার? অভিনন্দিত হবার মতন কিছু তো করিনি। জীবনে লটারির টিকেট কিনিনি, আর সরকার থেকে খেতাবের প্রশ্ন অবান্তর। তবে?

ম্যানেজার হাতের চিঠিটা এগিয়ে দিলেন, আপনার প্রমোশন হয়েছে। লক্ষ্ণৌতে বদলি হচ্ছেন ম্যানেজার হিসাবে।

খুব উৎফুল্ল হলাম না, বরং মনটা দমে গেল। মনের দস্তুরই তাই। যেখানে শিকড় বিছিয়ে বসে, সেখানেই জমে যায়। নড়তে চড়তে গেলেই শিকড়ে টান পড়ে, চেনা জায়গা চেনা পরিবেশের বন্ধন ছিঁড়তে গেলে বেদনায় স্নায়ুশিরা টনটন করে ওঠে।

নিরুপায়। কাশীবাস ওঠাতে হল।

সহকর্মীরা আমার বিদায়ের ব্যাপারটা জমকালো করে তুললেন। ফটো তোলা হল আমায় মাঝখানে রেখে। ছোটখাটো সভাও হল। ম্যানেজার ইংরাজীতে বললেন—গোপীবল্লভবাবু বাংলায়। আমার লক্ষ্ণৌ-গমনের সঙ্গে রামের বনগমনের তুলনা করে গোপীবাবু করুণ রস সৃষ্টির প্রয়াস করলেন।

স্টেশনেও আমায় অনেকে বিদায় দিতে গেলেন। হাতে মালা নিয়ে। স্টেশনে বেশ কিছু দেহাতী যাত্রী ছিল। তারা আমায় মালা-পরা অবস্থায় ট্রেনে উঠতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, গঙ্গামায়িকী জয়! প্ল্যাটফর্মে কিছু বাঙালী ছোকরা ঘোরাফেরা করছিল, তারা বলল, বন্দেমাতরম্!

ট্রেন ছাড়ল। একটু একটু করে উত্তরবাহিনী গঙ্গার বাঁক, বেনীমাধবের ধ্বজা মুছে গেল চোখের সামনে থেকে। কিন্তু শুধু বুঝি চোখের সামনে থেকেই সরে গেল, হৃদয় থেকে নয়।

প্রথম দর্শনেই লক্ষ্ণৌকে ভাল লেগে গেল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিরাট স্টেশন। অতুলনীয় স্থাপত্যের নিদর্শন। প্রশস্ত পথঘাট। দুপাশে দীর্ঘ গাছের সার।

টেলিগ্রাম করা সত্ত্বেও স্টেশনে কেউ আসেনি। বেনারস স্টেশনে অমন জমকালো বিদায়-অভিনন্দনের পর লক্ষ্ণৌয়ের অভ্যর্থনার ধারাটা প্রীতিপ্রদ ঠেকল না। পীড়াদায়ক একটা গল্পের অংশ মনে পড়তে লাগল।

এক হাকিম বদলি হচ্ছেন এক শহর থেকে আর এক শহরে। হাকিমটির খুব সুনাম ছিল না। বিদায়-অভিনন্দনের বিরাট আয়োজন হয়েছিল। ব্যাগপাইপ, ইংলিশ-ব্যাণ্ড, ফুলের মালা— এলাহি ব্যাপার। কিন্তু নতুন স্টেশনে নেমে হাকিম দেখলেন, গুটি তিনেক লোক তাঁকে নিতে এসেছে। বাজনা-বাদ্যির কোন আয়োজন নেই।

মেজাজ বিগড়ে গেল। নেমেই লোকদের বললেন, মুঙ্গের থেকে যখন এলাম, ওরা খুব বিরাট আয়োজন করেছিল। বিদায়-সভা, ইংলিশ-ব্যাণ্ড, বাতি-মালা, হৈ হৈ ব্যাপার।

দলের একটি লোক দু'হাত জোড় করে আস্তে আস্তে উত্তর দিল, আজ্ঞে আপনি যখন এখান থেকে যাবেন, আমরাও কি রকম আয়োজন করি দেখবেন। বিলিতি ব্যাণ্ড, দেশি বাজনা কিছু বাদ রাখব না।

একটা টাঙ্গা জোগাড় করে উঠে বসলাম। নির্দেশ দিলাম সোজা ব্যাঙ্কের ঠিকানায় যেতে। হজরতগঞ্জ। মে-ফেয়ার বিল্ডিং।

যাত্রার লগ্নটা বোধহয় শুভ ছিল না। ব্যাঙ্কের সামনে নেমে দেখলাম, দরজায় তালা বন্ধ। দারোয়ানের পাত্তা নেই। অবশ্য তখন সকাল সাড়ে আটটা। আর কারো থাকার কথা নয়। আশপাশের দোকানগুলো বন্ধ।

ফুটপাতের ওপরই বসলাম। সবচেয়ে নীচে সুটকেস, তার ওপর বেডিং, তারও ওপরে আমি। তাও শান্তি নেই। ঝাড়ু-ওয়ালী এসে আপত্তি জানাল। বলল, সরতে হবে। ফুটপাতে জল ঢেলে পরিষ্কার করবে।

আমি বললাম, ব্যাঙ্কের দরজা ছেড়ে আমার ওঠা অসম্ভব। আমাকে বাদ দিয়েই ধোয়া হোক।

অ্যাকাউন্টেন্ট এলেন সাড়ে ন'টার পর। এসেই থমকে দাঁড়ালেন। সুটকেস-বেডিংয়ের ওপর ম্যানেজার আসীন, তাও

ফুটপাতের ওপর। চারদিকে জলস্রোত। এমন একটা দৃশ্য নয়ন-স্নিগ্ধকর নয়। ভদ্রলোক কাছে এসে, আমাকে বাদ দিয়ে আমার বেডিংয়ের ওপর লেবেল পড়বার চেষ্টা করলেন, তারপর সন্দেহ, কৌতূহল মেশানো দৃষ্টিতে চাইতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, আমি চ্যাটার্জি। বেনারস থেকে আসছি।

আমি রিজভি। এখানকার অ্যাকাউণ্টেণ্ট।

সেই জলস্রোতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক-করমর্দন হল। রিজভি এবার হাঁকডাকে পাড়া সরগরম করে তুললেন। পিছন থেকে দারোয়ানরা এল, ব্যাঙ্কের দরজা খোলা হল। মালপত্তর সমেত আমি ভিতরে ঢুকলাম।

তখন রিজভির আসল কথাটা মনে পড়েছে।

একটা খবর দিয়ে যদি আসতেন স্যর, তাহলে এ রকম কষ্ট হত না।

বললাম, টেলিগ্রাম একটা করেছিলাম আসবার আগে।

সেকি! আমরা তো কোন সংবাদই পাইনি। কেবল হেড-অফিস থেকে জেনেছিলাম, আপনি এখানে আসছেন বেনারস থেকে।

রিজভির কথাই ঠিক। একটু পরেই পিয়ন টেলিগ্রাম নিয়ে এল।

কাণ্ডটা দেখুন স্যর। রিজভি তার-বিভাগের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠলেন। তারপর নরম গলায় বললেন, এখানে আপনার জানা-শোনা কোন লোক আছে কেউ? থাকার বন্দোবস্ত?

জানাশোনা লোক কেউ থাকলে ওভাবে ফুটপাতে বসতাম না, এমন একটা কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। শরীর পরিশ্রান্ত, মনও ক্লান্ত। বুদ্ধি করে স্টেশন থেকে হেভি টি সেরে নিয়েছিলাম, নয়তো জঠরও এতক্ষণে বিদ্রোহ করত।

বললাম, আপনাদের আগের ম্যানেজার কোথায় থাকতেন?

এক আত্মীয়ের বাড়িতে। বাদশাবাগে।

আমার জন্য কাছাকাছি একটা হোটেল ঠিক করুন।

হোটেল ঠিক হল। কাশ্মীর হোটেল। লালবাগ রোডের ওপর। মালিক একটি কাশ্মীরী ভদ্রলোক। সপরিবারে ওই হোটেলেই থাকেন। তাঁর স্ত্রীও রান্নাবান্নার তদারকে সাহায্য করেন। প্রতিটি বোর্ডারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজ নেন। অবশ্য স্বামীর মারফৎ।

বেশ সাজানো প্রকোষ্ঠ। সোফা, খাট, ড্রেসিং-টেবিল, লকার। প্রতি দু-ঘরের একটি বাথরুম।

স্থায়ী বোর্ডার আমরা তিনজন। আমি মাঝখানে। বাঁ দিকে খ্যাতনামা সাংবাদিক চালাপতি রাউ। দাদা রামা রাউ জেলে থাকায় তখন ন্যাশনাল হেরাল্ড সম্পাদনা করছেন। ডান দিকে বিক্রমজিৎ সিং। সিংহলী যুবক। নাচ শেখার জন্য লক্ষ্ণৌ এসেছে। শম্ভু মহারাজের ছাত্র।

বিকেলের দিকে অফিসের পর বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে আছি, একটি কৃষ্ণকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ার টেনে পাশে বসলেন। পরনে শার্ট আর প্যান্ট। হাতে পাইপ। কিছুক্ষণ পর আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনাকে নতুন দেখছি।

বুঝলাম ভদ্রলোক পরিচয় চাইছেন। পরিচয় দিলাম। নাম আর পেশা।

আপনি কি ব্যাঙ্ক-পরিদর্শনে এসেছেন কলকাতা থেকে ?

বললাম, না। স্থানীয় শাখার ম্যানেজার হিসাবে এসেছি। কয়েক বছর অন্তত থাকতে হবে এখানে।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে আমার করমর্দন করে বললেন, হুর্‌রে! বাঁচালেন আপনি। নিঃসঙ্গ অবস্থায় খুবই অসুবিধায় পড়েছিলাম। যারা আসে, তারা সুখের পায়রা। আলাপ হবার দিন চারেক পরেই সব উধাও। তাছাড়া, এই মুহূর্তে আর একজন সঙ্গীর আমার খুব প্রয়োজন ছিল।

আমি সবিস্ময়ে চোখ ফেরাতেই ভদ্রলোক অমায়িক হাসলেন।

আমি চালাপতি রাউ। ন্যাশনাল হেরাল্ডের। আমাদের কাগজের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?

শুনিনি। স্টেশনে যে কাগজটা কিনেছিলাম, তার নাম পাইওনিয়র। সেই কথাই বললাম।

চালাপতি রাউ হেসে বললেন, ওটা হচ্ছে আপনাদের কলকাতার স্টেট্‌সম্যান। যারা বিদেশের খবর বেশি জানতে চায়, তারা ও কাগজ পড়ে। ন্যাশনাল হেরাল্ড জাতীয় পত্রিকা।

এই পর্যন্ত বলেই ভদ্রলোক থেমে গেলেন। বার দুয়েক পাইপ ধরাবার বৃথা চেষ্টা করে বললেন, আমার কথাবার্তা শুনে আমাকে বোধহয় আপনার ন্যাশন্যাল হেরাল্ডের ক্যানভাসার বলে মনে হচ্ছে? আমি কিন্তু—

ওই কাগজের সম্পাদক তা আমি শুনেছি। বাধা দিয়ে আমি বললাম। ভদ্রলোক হাসিতে ফেটে পড়লেন।

যুদ্ধের দু-একটা খবর জিজ্ঞাসা করার মুখেই থেমে গেলাম। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। কে যেন নাচের তালে তালে ওপরে উঠছে। মুখেও কথক নাচের বোল।

ছিপছিপে চেহারার একটি ছোকরা। ঘাড় পর্যন্ত কুঞ্চিত চুলের রাশ। পরনে পাঞ্জাবি-পাজামা। গায়ের রং গঙ্গামাটি সদৃশ।

ছোকরাটি হাঁটছে না, নাচছে। আমি যে অপরিচিত একজন বসে আছি, সেদিকে দৃকপাতও নেই।

চালাপতি রাউ উঠে দুহাত প্রসারিত করে আহ্বান করলেন, হে নর্তকশ্রেষ্ঠ, অবহিত হও। তোমার সুদিন আগত।

নাচ না থামিয়েই ছেলেটি দুটি ভ্রূ তুলল আর নামাল। অর্থাৎ, কিসের সুদিন?

চালাপতি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ইনি মিস্টার চ্যাটার্জী, বেনারস থেকে বদলি হয়ে এসেছেন। আমাদের স্থায়ী

প্রতিবেশী। আমার নাইট ডিউটি থাকলে তোমার নাচ দেখাবার কোন অসুবিধা হবে না। বাংলাদেশের মানুষ। নাচ আর গানের এমন বোদ্ধা ভারতের আর কোন প্রদেশে নেই।

আমার দিকে চেয়ে বললেন, ইনি বিক্রমজিৎ সিং। সুদূর সিংহল থেকে নাচ শিখতে এসেছেন। অচ্ছন মহারাজ শম্ভু মহারাজের আশ্রমে।

বিক্রম ছুটো হাতে আমার একটা হাত টেনে নিল। আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, বাঙালীর ওপর আমার চিরদিনের শ্রদ্ধা। উদয়-শঙ্করের নাচের মধ্যে ভারতের আত্মাকে খুঁজে পেয়েছি। সত্যিই তিনি নটরাজ।

আমি চুপচাপ বসে রইলাম। এতটা উচ্ছ্বাসের পরে কি করে স্বীকার করি যে উদয়শঙ্করের নাচ আমি দেখিনি। ভারতের বিভিন্ন নৃত্যকলার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই বললেই হয়। বর্মাদেশে 'পোয়ে' নাচ দেখেছি বহুবার। ফো শিনের পোয়ে। মা মিয়া হানের নাচ। কিন্তু সেসব নাচের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করার মতন বুদ্ধি-বিবেচনা রাখি না, সে কথা বলতে সঙ্কোচ হল। বিশেষ করে প্রথম পরিচয়ের রাত্রে।

সে রাত্রে তিনজন পাশাপাশি বসে খেলাম। গভীর রাত পর্যন্ত অনেক গল্প হল। উত্তেজনার মুখে বিক্রম কয়েকবার উঠে নাচের ছু একটা ভঙ্গিও দেখাল। কঠিন কয়েকটা মুদ্রা। দ্রুত-তালে কয়েকটা কথক-বোলও শোনাল।

দিন সাতেকের বেশি নয়, তার মধ্যেই আমরা তিনজনেই অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়লাম। বয়স এক নয়, জাতি ভিন্ন, পেশায় পার্থক্য অনেক, কিন্তু এ সব কোন বাধাই নয়। যেদিন চালাপতি রাউয়ের নাইট ডিউটি থাকত না, সেদিন অনেক রাত অবধি নানা আলোচনা হত। দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক অবস্থা, যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি, আমাদের ভবিষ্যৎ। চালাপতি রাউ বলতেন,

আমরা শুনতাম। মাঝে মাঝে হোটেল বন্ধ হলে মালিকও এসে জুটতেন।

হঠাৎ যখন খেয়াল হত, তখন রাত হয়তো দুটো। সমস্ত লক্ষ্ণৌ শহর ঘুমে অচেতন।

বিক্রমই একদিন কথাটা পাড়ল।

গুরুজীর নাচ দেখতে যাবেন একদিন? অচ্ছন মহারাজ, শম্ভু মহারাজ দুজনেই থাকবেন আসরে। তাঁদের কৃতী শিষ্যেরা তো আছেই।

আমি রাজী। চালাপতি রাউ আগেও বার কয়েক দেখেছেন। এবারেও সঙ্গে রইলেন। হোটেলের মালিকেরও যাবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু মালিকানী বাদ সাধলেন।

না, সারারাত চুপচাপ বসে থাকতে কষ্ট হবে। বাতটা বাড়বে। ওঁর গিয়ে দরকার নেই, তাছাড়া উনি এ সবের বিশেষ কিছু বোঝেনও না।

মনে মনে হাসলাম। আমিই যেন এ সব খুব বুঝি। কিন্তু যেতেই হবে। লক্ষ্ণৌয়ে আছি, অথচ কথক-নাচ দেখিনি এমন একটা অপবাদের বোঝা বইতে রাজী নই।

তিনজনে যাত্রা করলাম। সারারাতের ব্যাপার, তাও খোলা জায়গায়। কাজেই নিজেদের যথাসম্ভব আবৃত করে নিলাম।

গিয়েই বিস্মিত হলাম। ভেবেছিলাম এমন একটা ব্যাপারে বিশেষ ভিড় হবে না। ঘরোয়া আসর। নিতান্ত নিমন্ত্রিত লোকেরাই শুধু থাকবে। কিন্তু শহরটা লক্ষ্ণৌ এটা মনে ছিল না। নাচ-গানের নেশা এখানকার লোকের রক্তকণিকায়, সেটাও জানতাম না।

বিক্রমের কল্যাণে আমরা ভাল আসনই পেলাম। গোলাকার জায়গা ঘিরে জনতা বসেছে। পুরনো যুগের অ্যাম্ফি-থিয়েটারের

মতন। প্রচুর আলোয় দিনের বিভ্রম আনছে। যন্ত্রীরা ধারে ধারে বসেছেন।

প্রথমে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি নাচ হল। এ নাচে পায়ের কাজই বেশি। তার সঙ্গে মুখ-চোখের ভাবও লক্ষ্যণীয়।

বিক্রমও নাচল। শিকারী নৃত্য। ব্যাধ আর হরিণ দুটোরই রূপ ফোটাল নৃত্যের ব্যঞ্জনায়।

অচ্ছন মহারাজ আসরে এসেছিলেন, কিন্তু নাচলেন না। শরীর অসুস্থ। তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে দেখতে লাগলেন।

সব শেষে উঠলেন শম্ভু মহারাজ। ঘড়িতে দেখলাম রাত তখন সাড়ে তিনটে। মাথায় বাঁকানো টুপি। পরনে পাঞ্জাবি, পাজামা। পাঞ্জাবির ওপর ভেলভেটের জহরকোট।

প্রথমে নাচের বিষয়টা বললেন। আকাশে মেঘের ভার। তার বুকে বিজলির ঝিলিক। মেঘের কালো রং দেখে শ্রীরাধার মনে পড়ে গেল বনমালীর কথা। জল ফেলে জল আনার ছুতোয় কাঁখে গাগরী তুলে নিলেন। পিছল পথ, নিকষ অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে আলোকিত হচ্ছে পথঘাট। শ্রীরাধা সেই আলোয় একটু একটু করে এগিয়ে চলেছেন। কুটিলা ননদিনীর ভয়ে সশঙ্ক হৃদয়, অথচ প্রিয়তমের মিলনাকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ। এক চোখে ভয়, এক চোখে আশা। দৃষ্টিতে সমাজভয় আর প্রিয়সঙ্গ-সুখের অনির্বচনীয় দীপ্তি।

শম্ভু মহারাজ দু চোখে দুটি বিভিন্ন দৃষ্টি ফোটালেন। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলাম। মাথার ওপর থেকে রাত্রির আকাশ মুছে গেল। আশপাশের জনতা কোথায় উধাও। লক্ষ্ণৌ নয়, বৃন্দাবন। অভিসারিকা রাধার হৃদয়ের অনুভূতি নিজের হৃদয়ে বোধ করতে লাগলাম।

শম্ভু মহারাজ নিতান্ত কৃশকায় নন, কিন্তু নাচের তালে তালে, চোখের ভঙ্গীতে, হস্ত-সঞ্চালনের ছন্দে চোখের সামনে কমনীয়

তত্ত্বার রূপ কি ভাবে ফুটিয়ে তুললেন, তা ভেবে আজও বিস্মিত হই। এ কি করে সম্ভব!

শুধু তাই নয়। শ্রীমতী অভিসারে চলেছেন। পাছে নুপুর-নিক্কণে ধরা পড়ে যান, তাই বস্ত্রখণ্ড দিয়ে নুপূরের রাশ বেঁধে নিয়েছেন। শম্ভু মহারাজ নীচু হয়ে ঘুঙুরগুলো বেঁধে নেওয়ার ভঙ্গী করলেন। আশ্চর্য, অপরূপ ছন্দে শম্ভু মহারাজ এগিয়ে চললেন নৃত্যের তালে তালে, কিন্তু ঘুঙুরের একটু শব্দ হল না। শ্রীরাধার মনের অবস্থা বুঝে নূপুরও বুঝি নীরব হল।

শেষকালে প্রিয়সমাগমে রাধিকার দু চোখে যে উল্লাসের ঝিলিক শম্ভু মহারাজ নিজের চোখে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তার তুলনা নেই।

নাচের আসর যখন শেষ হল, তখন প্রায় ভোর। অল্প আলো ফুটেছে পূর্ব গগনে। কিছু আলো, কিছু অন্ধকার।

চালাপতি রাউ আর আমি উঠে দাঁড়ালাম। সারারাত বসে কেটেছে, নিদ্রাহীন, অথচ শরীরে একটু ক্লান্তি নেই, মনে তো নয়ই।

একটু পরেই বিক্রম এসে দাঁড়াল, কেমন লাগল? আপনি তো কথক নাচ এই প্রথম দেখলেন?

প্রশ্নটা আমাকে। মনে মনে বললাম, কথক তো দূরের কথা, ভারতীয় নাচ দেখা এই প্রথম। মুখে বললাম, অপূর্ব। এমন জিনিস দেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ নেবেন। শম্ভু মহারাজের নৃত্য তুলনাহীন।

বিক্রমের নাচও চমৎকার। আমার তো বিক্রমের নাচই সবচেয়ে ভাল লেগেছে।

নারীকণ্ঠে চমকে উঠলাম। বিক্রমের পিছনে অস্পষ্ট এক নারী-মূর্তি। ভোরের আলোয় আয়ত দুটি চোখ আর ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের গোছা দেখা গেল। গায়ের রং কালো, কিন্তু দু-চোখের অম্লান দীপ্তিতে রংয়ের অন্ধকার অনেক ফিকে। কালো, তা সে যতই

কালো হক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ,—কবির এ উক্তি এ মেয়েটির প্রতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায়।

মেয়েটির কথা কানে যেতেই বিক্রম জিভ কেটে দু কানে হাত ঠেকাল, ছি-ছি, যে আসরে গুরুজী নেচেছেন, সেখানে আমাদের কথা বলতে আছে ?

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে বিক্রম আমাদের দিকে ফিরে বলল, এই হচ্ছে রত্না, এ-ও সিংহল থেকে এসেছে। এখানকার ম্যারিস মিউজিক কলেজে গান শেখে।

চালাপতি রাউ আগেই পরিচিত ছিলেন মেয়েটির সঙ্গে। হেসে শুধু হাতজোড় করলেন। আমিও তাই করলাম।

আরো একটু আলো ফুটেছে। রত্নাকে আরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আয়ত ,গভীর দুটি চোখ। মাদকতাময় দৃষ্টি। এই দৃষ্টি দিয়েই সে দেখেছে বিক্রমের নাচ। তার চোখে বিক্রমের নাচ সবচেয়ে ভাল লেগেছে।

বিক্রমের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পর অনেক কথা শুনেছি রত্নার সম্বন্ধে। অপূর্ব গানের গলা। নিজেদের বিরাট কফির বাগান আছে সিংহলে। তাদের অবস্থার সঙ্গে বিক্রমদের অবস্থার তুলনা হয় না। বিক্রমের বাবা এক মন্দিরের পুরোহিত। পুরোহিতের পক্ষে তার ছেলেকে এত দূরদেশে পাঠিয়ে নাচ শেখানোর বিলাসিতা সম্ভব নয়, টাকা দেন বিক্রমের এক নিঃসন্তান খুড়ো। বিক্রম এখানে আসার মাস ছয়েকের মধ্যেই রত্না চলে আসে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে। বোন গান শেখে, ভাই তবলা।

কিন্তু শুধু যে গানের টানে কলম্বো থেকে রত্না লক্ষ্ণৌ ছুটে আসেনি, সেটুকু বুঝতে দেরি হয়নি।

নিজের চোখেও বহুবার দেখেছি।

বাদশাবাগ থেকে টাঙ্গায় ফিরছি, হঠাৎ গোমতীর ধারে নজর পড়ল। একেবারে জলের কিনারে বসে আছে দুজনে। পাশাপাশি। বিক্রম একটানা কি বলছে, আর তন্ময় হয়ে রত্না শুনছে।

আলোচনাটা যে নাচ আর গান নিয়ে নয়, সেটুকু ওদের মুখ-চোখের ভাব দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।

কথাটা বিক্রমকে বলেওছিলাম একদিন।

সলজ্জ হেসে বলেছিল, আপনি নামলেন না কেন? আপনাকে পেলে রত্না আর আমি দুজনেই খুব খুশি হতাম।

হেসে বিক্রমের পিঠে হাত রেখে বলেছি, ক্রৌঞ্চবধের পাপ স্পর্শ করত আমাকে। ক্রৌঞ্চ-বধূর অভিশাপ লাগত।

বেশ কয়েক মাস পরের কথা। ব্যাঙ্ক থেকে হোটেলে ফিরছি, দুতলায় পা দিয়েই দেখলাম রত্না দাঁড়িয়ে আছে বিক্রমের দরজার সামনে। দরজায় বিরাট তালা ঝুলছে।

আমাকে দেখে রত্না এগিয়ে এল, বিক্রম কোথায় গিয়েছে বলতে পারেন?

মাথা নাড়লাম, তা তো জানি না। আমি সকাল সাড়ে নটায় বেরিয়ে গেছি। নিশ্চয় নাচের ক্লাসে গেছে।

না, সেখানে যায়নি।

তাহলে বোধহয় এদিক-ওদিক কোথাও গিয়েছে। আপনি আমার ঘরে অপেক্ষা করুন। এখনই আসবে।

রত্নার গলার স্বর অশ্রুরুদ্ধ। আস্তে আস্তে বলল, না, তার নিশ্চয় কিছু হয়েছে। আজ বিকেলে আমাদের কলেজেও যায় নি। পাঁচ বছরে এই প্রথম ছুটির সময় তাকে গেটের পাশে দেখলাম না।

আমি ব্যাঙ্কের কর্মচারী। টাকা-আনা-পাইয়ের লেন-দেনটাই বেশি বুঝি, হৃদয়ের লেন-দেনের খবর রাখি না। তবে সাহিত্যিক মন একটা আছে, ছোট ছোট আবেগ, ছোট অনুভূতি, চোখের জলের ফোঁটা সে মন নিভৃতে সঞ্চয় করে রাখে। তাই দিয়ে কল্পনার জাল বুনি। কোনটা সম্পূর্ণ হয়, কোনটা অসমাপ্ত অবস্থাতেই বাতাসে মিশিয়ে যায়। হাজার মাথা ঠুকেও আর খুঁজে পাই না।

বুঝলাম, ভালবাসার ধরনই এই। বিন্দুতে সিন্ধুর সন্ধান পায়। প্রিয়জনকে পলকে হারায়।

রত্না আমার পিছন পিছন আমার কামরায় এসে বসল। কিছুতেই খাবে না, জোর করে এক কাপ চা খাওয়ালাম।

রাত দশটা পর্যন্ত বসে রইল, বিক্রম এল না।

রত্না যখন উঠে দাঁড়াল, তখন জল তার চোখের কোণ ছাপিয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

আমি আর তার দিকে চাইতে পারলাম না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, আশ্চর্য, বিক্রম তো এখনও এল না!

মুখ যখন ফেরালাম তখন রত্না নেই। নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে।

সে রাতে বিক্রম ফিরল না।

বিক্রম ফিরল ভোরবেলা।

ব্যাঙ্কে যাচ্ছি, দেখলাম নিজের কামরার সামনে একটা চেয়ারের ওপর বিক্রম আধশোয়া অবস্থায়। অবিন্যস্ত চুল, আরক্ত দুটি চোখ। এক রাত্রির ব্যবধানে একটা লোকের চেহারায় যে এত পরিবর্তন হতে পারে, ভাবা যায় না।

আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু দৃষ্টি আমার দিকে ফেরাল না।

কি ব্যাপার? কোথায় ছিলে সারা রাত? রত্না খুঁজতে এসেছিল।

খুব আস্তে, প্রায় জড়ানো গলায় বিক্রম বলল, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

কোথায়?

সিলোনে ফিরে যাচ্ছি।

কেন, কারো অসুখ-বিসুখ নাকি?

বিক্রম ঘাড় নাড়ল, যে কাকা আমায় টাকা পাঠাতেন, তিনি মারা

গেছেন। তাঁর অন্য আত্মীয়রা এভাবে আমার পেছনে টাকা নষ্ট করতে রাজী নয়। আমার এতদিনের আশা, আকাঙ্খা, সাধনার ইতি। অথচ, কি নিয়ে বাঁচব আমি? কোন্ আদর্শের মুখ চেয়ে নিজেকে গড়ে তুলব?

কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। কোন উত্তর আমার জানাও ছিল না। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। অফিসের দেরি হয়ে যাবে।

সিঁড়িতে নামতে নামতে বললাম, বিকেলে এসে তোমার সঙ্গে কথা বলব। তুমি থেকো।

বিকেলে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। এক পার্টির পাল্লায় পড়ে গুদামঘরের সন্ধানে অর্ধেক লক্ষ্ণৌ চষে বেড়ালাম। যখন ফিরলাম তখন রাত প্রায় আটটা। বিক্রম নেই। চালাপতি বসে বসে একলা দাবা খেলছিলেন।

সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। বিক্রমের খবর শুনেছেন?

চালাপতি মারাত্মক একটা চালে বিব্রত ছিলেন। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চিন্তায় বিভোর। ঘাড় না তুলেই বললেন, শুনেছি। মুশকিলের আসান হয়ে গেছে।

কি রকম? আর একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম পাশে।

মন্ত্রী সরাতে সরাতে চালাপতি বললেন, দুপুরবেলা রত্না এসেছিল। অনেকক্ষণ কথা হয়েছে দুজনে। বিক্রমের ভার রত্না নিয়েছে। সে-ই খরচপত্র চালাবে।

সেকি? অনেক টাকার ব্যাপার? বিক্রম শোধ করবে কি করে? নিতান্ত ব্যাঙ্কের কর্মচারীর মতন কথাটা জিজ্ঞাসা করে ফেললাম।

চালাপতি এতক্ষণে মুখ তুললেন। হেসে বললেন, টাকার ঋণ কি সব সময় টাকা দিয়ে শোধ করতে হয়?

সত্যি কথা। ভাবতে ভাবতে নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকলাম।

নারী বিচিত্ররূপিনী। তার রহস্যের কূল-কিনারা নেই। নদীর সঙ্গে নারীর তুলনা করেন সাহিত্যিকরা। সাগরের যত সান্নিধ্যে আসে, নদী তত দুর্বার। এক কূল ভেঙে আর এক কূল গড়তে গড়তে নদী এগিয়ে চলে, নারী কিন্তু দুই কূলই গড়ে। বন্যার মতন নারী।

নারী-চরিত্র বিশ্লেষণ করার সময়ে ভাবতেও পারি নি, আর এক রহস্যময়ী নারীর আবির্ভাব হবে আমার জীবনে। অল্প কিছুদিন পরে।

অফিসের কাজ সেরে উঠব উঠব ভাবছি, একটি ভদ্রলোক কামরায় এসে ঢুকলেন। পিছনে একটি তরুণী। অবগুণ্ঠিতা। আনতমুখী।

ভদ্রলোক বললেন, মহিলাটি তাঁর বোন। ভগ্নিপতি যুদ্ধে গেছেন। ঠিক কোথায়, রাজনৈতিক কারণে তা বলা সম্ভব নয়। বিরহিনী স্ত্রীর দিন কাটছে না। তাই ভদ্রলোক তাঁকে লক্ষ্ণৌর ম্যারিস মিউজিক কলেজে ভর্তি করতে এসেছেন। সুরের ধারায় যাতে বিরহের দাহের উপশম হয়।

উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু এর মধ্যে আমার ভূমিকাটা কোথায়?

সে কথাও বললেন ভদ্রলোক। প্রতি মাসে তিনি বেনারস থেকে কিছু টাকা পাঠাবেন ভগ্নীর নামে, সেই টাকা যাতে ভগ্নী ঠিক পান, সেই ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে।

এর মধ্যে ব্যবস্থা করার কি আছে? প্রতি মাসে চেক কেটে তিনি প্রয়োজনীয় টাকাটা তুলে নিলেই পারেন।

তা অবশ্য পারেন, কিন্তু গ্রীষ্মের খরদাহে ব্যাঙ্কে এসে টাকাটা তোলা একটু কষ্টকর। কোন লোকজনও নেই, যাকে দিয়ে এ কাজটা করাতে পারেন, তাই আমি যদি একটু কষ্ট করে প্রতি মাসে ব্যাঙ্কের দারোয়ানকে দিয়ে টাকাটা মালিককে পাঠিয়ে দিই, তাহলে ভদ্রলোক

আজীবন কৃতার্থ থাকবেন। মহিলা থাকবেন ওয়াই. ডব্‌লিউ. সি. এ-তে। ব্যাঙ্কের খুবই কাছে।

বেশ। রাজী। ভদ্রলোক যদি সেই রকম লিখিত নির্দেশ দিয়ে যান তো তাই হবে। এতে আর অসুবিধাটা কোথায়!

কোন অসুবিধা হল না। মাসচারেক দারোয়ানই টাকাটা নিয়ে গেল। ভাউচারে সই দেখলাম মণিকা দেবী! আঁকা-বাঁকা অগঠিত অক্ষর। বোঝা গেল শিক্ষা মধ্যবিত্ত।

গোলমাল বাঁধল পাঁচমাসে। দারোয়ান এসে বলল, মাইজী আপনাকে ডেকেছেন।

মাইজী? কে মাইজী?

ওই যে যাকে দারোয়ান মাসে মাসে টাকা দিয়ে আসে।

বুঝলাম। কিন্তু আমাকে ডাকা কেন? আমার সঙ্গে কি দরকার? কি দরকার তা দারোয়ানেব জানার কথা নয়। সে বার্তাবহ মাত্র।

কিছু বললাম না। ভাবলাম, হোটেলে ফেরার মুখে মহিলার খোঁজ নিয়ে আসব। কি প্রয়োজন তাও কিছুটা আন্দাজ করলাম। সেই সময় খুচরোর খুব টানাটানি। সিকি, দোয়ানী সব নাকি বন্দুকের টোটা হয়ে যাচ্ছে। পার্কের লোহার বেড়াও রেহাই পাচ্ছে না। ব্যাঙ্কে খুব ভীড়। এই খুচরোর জন্য। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে লিখে লিখেও আমরা প্রয়োজনমত খুচরো পাচ্ছি না। মহিলার সেই খুচরোই দরকার। দারোয়ানকে বলে সুফল পাবেন না বুঝে আমাকে তলব করেছেন।

দিন চারেক পরে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে ওয়াই. ডব্‌লিউ. সি. এ-তে ঢুকলাম। সামনে প্রশস্ত লন। এখানে-ওখানে বেঞ্চ পাতা। দু-একটি মহিলা ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছেন।

লনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটি মহিলা এগিয়ে এলেন। নিজের নামের কার্ডটা তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, মণিকা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মহিলা অপাঙ্গে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন, বসুন।

এদিকে-ওদিকে চেয়ে একটা বেঞ্চে বসলাম। আধঘণ্টার ওপর। যখন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, তখন কানের কাছে নারীকণ্ঠ শুনলাম, কি ভাগ্যি আমার!

ঘাড় ফিরিয়েই বিস্মিত হলাম।

সেদিনের অবগুণ্ঠনের বালাই নেই। মাথার চুল এলোখোঁপার ধরনে জড়ানো। মুখে উগ্র প্রসাধন। টানা চোখকে আরো টানা করার প্রয়াস। রক্ত বিম্বাধর। লিপস্টিকের ছোঁয়ায়—সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না। পরনে দামী শাড়ি, চরণে হাই-হিল।

হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আপনি দেখা করতে বলেছেন। অবশ্য প্রয়োজনটা আঁচ করতে পারছি।

মণিকা দেবী কটাক্ষ বিলোল করলেন। মুচকি হাসি ফোটালেন ওষ্ঠের প্রান্তে। বললেন, প্রয়োজনটা কি বলুন তো?

বললাম, খুচরো।

মণিকা দেবী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ার ভান করলেন। একসময়ে হাসি থামিয়ে বললেন, মোটেই না। খুচরোর ওপর আমার একটুও লোভ নেই। আমার দরকার পুরো বস্তুর।

কি ভেবে বলেছিলেন জানি না, কিন্তু কথার ধরনটা ভাল লাগছে না। কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

আশ্চর্য লোক আপনি। চারমাসের ওপর এসেছি, একবারও কি দেখা করতে নেই।

মাস মাস টাকা পেতে আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে? ঠিক দিনেই তো দারোয়ানকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কেবল গত মাসে বোধহয় দেরি হয়েছিল, কারণ টাকাটা পাঠাতে আপনার দাদা একটু দেরি করেছেন।

ও? টাকা দেওয়াটাই বুঝি সব! মণিকা দেবী কণ্ঠে অভিমানের

রেশ আনলেন, একজন মহিলা আত্মীয়হীন অবস্থায় বিদেশে পড়ে আছে, তার দেখাশোনা করা, খোঁজ-খবর নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই? আপনি যেটুকু করছেন, সেটা তো ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কর্তব্য। স্বজাতি হিসাবে কি করেছেন বলুন?

চিন্তিত হলাম। স্বজাতি হিসাবে দুবেলা যদি খোঁজ নেওয়া আমার কর্তব্য হয়ে থাকে, তবে কর্তব্যের ত্রুটি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মহিলার দেখাশোনাও আমায় করতে হবে এমন অলিখিত চুক্তি তাঁর দাদার সঙ্গে হয়েছিল কিনা, অনেক ভেবেও তা মনে আনতে পারলাম না।

প্রশ্ন এড়িয়ে বললাম, কেন ডেকেছেন বলুন?

মণিকা দেবী দু-এক পা এগিয়ে এসে বললেন, চলুন, আমার সঙ্গে মার্কেটিংএ যেতে হবে।

অগত্যা। রাস্তা থেকেই একটা টাঙ্গা নিলাম। মণিকা দেবী টাঙ্গাওয়ালাকে নির্দেশ দিলেন। আমিনাবাদ। তীরবেগে অশ্বিনী-কুমার ছুটল। ঝাঁকানিতে গায়ে গায়ে লাগতে লাগল। অপরিসর স্থানে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হল, যতটা ঝাঁকানি, দেহের সঙ্গে দেহের সংযোগটা যেন তার চেয়েও বেশি। আমি যথাসম্ভব সরে বসেও স্পর্শ এড়াতে পারলাম না। খুব যে স্পর্শকাতর তা অবশ্য নই, কিন্তু ব্যাপারটা সন্দেহের অতীত বলে মনে হল না। মণিকা দেবী ক্রমেই কথাবার্তায় চটুল হয়ে উঠলেন। তাঁর সাজ-পোশাকে তো নয়ই, আচার-আচরণেও তাঁকে প্রিয়বিরহ বিধুরা স্ত্রী বলে মনে হল না। আমি দু-একবার তাঁকে পারিবারিক কয়েকটা প্রশ্ন করে বিব্রত হলাম। তিনি কোনরকমে দায়সারা উত্তর দিয়ে শহরের বিভিন্ন সিনেমায় প্রদর্শিত ছবির কথা পাড়লেন। আমি এ বিষয়ে খুব ওয়াকিবহাল নই। নিতান্ত মে-ফেয়ার বিল্ডিংয়ে অফিস, তাই মে-ফেয়ারের খবরটা রাখি। আমার অজ্ঞতায় মণিকা দেবী বিস্মিত হলেন।

ঈশ্বর দয়াবান। আমার অজ্ঞতার আরও প্রমাণ পাবার আগেই টাঙ্গা আমিনাবাদ পার্কে এসে দাঁড়াল।

দুজনে নামলাম। শুরু হল মার্কেটিং। এ যে কি ক্লান্তিকর, তা যাঁরা এ দুর্ভোগ সয়েছেন, তাঁরা জানেন। প্রথমে জিনিস বাছাই, তারপর রং পছন্দ, শেষে দাম কষাকষি। এর চেয়ে জেনারেল লেজার টেনে নিয়ে বত্রিশ পাতা টোটাল দেওয়া ঢের সহজসাধ্য।

কেনা-কাটার পালা শেষ হতে মণিকা দেবী তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, চলুন কোন চায়ের দোকানে গিয়ে বসি।

এতে আমার আপত্তি ছিল না। শুধু তৃষ্ণার্ত নয়, যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষুধার্তও বোধ করছিলাম। ব্যাঙ্ক থেকে সোজা কর্তব্য করতে এসেছি। বৈকালিক জলযোগ অদৃষ্টে জোটে নি।

একটা দোকানে গিয়ে বসলাম।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মণিকা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় থাকেন এখানে?

হোটেলের নাম বললাম।

মণিকা দেবী ভ্রূকুঞ্চিত করলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, এত কাছে থাকেন, একেবারে পাশে, অথচ একবার খোঁজ নিতে আসতে পারেন না?

বললাম, সকলের খোঁজ নিতে গেলে আমাদের চলে না। নির্দেশমত টাকা পাঠাচ্ছি, আপনার সই দেখছি। বুঝতে পারছি, আপনি ভাল আছেন। তাছাড়া, আপনাকে দেখেও মনে হচ্ছে আপনি রীতিমত সুস্থ আছেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত ছিলই, মণিকা দেবী গোটা কয়েক আঁচড় ফোটালেন কপালে, একটা মানুষের বাইরেটা দেখে তার কতটুকু বোঝা যায়? চলছি, ফিরছি, খাওয়া-দাওয়া করছি, কাজেই ভাল আছি। কী চমৎকার আপনার ধারণা। কতবড় একটা জ্বালা বুকে নিয়ে ছুটোছুটি করছি যদি জানতেন!

শান্তকণ্ঠে, সমবেদনার সুরে বললাম, এ যুদ্ধ থেমে যাবে। আপনার স্বামীও ফিরে আসবেন। চিরদিন আগুন জ্বলতে পারে না।

মণিকা দেবী বিরক্ত হলেন। চায়ের কাপ সশব্দে ডিশের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, আপনি ভেবেছেন স্বামী ফিরে এলেই সুড়সুড় করে তার তৈরি খাঁচায় গিয়ে ঢুকব? দুটো সংস্কৃত মন্ত্রের জোরে আমার স্বাধীনতা, আমার ব্যক্তিত্ব যে ক্ষুণ্ণ করতে চায়, তার সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখব? কখনই নয়। জীবনকে আমি জানতে চাই, যে জীবনকে আমার সংসার আড়াল করে রেখেছিল, সেই জীবনের স্বাদ আমি পেতে চাই। সংসারের চেয়েও পৃথিবী অনেক বিরাট।

চায়ের কাপটা শক্ত হাতে ধরা ছিল, নয়তো আমি চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা মেঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে যেত। খুব ছেলেবেলা থেকে উপন্যাস পড়ার অভ্যাস। সৎ অসৎ দুই সাহিত্যই গোগ্রাসে গিলেছি। গোগ্রাসে বলেই হয়তো বহুদিন রোমন্থনও করেছি ঘটনাংশ। নায়িকারা এই ধরনের কথাই বলে। এমনি উচ্ছ্বাসে ভরা, এমনই অর্থহীন।

মনে মনে ভাবলাম, জীবনকে দেখার খেসারত কি মারাত্মক, সেটুকু বোধ জন্মাবার মতন বয়স মহিলার নিশ্চয়ই হয়েছে। সংসার ডিঙিয়ে নিজেকে তার বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবার ফল কি বিষময় হতে পারে, তাও নিশ্চয় মণিকা দেবীর অজানা নয়। এটুকু বুঝতে পারলাম, কোন কারণে মণিকা দেবী সুখী নন। দাম্পত্য-জীবন তাঁদের মধুর হয়নি, কিন্তু তাই বলে প্রজাপতি-বৃত্তি অবলম্বনের সমর্থন করা যায় না।

উঠে দাঁড়ালাম। কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মতন অন্তরঙ্গতা মণিকা দেবীর সঙ্গে আমার ছিল না। সে চেষ্টাও করি নি। কিন্তু তাঁর চাল-চলন রীতি-নীতি আদব-কায়দা আমার ভাল লাগে নি। তাঁর এই অযথা হৃদ্যতার প্রচেষ্টাটুকুও।

টাঙ্গায় ফিরলাম।

নামার সময়ে মণিকা দেবী অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসলেন। নিজের দুটো হাত দিয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, আবার কবে দেখা হচ্ছে বলুন? এই শনিবার? আসুন, আমি অপেক্ষা করব আপনার জন্য। টাঙ্গায় চড়ে 'ছত্রমঞ্জীলের দিকে বেড়াতে যাব।

অনেক পুরনো একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

টাউনজিতে এক পাহাড়ের উপর উঠেছি। সঙ্গে আরও তিন-চারজন সমবয়সী স্থানীয় বন্ধু। উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের ওপর বসে পাশে হাতটা রাখতেই চমকে হাতটা সরিয়ে নিয়েছিলাম। বরফের চেয়েও শীতল। ক্ষণেকের স্পর্শে আমার স্নায়ু শিরা সব যেন নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল।

দাঁড়িয়ে উঠে বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে দেখেছিলাম চমৎকার রঙের ছিটে দেওয়া সরীসৃপটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে পাথরের পাশ দিয়ে। কটাক্ষহীন, নিস্পৃহ দুটি চোখ, মাঝে মাঝে শুধু দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা লকলক করে উঠছে।

আজকের স্পর্শে অবিকল সেই স্বাদ। সেদিনের মতনই ছিটকে সরে গেলাম। মণিকা দেবীকে গেট অবধি পৌঁছে দেবার ভদ্রতাটুকু না করেই তীরবেগে হোটেলের দিকে চলতে শুরু করলাম।

প্রায় সারাটা রাত বিছানায় ছটফট করলাম। শেষ রাতে ঘুম এল। যখন ঘুম ভাঙল, তখন ভোর হচ্ছে। জানালার রঙীন কাঁচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের প্রসন্ন কিরণ সোফার উপর এসে পড়েছে। এমন মায়াময় পরিবেশে মন ক্ষমাশীল হয়ে ওঠে, ছোটখাটো কুশ্রীতা, দীনতার উর্ধ্বে চলে যায়। অন্ধকার রাত্রির অস্তিত্বও মুছে যায়।

ঠিক করলাম, এ ভয় আমি কাটিয়ে উঠব। সঙ্কোচই মৃত্যু। প্রয়োজন হলে স্পষ্ট গলায় মণিকা দেবীকে বলে দেব, তাঁর

জীবন দেখার এই সর্বনাশা খেলায় অন্তত আমার কোন অংশ থাকবে না।

তারপর অনেকদিন দেখা হয় নি। আমিই দেখা করিনি। দারোয়ান বারকয়েক খবর দেওয়া সত্ত্বেও।

দেখা করি নি, কিন্তু মণিকা দেবীকে দেখেছি। পথ দিয়ে চলেছি, দেখলাম কোন সিনেমার সামনে অপেক্ষমান জনতার মধ্যে মণিকা দেবী রয়েছেন। একলা নয়, পাঞ্জাবি-পাজামা পরা আর একটি তরুণও রয়েছে সঙ্গে। কোনদিন হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখলাম মণিকা দেবীকে। লালবাগ রোড ধরে চলেছেন, সঙ্গে একটি ভদ্রলোক। শার্ট-প্যাণ্ট পরা। বুঝলাম, মণিকা দেবী জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে বেরিয়েছেন।

মুখোমুখি দেখা হল আরও কিছুদিন পরে। আউটরাম রোড ধরে টাঙ্গায় ফিরছি। নির্জন পথ। তুপাশের দীর্ঘ গাছের ছায়ায় আরও অন্ধকার। ঠিক সামনেই দেখলাম একটি মহিলা সাইকেলের ওপর, পাশে একটি ভদ্রলোক সাইকেল ধরে ধরে হাঁটছেন। বোঝা গেল, মহিলাটি সাইকেল-চড়া শিখছেন। ভদ্রলোক শিখতে সাহায্য করছেন।

পাশাপাশি যেতেই চিনতে পারলাম। শুধু আমি নয়, মহিলাও।

মিস্টার চ্যাটার্জি! সাইকেল একেবারে টাঙ্গার সামনে।

নামলাম। তু হাত জোড় করে নমস্কার করে বললাম, ভাল আছেন?

মণিকা দেবী ঘাড় নাড়লেন, তারপর ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আসুন, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মাস্টার প্রসাদ। ফোর্থ ইয়ারে পড়েন। গানের গলাও চমৎকার। ইনি মিস্টার চ্যাটার্জী, আমার বহু পুরনো বন্ধু।

কথা শেষ করেই মণিকা দেবী আর এক কাণ্ড করলেন।

লাফিয়ে টাঙ্গায় উঠে পড়ে বললেন, আপনি বাড়ি যান মিস্টার প্রসাদ। আমি এঁর সঙ্গেই ফিরছি।

মিস্টার প্রসাদ সাইকেল চালিয়ে অদৃশ্য হলেন। আমি তখনও পথে দাঁড়িয়ে।

আমি কিন্তু অন্য দিকে যাচ্ছি। নিরাসক্ত গলায় বললাম।

ঠিক আছে, একসময়ে তো হোটেলে ফিরবেন। মণিকা দেবী ভাল হয়ে বসলেন আমার বসার জায়গা রেখে।

আপত্তি করা অর্থহীন। তর্ক করাও তাই। কাজেই টাঙ্গায় উঠে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরে মণিকা দেবী হঠাৎ বললেন, কি হল, কথা বলছেন না যে! রাগ করেছেন বুঝি, না ঈর্ষা?

রাগ-অনুরাগের প্রসঙ্গ কেন ওঠে বুঝতে পারলাম না। ঈর্ষা-দ্বেষের কথাও। অবশ্য, রাগের প্রশ্ন হয়তো উঠতে পারে, কারণ, কয়েকবার মণিকা দেবীর আমন্ত্রণ অবহেলা করেছি, কিন্তু ঈর্ষার কি কারণ থাকতে পারে?

সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম, ঈর্ষার কথা বলছেন কেন? কিসের ঈর্ষা?

মণিকা দেবী দুটি চোখ বিস্ফারিত করে অপরূপ ভঙ্গীতে হাসলেন, তারপর বললেন, এই অন্য লোকের সঙ্গে পথে-ঘাটে বেড়াই, আপনার মনে মনে ঈর্ষা হয় নিশ্চয়?

সেই মুহূর্তে যদি খুব কাছে বজ্রপাত হত তাহলেও বোধহয় এতটা বিচলিত হতাম না। আর নয়, মহিলা যখন নিজের মুখোশ খুলে ফেলেছেন, তখন আমারও কোন বাধা নেই। খুব কঠিন কণ্ঠে বললাম, আপনার আর আমার দেশ এক, সেটুকু ভাবতেই ঘৃণায় মনটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে। লাস্য আর ছলনার জাল ছড়িয়ে যাদের ধরা যায়, তারা উঁচুদরের কেউ হয় না। হতে পারে না। মনের মানুষকে সাধনার দ্বারা পেতে হয়। নিজের সংসারে আগুন

জ্বালিয়ে সেই আগুনে মশাল জ্বেলে পথের মানুষকে খুঁজে বেড়ালে ঠকতে হয়।

কথাগুলো বলেই টাঙ্গা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, টাঙ্গা আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত আছে, আপনাকে কিছু দিতে হবে না। আমি যাচ্ছি, আমার এখানে কাজ আছে।

টাঙ্গা চলে গেল। চলতে চলতে আমি মুখ তুলে চাইলাম। মণিকা দেবী চুপচাপ এক কোণে বসে আছেন। দুটি হাত কোলের ওপর জড় করা। বিষণ্ণ পাষাণপ্রতিমার মতন। সারা মুখে একটি ফোঁটা রক্তের চিহ্ন নেই।

সেদিন খুব ভাল লেগেছিল। তখন বয়স কম, অভিজ্ঞতা আরও কম। ভেবেছিলাম, নির্মম হয়ে মণিকা দেবীকে না বাঁচাতে পারি, নিজেকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু আজ ভাবি, এ উচ্ছ্বাসের কি দাম ছিল। কতটুকু? তখন সমাজে এতটা ভাঙন ধরেনি। স্বৈরাচারের স্রোত পাঁচিল ভেঙে মধ্যবিত্তের অঙ্গনে নামেনি। মধ্যবিত্ত মেয়েরা তখনও সুখী, তখনও জীবনে আস্থাবতী।

আজ পথ চলতে সেদিনের হাজার মণিকা দেবীকে দেখতে পাই। সামাজের রীতিনীতির আগল যারা দুপায়ে দলে এগিয়ে চলেছে। বিবেকহীন, বে-আব্রু মহিলার ঝাঁক। অর্থনৈতিক চাপে যাদের সমাজচেতনা পঙ্গু, নিস্তেজ।

দিন কুড়ি পরের ঘটনা।

চারবাগ থেকে ফিরছি। পায়ে হেঁটে। একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। আকাশে চাপ চাপ মেঘের ভার লক্ষ্য করি নি। হঠাৎ মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হল। প্রশস্ত রাজপথ। দুপাশে কোন আশ্রয় নেই। চারদিকে চেয়েও একটা টাঙ্গা নজরে পড়ল না। অগত্যা ভিজতে ভিজতেই চললাম। হোটেলে যখন ফিরলাম, তখন অবস্থা ঝোড়ো কাকেরও অধম।

ভোর রাত থেকেই মাথার যন্ত্রণা শুরু হল। চোখ খোলাই দুষ্কর। একটু একটু মনে আছে, অ্যাকাউন্টেন্ট রিজভির হাতে ব্যাঙ্কের চাবিটা তুলে দেওয়ার কথা। তারপর একরাশ ছায়ার মিছিল, অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। পরিচিত-অপরিচিত কথার সুর।

ডাক্তারের আসা-যাওয়াও টের পেলাম। কে যেন ওষুধ খাওয়াল। মাথায় হাত রাখল। উত্তাপও পরীক্ষা করল।

তখন জানতাম না, পরে শুনেছিলাম দিন পনেরো শয্যাগত ছিলাম ইনফ্লুয়েঞ্জায়, প্রথম একটু সুস্থ হয়ে চোখ চাইতেই যার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলল, তাকে দেখেই সভয়ে চোখ বুজলাম। ভাবলাম এ আমার অসুস্থ চিত্তের বিভ্রম, মায়া, দিবাস্বপ্ন। কিন্তু আবার চাইলাম, পরিপূর্ণভাবে।

না, ভুল নয়। এত আলোয় এ ভুল হতে পারে না।

আমার মানসিক অস্থিরতা তিনিও হয়তো লক্ষ্য করেছেন। ঝুঁকে পড়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, কি হল, অমন করছেন কেন?

খুব আস্তে কেবল বলতে পারলাম, আপনি?

মণিকা দেবী হেসে উঠলেন, সেদিন সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন, বোধহয় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর আমার মুখই দেখবেন না। আমি কিন্তু আপনার অসুখের খবর শুনে আর থাকতে পারলাম না। শুধু একটা কথা বলব ভাই, শুধু একদিন দেখে, অল্পদিনের আলাপে একটা মানুষের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। তার বর্তমানকে ঘৃণা করার আগে, সমবেদনা দিয়ে তার অতীতকে জানতে হয়। পিছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা না খেলে কোন নারী সদর রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে না। যাক, এসব বাজে কথা আপনার কাছে বলে লাভ নেই। নিন, কমলালেবুর রসটুকু খেয়ে নিন।

আবার আমার সমস্ত হিসাব গোলমাল হয়ে গেল। দুই আর দুয়ে চার, এই সহজ নির্ভুল যোগফলটাও যেন আর সহজ রইল না। জীবনটা অঙ্ক নয়, জ্যামিতির মাধ্যমে মেপে মেপে

একটা জীবনের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। সেই ভুলই আমি করেছিলাম।

সম্পূর্ণ সেরে উঠে মণিকা দেবীকে আর দেখতে পাই নি।

শুনেছিলাম, আমার অসুখের সময় বিক্রম আর রত্না আলমোড়ায় ছিল। চালাপতি রাউ সময় পেলেই আমার শয্যাপাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। এ ছাড়া ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা তো ছিলেনই। কিন্তু সবাইকে সরিয়ে মণিকা দেবী এগিয়ে এসেছিলেন। পরিচয় দিয়েছিলেন আমার দূর-সম্পর্কের বোন বলে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সেবা করেছেন, ওষুধের গ্লাস ধরেছেন ঠোঁটের কাছে, পথ্য যুগিয়েছেন। ডাক্তারের কাছেও শুনলাম, ক্লান্তিহীন শুশ্রূষার কথা।

যেদিন কাজে যোগ দিলাম, সেদিনই অফিসের পরে ওয়াই. ডবল্‌উ. সি. এ. হোস্টেলে গিয়ে দাঁড়ালাম। অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য।

আর একটি মহিলার মুখেই শুনলাম, মণিকা দেবী দিন পাঁচেক হোস্টেল ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না।

কোথায় গেছেন আমি জানতে পারলাম। দিন কয়েক পরে। তাঁর ভাইয়ের চিঠি থেকে।

মণিকা দেবী কলকাতায় ফিরে গেছেন। তাঁর পিসির কাছে।

আর কোনদিন আমাদের দেখা হয় নি। হয়তো হবেও না। কিন্তু কর্মহীন অবকাশে আজও মনে পড়ে তাঁর কথা। সঙ্গে সঙ্গে নিজের অর্বাচীনতার কথাও স্মরণ হয়। মানুষ চেনার অক্ষমতার কথা, নারী-হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্য, সব ভীড় করে আসে মনের পটে।

জানি না, এ লেখা মণিকা দেবীর চোখে পড়বে কিনা। যদি পড়ে, তবে আমার একান্ত মিনতি, তিনি যেন আমার সেদিনের মূঢ়তাকে ক্ষমা করেন। মার্জনা করেন অনভিজ্ঞ এক তরুণের প্রগল্‌ভতা।

পর পর তিন দিন তুমুল বর্ষণ। লক্ষ্ণৌয়ের পক্ষে বেশ অস্বাভাবিক। ফুটপাথের ফাঁকে সবুজ ঘাসের ইশারা। হজরতগঞ্জের দুপাশে, শানাজাফ রোডের ধারে গুলমোহর আর শিরীষের ডালে সবুজের সমারোহ। অর্ধমৃত তরুলতা নতুন প্রাণ পেয়ে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল।

বন্ধ জানলার কাঁচের শার্শীর ফাঁক দিয়ে অকালবর্ষণের শ্যামশ্রী দেখতে দেখতে বুকের মধ্যে ঘুমন্ত, প্রায়-ভুলে-যাওয়া সাহিত্যচেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। রোজকার হিসাব লেখবার খাতাটা টেনে নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করলাম।

দিন দুয়েকের মধ্যে গল্প একটা তৈরি হল। তারপর শুরু হল আসল সমস্যা। মানসকন্যাকে পাত্রস্থ করার কি উপায় হবে। লক্ষ্ণৌতে মাসিকপত্রিকার দোকানে একটি বাংলা পত্রিকা প্রায়ই দেখা যেত। পত্রিকাটির নাম সংহতি। একবার ভাবলাম, সেই ঠিকানায় গল্পটা পাঠিয়ে দিই, কিন্তু সাহস হল না। একেবারে অচেনা কাগজ। কর্মকর্তারা কি ধরনের লোক কিছুই জানি না। কেমন তাঁদের রীতিনীতি, রুচির ধারা তা তো জানা নেই। পুরোদস্তুর লেখক হবার আগে এটুকু দিব্যজ্ঞান হয়েছিল যে, এক এক কাগজ এক এক ধরনের লেখা পছন্দ করে, শুধু লেখাই নয়, এক এক জাতের লেখক।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎই মনে পড়ল, প্রবর্তকের কথা। বহুদিন আগে সুশীল জানা সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। শান্ত, নিরীহ স্বভাবের ভদ্রলোক। নতুন লেখকদের প্রতি অন্তরের অন্তরে কোথায় যেন একটু করুণা সঞ্চিত ছিল। ইতিপূর্বে আমার গোটা দুই কবিতাও প্রকাশিত করেছিলেন।

সুতরাং মাভৈঃ। মহা উৎসাহে গল্পটি কপি করলাম। গল্পের সঙ্গে সম্পাদক-বিগলিত করা একটি পত্রও দিলাম। এতদূর থেকে তাঁদের কাগজটির কথা কি ভাবে মনে পড়ে সে সম্বন্ধেও লিখলাম।

দিন পনেরো কাটল, কোন উত্তর নেই। হোটেলে ফিরেই চিঠির খোঁজ করি। শুধু আমার কামরায় নয়, প্রতিবেশী কামরাতেও।

একদিন এই রকম চিঠির সন্ধান করতে গিয়েই বিপদে পড়েছিলাম। আমার এ পাশের ঘরে একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক ছিলেন, বেশিদিন নয়, দিন চারেক। বোধহয় কোন ওষুধের ক্যানভাসার। ঘরটা ক'দিন বন্ধ ছিল। সেদিন হোটেলে ফিরে দেখলাম, দরজা খোলা। ঘর অন্ধকার। ভাবলাম পিওনের কথা কিচ্ছু বলা যায় না, আমার চিঠি ভুল করে হয়তো এ ঘরেই ফেলে দিয়েছে।

পা টিপে টিপে দরজা পার হয়ে গিয়েই চমকে উঠলাম। একরাশ মৌমাছির গুঞ্জনের মতন একটা গুন গুন শব্দ ভেসে আসছে ঘরের কোণ থেকে। চৌকাঠের এপারে সরে এসে শুনলাম, গুনগুনানির তান আছে, সুর আছে, ছন্দ আছে।

সাহস করে বাতিটা জ্বালিয়েই থমকে দাঁড়ালাম।

ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান। পরনে সিল্কের গেঞ্জি আর লুঙ্গি। রক্তাভ গৌরবর্ণ, সুগঠিত দেহ সুপুরুষ এক প্রৌঢ়। চোখ বন্ধ করে সুর ভাঁজছিলেন অন্ধকারে, চোখে আলো লাগতেই তেতে উঠলেন, কোন্ হ্যায় ?

কোন কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়ালাম।

আমার অবস্থা দেখে বোধহয় প্রৌঢ়ের মায়া হল। সুর নরম করে বললেন, ক্যা বেটা ?

চিঠি খুঁজতে এসেছিলাম সে কথা সবিনয়ে বললাম। যদি পিওন কিংবা হোটেলের ছোকরারা ভুল করে এ ঘরে ফেলে দিয়ে থাকে।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক সুন্দর দুটি চোখ কুঁচকে মুচকি হাসলেন। এক হাতে ইজিচেয়ারের হাতলে ঠেকা দিতে দিতে বললেন, নয়া সাদী হুয়া, ক্যা ?

সর্বনাশ, আমি আর দাঁড়ালাম না। পায়ে পায়ে নীচে নেমে এলাম। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াবে ঠিক আছে।

নীচে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বসতেই তিনি বললেন, কি এত আলাপ করছিলেন ?

বললাম, কার সঙ্গে ?

ওস্তাদজীর সঙ্গে ? উনি বড় গম্ভীর লোক, কারো সঙ্গে বেশি কথা বলেন না, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখলাম হেসে হেসে কি বলছেন।

কে ওস্তাদজী ?

আমার মূঢ়তায় বিস্মিত হয়ে ম্যানেজার বললেন, ওস্তাদ ফ্যয়াজ খাঁ ! এখানকার রেডিয়োতে গাইতে এলেই উনি আমার হোটেলে ওঠেন।

সর্বনাশ, এমন একটা সাধকের আলাপের প্রতিবন্ধক হয়েছিলাম। প্রথমে ভদ্রলোক যে চটে উঠেছিলেন তা মোটেই অন্যায় হয় নি।

কিন্তু আসল কথা চেপে গেলাম। আর সে কথা সকলকে বলবারও নয়। খুব গম্ভীর হয়ে বললাম, ওস্তাদজীর সঙ্গে মিয়াকী মল্লারের ঘরানা নিয়ে একটু আলোচনা করছিলাম।

ম্যানেজার বিরাট মুখব্যাদান করে রইলেন। অনেকক্ষণ সে হাঁ আর বন্ধ হল না।

মনে মনে চিঠি না আসার একটা কারণ ঠিক করে নিলাম। গল্পটা অমনোনীত হয়েছে এমন কথা ভাবতেও ভাল লাগল না। লড়াই চলেছে। বহু অফিস কলকাতা থেকে সরে এসেছে নিরাপদ এলাকায়। প্রবর্তকও হয়তো চলে গেছে কোথাও। আমার গল্পটা পুরোনো ঠিকানায় ঘুমাচ্ছে।

এমন একটা যুক্তির মধ্যেও কিন্তু বিরাট একটা ফাঁক ছিল। পুরোনো ঠিকানা থেকে নতুন ঠিকানায় চিঠিপত্র পাঠানোর নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা আছে, বিশেষ করে যখন মাসিকপত্রের অফিস। রোজ বহু চিঠি যেখানে আসছে।

মন যখন এমনি আশা-নিরাশায় দোলায় দুলছে, তখনই চিঠি এসে

হাজির। চিঠি মানে পোস্টকার্ড। খোদ সম্পাদকের হস্তলিপি। গল্পটি মনোনীত হয়েছে। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। কলকাতায় গেলে যেন সম্পাদকের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করি।

সেই মুহূর্তে নিজেকে জনসাধারণ থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে হল। এমন একটা প্রতিভা ক্যাশ-বুক আর জেনারেল লেজারের চাপে বিনষ্ট হতে চলেছিল, সে কথা ভেবে ধিক্কার এল। আমি স্রষ্টা, আমার রচনার মৌ-চক্রে গৌড়জন আকৃষ্ট হবে, প্রতীক্ষা করবে আমার নতুন সৃষ্টির জন্য, এত বড় সম্মান থেকে কি ভাবে নিজেকে এতদিন বঞ্চিত রেখেছিলাম, স্মরণ করেও শিউরে উঠলাম।

সেই দিনই মোটা দেখে একটা খাতা কিনলাম। নতুন করে কালি ভরলাম ঝর্ণা কলমে। কালি, কলম, কাগজ তৈরি, কেবল মনটা সংহত হলেই হল।

প্রবর্তকে যে গল্পটা পাঠিয়েছিলাম, সেটির নাম 'পরীক্ষার পরিণাম'। ঈষৎ লঘু জাতীয় রচনা। পরবর্তীকালে এ ধরনের অনেকগুলি গল্প লিখেছি, অনেকগুলি পত্রিকায়। আধুনিক লেখকদের মধ্যে যাঁদের ধারণা লঘু রচনায় লেখকের ইজ্জতের পারা নেমে আসে, আমি সে দলের নই। বরং আমার নিজের মনে হয়েছে এ জাতীয় রচনা লেখা বেশ কষ্টসাধ্য। পরিমিতি-বোধ এ ধরনের গল্পের প্রাণ। কষ্টকল্পিত হাসি অথবা কণ্ডুয়ণ-প্রসূত হাসি দুই-ই বর্জনীয়। যে হাসি শুধু হাসায়, সেই সঙ্গে ভাবায় না, তার মূল্য সাহিত্যের কষ্টিপাথরে সামান্যই।

মাস দুয়েকের মধ্যে প্রবর্তকে গল্পটি প্রকাশিত হল, তার মধ্যে আমার নতুন কেনা খাতায় কালির একটি আঁচড়ও পড়ে নি।

হঠাৎই ঠিক করলাম দিন পনেরোর ছুটি নিয়ে কলকাতা ঘুরে আসব। অসুস্থতার পরে শরীরও ভাল মত সারে নি, তাছাড়া একটানা পরিশ্রম থেকে একটু বিশ্রামেরও প্রয়োজন।

কলকাতায় এসে আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে দেখা করতেই দিন

সাতেক কেটে গেল, তারপর ভাবলাম একদিন প্রবর্তক-অফিসে দেখা করে আসি।

নিষ্প্রদীপ শহর। পথের দুপাশে ব্যাফল-ওয়ালের সার। সবাই একটু শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত। কোন রকমে দিনের কাজ সেরে বাড়িতে ফেরে।

প্রবর্তক অফিসের সামনেই দেখলাম বিরাট এক প্রাচীর উঠেছে, ট্রেঞ্চকে আড়াল করে। সোজা তিনতলায় উঠে গেলাম। সম্পাদকের কামরাটা জানাই ছিল। দরজার কাছেই বাধা পেলাম। একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ চেয়ারে বসে আছেন। এক হাতে পাকা লাঠি, অন্য হাতে নস্যের কৌটা।

ঢুকব কিনা ভাবছি, ইতস্ততঃ করছি চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে, এমন সময় সম্পাদকের নজরে পড়ে গেলাম। সম্পাদক রাধারমণ চৌধুরী। দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাত প্রসারিত করে বললেন, আরে, আসুন আসুন, কবে ফিরলেন লক্ষ্নৌ থেকে?

বৃদ্ধের পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। বসলাম পাশের চেয়ারে। আমার উত্তর দেবার আগেই রাধারমণবাবু বৃদ্ধের দিকে ফিরে বললেন, ইনি একজন নতুন লেখক। আমাদের কাগজে এঁর লেখা বেরিয়েছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার আপাদমস্তক বার কয়েক দেখলেন জরিপ করার ভঙ্গিতে, বিড় বিড় করে বললেন, নতুন লেখক। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাশয়ের নাম?

নাম বললাম।

দু হাত যোড় করে কপালে ঠেকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ব্রাহ্মণ। নমস্কার। আমি প্রতি-নমস্কার করতেই বললেন, বাংলা ভাষা তো লেখেন, বলুন তো নিশ্বাস আর প্রশ্বাসের মধ্যে প্রভেদ কি? কোন্‌টা আমরা টানি, কোন্‌টা ছাড়ি?

প্রশ্ন শুনে আমার নাড়ি ছাড়ার দাখিল। বাংলাভাষাটা নিতান্তই

বাড়িতে শেখা। কলেজে পড়বার অবকাশ পাই নি। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে মাথাও ঘামাইনি কোনদিন। কিন্তু নিরুপায়, ভদ্রলোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন উত্তরের আশায়। অনুভবে বুঝলাম রাধারমণবাবুও সাগ্রহে আমার উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁর কাগজের উঠতি এক লেখকের মানমর্যাদা জড়িত রয়েছে আমার উত্তরের সঙ্গে।

আমি প্রায় মরীয়া। মুখে একটা সবজান্তার ভাব ফুটিয়ে বললাম, যেটা আমরা ত্যাগ করি সেটা নিশ্বাস, আর যেটা গ্রহণ করি সেটা প্রশ্বাস।

বৃদ্ধ সানন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, সাধু, সাধু, আপনার হবে, আমি বলছি নিশ্চয় হবে।

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়। চোখ বুঝে তীর নিক্ষেপ করেছিলাম, সেটা একেবারে ষাঁড়ের অক্ষিতারকায় বিঁধেছে।

ভদ্রলোক উৎসাহের আতিশয্যে আধমুঠো নস্য যথাস্থানে দিয়ে বললেন, এই যে সায়েবরা বলে আমরা নাসিকা দিয়ে কারবন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ি, আর নিই অক্সিজেন, এটা তো আমাদের শাস্ত্রের খুব পুরনো কথা। নিশ্বাস অর্থাৎ নিকৃষ্ট শ্বাস, তাই আমরা ত্যাগ করি, আর প্রশ্বাস অর্থাৎ প্রকৃষ্ট শ্বাস আমরা গ্রহণ করি।

কি টানি, কি ছাড়ি কিছুই জানি না, কিন্তু আমার তখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক উঠে যেতে আমি সভয়ে রাধারমণবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে?

রাধারমণবাবু গদগদ কণ্ঠে বললেন, পূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর।

সেদিন প্রবর্তক অফিস থেকে খুশিমনেই ফিরে এলাম। ওই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারের জন্য নয়, রাধারমণবাবু আমার কাছে আরো লেখা চেয়েছেন। বলেছেন, লেখা হলেই আমাদের পাঠিয়ে দেবেন। গল্প কবিতা যা হোক।

ছুটি শেষ হল। একদিন লক্ষ্ণৌয়ের গাড়িতে উঠে বসলাম। শোকাতুর মন। কলকাতার আগের সেই মোহিনীরূপ নেই, হৃতসর্বস্বা, শঙ্কাতুরা, তবুও অলক্ষে কোথায় একটা আকর্ষণ আছে। অক্টোপাশ বাহু বাড়িয়ে মনকে টানে। বোধহয় আমার জন্মভূমি বলেই।

আবার কাজের ঘূর্ণিপাক। ক্যাস-বই, জেনারেল লেজার আর স্টেটমেন্টের প্রাচীর, কারেন্ট-সেভিংস, ক্যাশ-ক্রেডিট, ওভার-ড্রাফটের গোলোকধাঁধা। গ্লাস-কাউন্টারের ওপারের পরিমিত ব্যস্ত জীবন।

ওরই মধ্যে একটু নতুনত্বের গন্ধ নিয়ে এলেন এমরন সাহেব।

আসল নাম এস. রহমান। স্টেশন রোডের ওপর বিরাট ফার্নিচারের দোকান। থাকেন লালবাগ রোডে। আয়েসা মঞ্জিলে। নবজাত পুত্রকে উপলক্ষ করে খানাপিনার আয়োজন। তারই নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে এলেন।

আমি রাজী। প্রায় নিস্তরঙ্গ জীবন। মাঝে মাঝে শুধু কফি হাউসে যাই। এক পেয়ালা ঠাণ্ডা কফি নিয়ে সামনের চঞ্চল জীবন-প্রবাহ লক্ষ্য করি। কত রকমের মানুষ, কত সজ্জা, জীবনকে দেখার বহুবিচিত্র ভঙ্গী। একেবারে কোণের দিকে বসে থাকেন দুজন। ধূর্জটিবাবু আর শ্রীমতী ঠাকুর। মার্জিত চেহারা, অভিজাত রুচি। খুব নিম্নকণ্ঠে কথার আদান-প্রদান হয়। একবার একেবারে পাশের টেবিলে বসার সৌভাগ্য হয়েছিল, সে সময় টুকরো টুকরো কথা কানে এসেছিল। মার্গ-সংগীতের স্বরূপ বিশ্লেষণ।

কখনও কখনও একলা সোজা শড়ক ধরে হাঁটতে আরম্ভ করি। ঘামে শার্ট ভিজে উঠলে টাঙ্গা ডেকে বাড়ি ফিরি।

কাজেই দৈনন্দিন ছকে-বাঁধা জীবনে নিমন্ত্রণ-লাভ কম লোভনীয় নয়। সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম।

নিতান্ত শখ করে একটা শেরওয়ানী তৈরি করিয়েছিলাম, এতদিনে

সেটা পরবার সুযোগ পেলাম। একটা ঝকমকে নাগরাও ছিল। প্যান্টের বদলে ধুতি পরলাম।

বেরোবার মুখে চালাপতি সব্যঙ্গে বললেন, কি মুশায়রায় নাকি?

ঘাড় নেড়ে বললাম, না, দাওয়াত আছে এমরন সাহেবের বাড়িতে।

চালাপতি উত্তরে একটা উর্দু কবিতা বললেন, যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হল না।

বেশ প্রশস্ত হলঘর। চারধারে সাটিনের তাকিয়া। দরজায়, জানলায় রঙীন পর্দা। ইতিমধ্যে অভ্যাগত দু-একজন এসে গিয়েছেন। অন্য ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। আরো কয়েকজন পরিচিত ব্যবসায়ী।

একটি স্থূলকায় ভদ্রলোক তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছিলেন, তাঁর মুখটা চেনা-চেনা লাগছিল, কিন্তু চিনে উঠতে পারলাম না।

এমরন সাহেবই আলাপ করিয়ে দিলেন, ইনি মিস্টার নবাব। এক সময়ে নিউ থিয়েটার্সে অভিনয় করতেন।

একটু পরেই খাওয়ার ডাক পড়ল। এলাহি ব্যাপার। বহুদেশ ঘুরেছি, বহু হোটেলেও খেতে হয়েছে, কিন্তু সেদিনের মতন অমন বিরিয়ানির স্বাদ কোথাও পাই নি।

খাওয়া শেষ করে বিদায় নিয়ে আসতে গিয়েই বাধা পেলাম।

এমরন সাহেব বললেন, সেকি, গান শুনবেন না। গানের আয়োজন আছে বলেই তো তাড়াতাড়ি খাওয়ার পালা চুকিয়ে দিলাম। বসুন, বসুন।

বসে পড়লাম। তাকিয়া হেলান দিয়ে।

একটু পরেই একটি মহিলা ঘরে ঢুকলেন। বোধহয় পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন। আমার ধারণা ছিল, জায়গাটা যখন লক্ষ্ণৌ, তখন গানের আসর বলতে বাঈজীর গানই হবে, কিন্তু পেশোয়াজপরা, ঘুঙুর আঁটা তরুণীর বদলে, শাড়ি-ব্লাউজ পরা একটি মহিলাকে দেখে রীতিমত অবাক হলাম। অবগুণ্ঠনে মুখের অনেকখানি

ঢাকা। সঙ্গে তবলচী আর সারেঙ্গী নিয়ে একজন। প্রথমে উর্দু গজল, তারপর গোটা দুয়েক হিন্দী গান হল। তাতেই রাত বারোটা।

ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই উঠে দাঁড়ালাম। হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ডাকাডাকি করে দরজা খোলাতে হবে।

কিন্তু এমরন সাহেবের ঘোষণায় আবার বসে পড়লাম।

এবার রেঙ্গুনীবাঈ বাংলা একটা গান শোনাবেন। বাঙালী মেহমানদের জন্য।

আকর্ষণ দ্বিবিধ। রেঙ্গুনীবাঈ মানে কি? রেঙ্গুন থেকে এসেছেন? অবশ্য এসে থাকলেও সেখানকার বাঈজীদের আমার চেনার কথা নয়। যে শহরে ছাত্রজীবনের বেশির ভাগ আর কর্মজীবনের মাত্র সূচনাটুকু কেটেছে, সেখানকার নিষিদ্ধ নারীদের পরিচয় জানা সম্ভব নয়। কাজেই ভাল করে মহিলাকে লক্ষ্য করতে হবে। অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে যতটা সম্ভব। তাছাড়া, বাংলা গান শোনার মোহও কম নয়। বহুদিন বাংলা গান কানে আসে নি।

ততক্ষণে গান শুরু হয়ে গেছে।

'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে।'

বিশুদ্ধ উচ্চারণ, অপূর্ব কণ্ঠ, মাদকতাপূর্ণ সুর-লহরী। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, খুব পরিচিত কণ্ঠস্বর। কোথায় যেন এমন কণ্ঠ শুনেছি, শুধু কণ্ঠই নয়, এই গান।

বার দুয়েক পুরো গানটা গেয়ে মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও উঠলাম। আসর ছেড়ে বাইরের চাতালে পা দিয়ে দেখলাম মহিলা একটি থামে হেলান দিয়ে নাগরা পরছেন। মাথার ঘোমটা খসে কাঁধের ওপর পড়েছে। আকাশে পূর্ণচাঁদ। অগাধ জ্যোৎস্নায় সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

এমরন সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরতেই মহিলা একেবারে আমার সামনাসামনি পড়ে গেলেন।

চকিতের দ্বিধা কাটিয়ে হাতযোড় করে নমস্কার করে বললাম, নমস্কার মিসেস সেন।

খুব মৃদুকণ্ঠে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, কে আপনি? আপনাকে কি কোথাও দেখেছি?

অন্যান্য অভ্যাগতরা এমরন সাহেবকে ঘিরে কথাবার্তা বলছে। এদিকটা প্রায় ফাঁকা। এমরন সাহেবের ভৃত্যেরা সারেঙ্গী আর তবলাজোড়া নিয়ে টাঙ্গায় তুলে দিচ্ছে। তবলচি আর সারেঙ্গীবাদক সেখানেই দাঁড়িয়ে।

আমাদের কথা কারো কানে যাবার নয়, তাই সাহস করে বললাম, আমাকে রেঙ্গুনে দেখেছেন। রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটিতে।

আপনার নাম?

নামটা বললাম।

একটু বুঝি ভাবলেন মহিলা, তারপর বললেন, আপনি কি আবৃত্তি করতেন? ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ফাংশনে—

বাধা দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, বছর দুয়েক আপনিও গান গেয়েছেন সেখানে, তারপর সুব্রতদাকে বিয়ে করে কলেজ ছেড়ে দেন, তাই না?

মহিলা খুব আস্তে ঘাড় নাড়লেন।

সুব্রতদা কোথায়? ডাক্তার সুব্রত সেন?

ইতিমধ্যে মহিলা চলতে শুরু করেছেন। কাজেই পায়ে পায়ে আমিও এগিয়ে চলেছি।

তিনি নেই। মারা গেছেন। আমরা হাঁটাপথে ফিরছিলাম, টাঙ্গুর কাছে বোমায় তিনি—

মহিলা আঁচল দিয়ে দুটো চোখ মুছে নিলেন।

সুব্রতদা নেই। মনে পড়ল প্রত্যেকদিন কলেজের ছুটির পর কনভোকেশন হলের পাশে যে বেবী অস্টিনটা মরিয়মগাছের ছায়ায় অপেক্ষা করত, সেটা সুব্রত সেনের। ডলি গুপ্ত লোকলজ্জা জলাঞ্জলি

দিয়ে, সহপাঠীদের কটাক্ষ উপেক্ষা করে ঠিক গিয়ে বসত সুব্রতর পাশে। ছাত্রছাত্রী থেকে অধ্যাপকরা পর্যন্ত জানত ডলি গুপ্ত একদিন যে ডলি সেন হবে, এ অভিসার তারই গৌরচন্দ্রিকা।

হলও তাই। তবে সহজভাবে নয়। ডলির বাপের কোথায় বুঝি কথা দেওয়া ছিল, তাই তিনি বেঁকে বসলেন। ডলি গুপ্তর অঝোরধারার অশ্রুতেও বিগলিত হলেন না। ফলে এক রাত্রে ডলি নিখোঁজ হল। সেই সঙ্গে সুব্রত সেনও।

কলেজের কমনরুম এমন এক মুখরোচক আলোচনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল। আমাদের দিনে এমন ঘটনা বিরল ছিল। কাজেই তরুণতর আমরা ডলির দুঃসাহসে বিস্মিত হলাম।

ডলি গুপ্তর বাপ জাঁদরেল টিকটিকি। গোয়েন্দা-বিভাগের কেষ্টবিষ্টু। হুঙ্কার ছাড়লেন, সারা দেশ আঁচড়ে ফেলব। সুব্রত সেনের শির চাই।

শুধু শির নয়, স্বশরীরেই সুব্রত সেন দেখা দিল। বছর দুয়েক পরে। আমরা সেবার আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

আশ্চর্য, ডলি সেনের বাপ ব্যাঘ্রের হুঙ্কার ছেড়েছিলেন বটে, কিন্তু কার্যকালে সিক্ত মার্জারের রূপ নিলেন। শুনলাম, খোঁজ করে সিঙ্গাপুর থেকে মেয়ে-জামাইকে তিনিই নিয়ে এসেছিলেন। শুধু নিয়ে আসাই নয়, তদ্বির-তদারক করে জামাইকে পুলিস হাসপাতালের ডাক্তারও করে দিয়েছিলেন। বুঝলাম, ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে গিয়েছে।

তারপর পথেঘাটে বহুবার দেখেছি ডলি আর সুব্রতকে। সত্যি বলতে কি, একজনকে ছাড়া আর একজনকে কোনদিন দেখা যায় নি। প্যাগোডার চাতালে, লেকের ধারে, স্কট মার্কেটে, ফুটপাথে সর্বত্র দুজনে একসঙ্গে। কাছাকাছিই নয়, একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি। আমরা নাম দিয়েছিলাম জোড়া ইলিশ।

সেই সুব্রতকে হারিয়ে ডলির মনের অবস্থা সহজেই অনুমান

করতে পারি। কিন্তু যে গান একদিন সাধনা ছিল, তাকেই উপজীবিকা করে বাঁচতে হবে, এমন অবস্থা কেন হল?

একদিন আসুন না আমার ওখানে? চকে গিয়ে রেঙ্গুনীবাঈ বললেই হবে। ডলি সেন টাঙ্গায় ওঠবার মুখে আমাকে বললেন।

চকে? চকে আছেন আপনি? সে তো—মাঝপথেই থেমে গেলাম। সব সময়ে ভাবপ্রকাশের পক্ষে ভাষা যথেষ্ট নয়।

আমি তো তাদেরই একজন। পথে দুবার লুঠ হয়ে গেছি। একবার আরাকানী দস্যুদের হাতে, আর একবার চট্টগ্রামী দুর্বৃত্তদের কবলে পড়েছিলাম। অবশ্য, চট্টগ্রামীদের অঙ্গে রিলিফ অফিসরের পোশাক ছিল, কিন্তু ভেতরের চামড়াটা ছিল পশুর।

আশ্চর্য, কথাগুলো বলে ডলি সেন হাসলেন। চাঁদের আলোয় ঝকঝকিয়ে উঠল সুগঠিত দাঁতের সার। টাঙ্গায় উঠতে উঠতে বললেন, চলি, যদি সম্ভব হয় আসবেন, এর চেয়ে বেশি বলার জোর আমার নেই।

টাঙ্গা অদৃশ্য হবার পরও চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম পথের ওপরে। এমরন সাহেব কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়াল করি নি। চমক ভাঙল তাঁর কথায়।

রেঙ্গুনীবাঈয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল নাকি? ভারি চমৎকার গানের গলা কিন্তু মহিলার।

ধীরে ঘাড় নাড়লাম। বললাম, হ্যাঁ, উনি রেঙ্গুনীবাঈ হবার আগে আমি ওঁকে চিনতাম। ওঁর গানের গলা তখনও ছিল চমৎকার।

এমরন সাহেব একটু বিস্মিতই হলেন। প্রায় দু বছর লক্ষ্ণৌতে আছি। গোড়া থেকেই এমরন সাহেবকে চিনি। প্রায় রোজই ব্যাঙ্কে দেখা হয়। আমাদের নামকরা মক্কেল। কারবারের কথা ছাড়া অন্য অনেক কথাও হয়েছে, কিন্তু গানে আমার অসীম উৎসাহ এমন কোন পরিচয় তিনি পান নি। তাছাড়া, বাঈজী-প্রীতি আছে,

আমার সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও এ কথা তিনি ভাবতে পারবেন না। তাই সে রাত্রে বিস্ময়ের মাত্রাটা একটু বেশিই হয়েছিল।

কি ব্যাপার বলুন তো? এমরন সাহেব পথরোধ করে দাঁড়ালেন। দু চোখে কৌতূহলের জোনাকি।

ব্যাপারটা আর একদিন বলব আপনাকে। তবে এটুকু বিশ্বাস করতে পারেন, রহস্যজনক কোন সম্পর্ক আমাদের মধ্যে ছিল না। আমরা এক কলেজে পড়তাম, আর আমাদেরই জানা একটি লোকের ইনি ধর্মপত্নী। ভদ্রলোক বোমায় মারা গেছেন।

তাই বুঝি? এমরন সাহেব ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরলেন, তবে শুনুন, ওঁর বাড়ির দেয়ালে কোট-প্যাণ্ট পরা একটি বাঙালী ভদ্রলোকের ফটো দেখেছিলাম। শুনলাম, উনি নাকি রোজ সেই ফটোর সামনে বসে পূজা করেন। ভেবেছিলাম ঢং, কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে অন্য ব্যাপার।

সে রাত্রে আর কথা বাড়াইনি। এমরন সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলাম। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে ভেবেছি মিসেস সেনের কথা। মিসেস ডলি সেন।

রেঙ্গুনের কলেজ-করিডরে দেখা স্থির, শান্ত, সুন্দরা তরুণীর সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ের রেঙ্গুনীবাঈয়ের মধ্যে মিল খোঁজার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাই নি। যুদ্ধ শুধু তার প্রিয়তমকেই ছিনিয়ে নেয় নি, তার নিজের যথাসর্বস্ব, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও হরণ করেছে।

কিন্তু সুষ্ঠুভাবে বাঁচার আর কি কোন উপায় খুঁজে পেলেন না ডলি সেন? সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিমিত জীবন?

মণিকা দেবীর ঘটনার পরে কারো সম্পর্কে হঠাৎ কিছু বিচার বা সিদ্ধান্ত করা সভয়ে পরিহার করেছি। সত্যিই কোন মানুষকে ওভাবে বিচার করা চলে না। করলে ঠকতে হয়।

মনে মনে ঠিক করলাম একবার সাহস করে চলে যাব। খোঁজ

করে রেঙ্গুনীবাঈয়ের ঠিকানা জোগাড় করব। তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনব জীবন-বৈচিত্র্যের কাহিনী।

কিন্তু চকে যাবার আগেই হুকুম এসে গেল।

বদলির হুকুম। এলাহাবাদে।

এলাহাবাদ বদলি হবার আগে এক কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ সহ-কর্মীদের ধারণা হল আমি মানুষ হিসাবে খুব মহৎ এবং লোকপ্রিয়; আমাকে লক্ষ্ণৌ থেকে সরালে ব্যাঙ্কের স্থানীয় ব্রাঞ্চের খুব অসুবিধা হবে। কাজেই তাঁরা এক আবেদন হেড অফিসে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন। সেই আবেদনের তলায় প্রায় আড়াইশো ব্যাঙ্কের পার্টির সইও জোগাড় হল। ব্যাপারটা ঘটল আমার অগোচরে।

হেড অফিসের কর্তৃপক্ষ আরো চতুর। আবেদনের উত্তরে তাঁরা লিখলেন যে, লক্ষ্ণৌয়ের বর্তমান ম্যানেজার যে খুব কর্মী এবং দক্ষ, তা তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন, আর জানেন বলেই তাঁকে তাঁরা এলাহাবাদে বদলি করছেন। ব্যাঙ্কের শাখা সারা ভারতবর্ষে ছড়ান। হেড অফিসের পরই এলাহাবাদ শাখা সবচেয়ে সমৃদ্ধ। চক আর কাটরা দু জায়গায় দুটি শাখা। এ দুটি শাখার কাজ তদারক করতে হবে। ব্রাঞ্চের লেনদেনের কাজ প্রচুর। তাছাড়াও, যদি বোমার আঘাতে কলকাতার সঙ্গে অন্যান্য শাখার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে এলাহাবাদ শাখাই কেন্দ্রীয় অফিসের কাজ করবে। কাজেই এলাহাবাদের ম্যানেজারের পদমর্যাদার মূল্য সমধিক। অন্য শাখা-ম্যানেজারদের ঈর্ষার বস্তু।

সুতরাং এ আবেদন গ্রাহ্য করলে আমার উন্নতি রোধ করা হয়। আবেদনকারীরা হতবাক, আমিও তথৈবচ।

ফলে আমি লক্ষ্ণৌ নগরীকে বিদায় জানিয়ে এক সন্ধ্যায় এলাহাবাদগামী ট্রেনে উঠে বসলাম।

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মিলনক্ষেত্র এই প্রয়াগ। অধুনা সরস্বতী

লুপ্ত। গঙ্গা যমুনা বিশেষ ভাবেই প্রকট। এমন কি গঙ্গার গৈরিক বারি আর যমুনার নীলচে কালো জলের পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বহু পুণ্যার্থীর কামনার কেন্দ্র এই সঙ্গম। যোগে-যাগে এলাহি কাণ্ড।

এবার আর হোটেল নয়, ব্যাঙ্কের ওপরেই কোয়ার্টার। নাতিবৃহৎ ত্বটি ঘর। একটি রান্নাঘরও আছে। সামনে অবারিত ছাদ। তারপর ইতিহাস-খ্যাত পার্ক। স্বদেশী যুগের বহু মারাত্মক বক্তৃতার পীঠস্থান।

সবচেয়ে ভাল লাগল ছোট একটি টবে একটি দ্রাক্ষালতা। লতাটি থাম জড়িয়ে জড়িয়ে মাথার ওপর উঠেছে। আমার পূর্বতন ম্যানেজারের শৌখিনতার প্রতীক।

রান্নাবান্নার একটা লোক খুঁজছিলাম, অ্যাকাউন্টেণ্ট এগিয়ে এলেন।

সার, আমার থাকার বড় মুশকিল হচ্ছে। যদি আপনার সঙ্গে থাকতে দেন, রান্নার কোন অসুবিধা হবে না। ও কাজটা আমার ভালই আসে।

তথাস্তু। রাজী হয়ে গেলাম। শুধু রান্নার সুরাহা হবে বলে নয়, একেবারে একলা থাকতে হবে না। কথা বলার একটা সঙ্গী পাব।

•এরপর এসে দেখা করলেন বিল ডিপার্টমেণ্টের কৃষ্ণপদ হালদার। সনাতন কেষ্টবাবু। দীর্ঘ মসীবর্ণ চেহারা। শীতে, গ্রীষ্মে, হেমন্তে, বসন্তে গলাবন্ধ কোট। চুলের সঙ্গে চিরুনির ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।

হাতযোড় করেই ঢুকলেন, নমস্কার স্যার, পাখার ব্যবস্থা কিছু হয়েছে ?

তখনও গরম খুব পড়েনি। কিন্তু উত্তর প্রদেশের দাবদাহের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলাম, বললাম, ব্যাঙ্ক থেকেই তো পাখার বন্দোবস্ত করার কথা। আগে এ ঘরে পাখা ছিল না ?

ছিল স্যার, কৃষ্ণপদ একদিকে ঘাড় কাত করলেন, আগের ম্যানেজার ফ্যামিলি নিয়ে ছিলেন। তিনি নিজে তুটো পাখা কিনেছিলেন, যাবার সময় খুলে নিয়ে গেছেন।

বললাম, ঠিক আছে, বিকেলে বেরিয়ে কোন একটা দোকান থেকে ভাড়া করে নেব।

কৃষ্ণপদ আমার অজ্ঞতায় মহাবিস্মিত। সামলে নিয়ে মুখ টিপে হেসে বললেন, পাখা কোথায় পাবেন স্যার? সব ভাড়া হয়ে গেছে! গরম পড়বার আগেই সবাই পাখার ব্যবস্থা করে ফেলে।

তাহলে উপায়? সত্যিই বিস্মিত হয়ে উঠলাম। পাখা ছাড়া থাকার কথা প্রায় অচিন্ত্যনীয়।

কৃষ্ণপদ তুর্গতিতারণ হাসি হাসলেন, কেষ্ট থাকতে সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না স্যার! আপনি শুধু বলুন কি আপনার পছন্দ? সিলিং ফ্যান না টেবিল ফ্যান?

আমি কিছু বলবার আগেই অ্যাকাউণ্টেণ্টবাবু বললেন, সিলিং ফ্যান দরকার নেই। টেবিল ফ্যান চাই। রাত্রে ছাদে শোবার সময় সিলিং ফ্যান তো কোন কাজে লাগবে না, টেবিল ফ্যান যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাওয়া যাবে।

তাই ঠিক হল। তুটো টেবিল ফ্যান এল। কৃষ্ণবাবুই নিয়ে এলেন।

কিছুদিন পর ব্যাপারটা জানতে পারলাম। কৃষ্ণপদবাবু ব্যাঙ্কের চাকরি ছাড়া আর একটা চাকরি করেন। কোন এক ইলেকট্রিক কোম্পানির দোকানের কমিশন এজেণ্ট। সারা এলাহাবাদ শহরে পাখা ভাড়া দিয়ে বেড়ান। এ শহরে কৃষ্ণপদবাবুর তিন পুরুষের বাস। বাঙালী অবাঙালী সবই জানাশোনা। যে কোন অন্তঃপুরে তাঁর অবাধ গতি? মাঝে মাঝে কাজের উপলক্ষ করে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েন। উদ্দেশ্য পাখার যোগান দেওয়া। নিঃসন্দেহে মহৎ

কাজ। দারুণ অগ্নিবাণে আকাশ যখন তৃষায় কম্পমান, তখন শ্রান্তিহরণের দূত কৃষ্ণপদ হালদার।

কোথায় নতুন বাড়ি তৈরি প্রায় শেষ হয়ে গেল, কৃষ্ণপদ হালদারের ঠিক টনক নড়ে। পাখার ক্যাটালগ নিয়ে কৃষ্ণপদ হাজির। নতুন ভাড়াটে এসেছে পাখাহীন আবাসে, বিনীত কৃষ্ণপদ প্রায় কুলির পাশাপাশি গিয়ে দাঁড়ান। পকেট-ভর্তি পাখার ছোট ছোট কলকব্জা। হালকা মেরামতির কাজও তাঁর জানা।

ভদ্রলোক যে কি পরিমাণ পাখা-অন্ত প্রাণ তার প্রমাণ পেলাম দিন কয়েক পরেই।

ঘরে ইঁদুরের দারুণ উৎপাত। আমি আর অ্যাকাউন্টেন্টবাবু যা খাই, ইঁদুরে খায় তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রথম প্রথম একটু লোকভয় ছিল, সামান্য চক্ষুলজ্জা। আমাদের খাওয়া হয়ে গেলে পাতে মুখ দিত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে ভাবটা কেটে গেল। সহভোজন শুরু হয়ে গেল। মাছের কাঁটা, ডাঁটার ছিবড়ে মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছিষ্ট নিয়ে টানাটানি আরম্ভ হত। রাত্রে ছাদে খাটিয়ার ওপর শুয়ে শুয়েই শুনতে পেতাম খাটিয়ার দড়িগুলো মুষিককুলের দন্তস্পৃষ্ট হচ্ছে। রজ্জুর বাঁধন ছিঁড়ে আমাদের মুক্তি দেওয়ার প্রয়াস।

এ সবও কোনরকমে সহ্য হচ্ছিল, কিন্তু কিছুদিন পর আমার আর অ্যাকাউন্টেন্টবাবুর নিদ্রিত দেহের ওপর দিয়ে তাদের সপরিবারে লুকোচুরি খেলার সদিচ্ছায় আপত্তি না করে উপায় ছিল না। কোন উদ্দেশ্য নয়, শুধু অকারণ পুলকে একদল প্রাণী আর এক প্রাণীর দেহের ওপর যথেচ্ছ বিচরণ করতে লাগল। শুধু তাই নয়, এয়োতির লক্ষণ যেমন লোহবলয়, তেমনি আমার অ্যাকাউন্টেন্টবাবুর পৌরুষের প্রতীক তাঁর বিশাল গুম্ফ, সেটিও একরাত্রে অসমভাবে কর্তিত হল।

অ্যাকাউন্টেন্টবাবু ঘূর্ণিতলোচন। একহাতে গোঁফ চাপা দিয়ে

সখেদে বললেন, স্যার, আমার আর এখানে থাকা চলবে না। আমার এক মাসী স্ট্যানলি রোডে এসেছেন, সেখানে গিয়েই থাকব।

আমি মুশকিলে পড়লাম। হিসাবের খাতায় অ্যাকাউন্টেণ্টবাবুর ভুল হয়তো থাকে, কিন্তু রান্নার ব্যাপারে তিনি নিখুঁত। দিনকয়েক আগে খাওয়া দই-মাছ তখনও রসনায় লেগে ছিল। সর্ষেবাটা দিয়ে ইলিশ তাও ভোলবার নয়।

কাজেই সামান্য ইঁদুরের অত্যাচারে এ হেন পাঞ্চালী-প্রতিম রাঁধুনী হারাতে আমি নারাজ।

অগত্যা কৃষ্ণপদর শরণ নিলাম।

কৃষ্ণপদ টেবিলের ওপর কতকগুলো প্লাগ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন, আমার ডাকে চেম্বারে এসে ঢুকলেন।

বড় বিপদে পড়েছি কৃষ্ণপদবাবু।

বিপদ? কি বিপদ স্যার?

একটা বেড়াল দরকার।

এ-সি না ডি-সি স্যার? কৃষ্ণপদ অবিচল কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

দম নিলাম, তারপর আস্তে আস্তে বললাম, পাখা নয় কৃষ্ণপদবাবু, বেড়ালের কথা বলছি।

কৃষ্ণপদ মুখটা বিকৃত করলেন। বললেন, ওঃ, বেড়াল। আচ্ছা দেখব।

প্রায় দিন দশেক পরে কৃষ্ণপদবাবু দেখলেন। তাও বার কয়েক তাগাদা দেওয়ার পর।

দুর্ভিক্ষপীড়িত অর্ধমৃত এক মার্জার-তনয়। সর্বস্ব বিকিয়ে যাওয়া নিম্নবিত্তের অবস্থা। প্রাণপণ তোয়াজ শুরু হল। বাড়তি দুধ বরাদ্দ, মাছের কাঁটার স্তূপ। বেড়ালের চেহারা ফিরল। সেই সঙ্গে আমাদেরও। অর্থাৎ ইঁদুরের উপদ্রব কিছু কমল।

কোনদিন যে ইঁদুরের দল এখানে ঘোরাফেরা করত এমন

মনে করতেও অসুবিধা হল। এ যেন আশ্রম-মৃগহীন শান্ত তপোবন।

মাঝরাতে বিকট এক চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। দুজনেরই। খাটিয়ার ওপর বসে যে দৃশ্য দেখলাম তেমন দৃশ্য মানুষ জীবনে একবারই দেখে।

মার্জার-প্রবর আলিসার ওপর। দেহের সামান্য অবশিষ্ট রোঁয়া ক'টা তির্যকভাবে খাড়া। দু চোখে মৃত্যুভয়। লাঙ্গুল গোটান অবস্থায় পদদ্বয়ের মাঝখানে।

ঠিক নীচে ছাদের ওপর গোটা দশেক ইঁদুর। গোটা একটা পরিবার। কাণ্ড দেখে মনে হল মার্জারটির পশ্চাদ্ধাবন করে আলিসার ওপর নিয়ে তুলেছে। আর্তস্বর মার্জারের কণ্ঠের।

কিছুক্ষণ পরেই ঝুপ করে একটা শব্দ। মার্জার-তনয় পাশের টিনের ছাদের ওপর লাফিয়ে পড়ল। ছুটে ছাদের কাছে গেলাম। মার্জারের চিহ্নমাত্র নেই। এর পরেও মাস চারেক এলাহাবাদে ছিলাম, আর তাকে দেখিনি। জীবিত বা মৃত কোন অবস্থাতেই নয়।

মাসখানেকের মধ্যেই নক্ষত্রের বিচিত্র সমাবেশে কোন এক পুণ্য-লগ্নের সূচনা হল। দলে দলে সাধুরা প্রয়াগে এসে সমবেত হলেন। হোগলার ছাউনিতে নদীর দু-তীর ভরে গেল।

আমার ধর্মভাব প্রবল নয়। প্রায় নাস্তিকেরই সগোত্র। ছেলেবেলাতেও পরীক্ষার হলে ছাড়া অন্য কোথাও ঈশ্বরের কথা স্মরণ করেছি এমন মনে হয় না। পূতযোগে স্নান করলে জন্মান্তরের পাপ বিদূরিত হয়, এ অন্ধ সংস্কার আমার নেই। আমি যেতাম নেহাৎ কৌতূহলবশতঃ। নানা ধরনের সাধু। সবাই হয়তো সাধু নয়, তবে সকলের অঙ্গেই সাধুর আবরণ। দু-একজন ব্যবসাও শুরু করেছে। সামনে শিকড়-বাকড়, প্রাণীর হাড় সাজিয়ে নিমীলিত-

নেত্র। বন্ধ্যাত্ব দূর করার টোটকা থেকে আরম্ভ করে মামলা জয়ের মাদুলি। কেউ কেউ আরও গুহ্য ব্যাপারের হদিশ দিতেও তৎপর।

হাঁটতে হাঁটতে একদিন বেশ দূরে চলে গেলাম। এখানে ছাউনি কম। সাধুর সংখ্যাও স্বল্প। সবে মাত্র সূর্যোদয় হয়েছে। রক্তিম-রেখা আলপনা আঁকছে বালির স্তূপে স্তূপে। আলো-অন্ধকারের মায়াজাল।

সেই নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুক চিরে উদাত্তকণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হল। এমন সুললিত কণ্ঠ, এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ এর আগে শুনেছি বলে মনে হল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

একটা ছেঁড়া চটের তাঁবু। তারই সামনে বসে গৌরকায় সুদর্শন এক বৃদ্ধ। মাথার জটা ঝালরের মতন দু কাঁধে এসে নেমেছে। খড়্গ নাসা, আয়ত লোচন। নগ্নগাত্রে শুভ্র উপবীতের গোছা। দুটো হাত জোড় করে বুকের ওপর রেখে একাগ্র মনে দেবভাষায় স্তোত্রপাঠ করে চলেছেন। আশ্চর্য, পাঠের সঙ্গে সঙ্গে দুটি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের ধারা।

কাছেই বালির ওপর বসে পড়লাম। সূর্যের কিরণ প্রখর হল। এক সময়ে সাধুর স্তোত্রপাঠ শেষ হল। চোখ খুলে উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। একেবারে সামনা-সামনি বসেছিলাম। ভ্রূ-কুঞ্চন করে বললেন, কৌন হ্যায় আপ?

আমার পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি। পায়ের জুতোটা খুলে রেখে-ছিলাম। প্রশ্নের উত্তরে প্রণাম করে বললাম, পরিচয় দেবার মতন কেউ নই। এখানকার সাময়িক বাসিন্দা। বেদপাঠ শুনে ভাল লেগেছিল, তাই বসে বসে শুনছিলাম।

সাধু আর একবার আমাকে নিরীক্ষণ করলেন। আপাদ-মস্তক। তারপর সহাস্যবদনে বললেন, আপনি বাঙালী?

বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ। তিনিও যে বাঙালী এ সম্বন্ধে তিলমাত্র

দ্বিধা রইল না। নিজের নাম বললাম, তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, আপনিও তো বাঙালী। আপনাদের গার্হস্থ্য নাম জিজ্ঞাসা করা অন্যায়, তা জানি। আপনি কোন্ আশ্রমের?

সাধু ধীরপায়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। একেবারে আমার পিঠে একটা হাত রেখে বললেন, আমি সাধু-টাধু নই বাবা। গেরুয়া আমার বাইরের আবরণ, অন্তরের জিনিস নয়।

কিন্তু আপনি এখানে?

তীর্থ-ধর্ম করা সাধুদেরই একচেটে তো নয়। পুণ্য-ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার। তাছাড়া শ্রীক্ষেত্র, দ্বারকা, কাশীর চেয়ে প্রয়াগই আমার সব্বচেয়ে প্রিয় জায়গা। এখানে আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু রেখে গেছি বলেই বোধহয়।

মনে হল ভদ্রলোক কোন প্রিয়জনকে এলাহাবাদে হারিয়েছেন। পুত্র, কন্যা কিংবা জায়া। সেই স্মৃতির টানে যাগযজ্ঞ উপলক্ষ করে ছুটে আসেন এখানে।

আমার পাশ কাটিয়ে তিনি নদীর দিকে এগিয়ে গেলেন। বুঝলাম যেটুকু বলেছেন, তার বেশি কিছু বলা তাঁর অভিপ্রেত নয়।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলাম।

এঁর পরিচয় পেলাম মাস দুয়েক পরে। এলাহাবাদেরই এক উকিল বন্ধুর কাছে। এক বর্ষার সন্ধ্যায় তাঁর প্রশস্ত বৈঠকখানায় আড্ডা হচ্ছিল। প্রথমে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তারপর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আলোচনা দ্রব্যমূল্যের মহার্ঘতার খাতে প্রবাহিত হয়ে সিনেমা-স্টারদের চড়ায় আটকাল। সেখানে কিছুক্ষণ পাক খেয়ে মানুষের আধ্যাত্ম্য-জীবনের শাখা-নদীতে নামল। সেই সূত্রেই আমি সঙ্গমে দেখা সাধুটির বর্ণনা দিলাম।

উকিল-বন্ধুটি বললেন, ও, রাজকৃষ্ণবাবুর কথা বলছেন? উনি বছরে বার দুই তিন প্রয়াগে আসেন।

চেনেন নাকি? সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

উকিল-বন্ধু হাসলেন, চিনি বইকি। উনি এখানকারই লোক। এক সময়ে আমার পড়শী ছিলেন।

বললাম, ভদ্রলোকের কোন এক আত্মজন বোধ হয় এখানেই মারা গেছে, সেই টানেই উনি বারবার এখানে ফিরে আসেন।

হ্যাঁ, উকিল-বন্ধু বললেন, আসগরীবাঈ এখানেই মারা যায়। বজরা-ডুবি হয়ে।

আসগরীবাঈ? এতক্ষণে মনটা ডানা ঝাপটে সতেজ হয়ে উঠল। সব কিছু একটু অসাধারণ ঠেকল। সাধুর সঙ্গে সাধ্বীর আলোচনা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু সাধুর সঙ্গে বাঈজির উল্লেখ যথেষ্ট বেখাপ্পা।

বন্ধুবর কাহিনী ফাঁদলেন।

রাজকৃষ্ণবাবুরা তিনপুরুষে ধনী। আগে দেউড়ীতে হাতি বাঁধা থাকত, শেষদিকে অবশ্য কাবুলীওয়ালা। নাচ, গান, বাজনা এই তিন দাঁড়ে ভর দিয়ে জীবন-তরী চলত। আসগরীবাঈয়ের আসল বাড়ি গোয়ালিয়র। মুজরো নিয়ে এলাহাবাদ এসেছিল, এক আসরে রাজকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে দেখা। তখন রাজকৃষ্ণবাবুর চেহারাই আলাদা। একমাথা ভ্রমরকালো কুঞ্চিত চুলের বাবরী। ড্যাম কেয়ার গোঁফ। দু প্রান্ত মোম দিয়ে সূঁচালো করা। তপ্তকাঞ্চন বর্ণ। ফিনফিনে পাঞ্জাবি, পরনে ধাক্কাপাড় ধুতি। পায়ে জরির শুঁড়তোলা নাগরা।

এক পলকের দেখা, কিন্তু সেই দেখাই কাল হল। রাজকৃষ্ণ বাঈজিকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন।

এটা কিন্তু রেওয়াজ নয়। এক বাড়িতে মুজরো নিয়ে এসে অন্য কোথাও বায়না নেওয়া নীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু আসগরীবাঈ নিয়ম ভাঙল। বনওয়ারীপ্রসাদ চটলেন, কিন্তু ওই পর্যন্ত। কিছু করার উপায় নেই। বনওয়ারীপ্রসাদের মতন বহু লক্ষপতি আসগরীবাঈয়ের চরণপ্রান্তে লুটোচ্ছে।

আসগরীবাঈ 'নটবর-ধামে' সেই যে ঢুকল, আর বেরোল না।

বনের পাখীকে রাজকৃষ্ণবাবু খাঁচায় বন্দী করার চেষ্টা করলেন।

বারনারীকে বরনারী। রাজকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়ি ছাড়লেন। অভিশাপের বোঝা দরজায় নামিয়ে। আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্ব-পরিজন সবাই বোঝালেন। কেউ কেউ লোকভয়, সমাজভয়, আবার কেউ মারেরও ভয় দেখালেন, কিন্তু রাজকৃষ্ণ অবিচল।

চণ্ডীমণ্ডপে যেখানে মহামায়ার পূজা হত, সেখানে বাঈজি প্রতিষ্ঠা হল।

আসগরীবাঈও পসার, নজরানা, ব্যবসা, সব ছেড়ে রাজকৃষ্ণবাবুকে নিয়ে মাতল।

যেদিন খবর এল রাজকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী বাপের বাড়িতে আত্মহত্যা করেছেন, সেদিন সারা রাত জলসা বসল। আসগরীবাঈ মিঞাকি-মল্লার ধরল। তবলায় বসলেন রাজকৃষ্ণবাবু নিজে।

বছর দুয়েক, তার মধ্যেই প্রথমে বাস্তুভিটে তারপর ইজ্জৎ বাঁধা পড়ল। ঘুঙুরের বোল মিইয়ে এল। গানের গলা স্তব্ধ।

রাজকৃষ্ণবাবু ক্ষেপে উঠলেন। সিন্দুক খুলে শেষ সোনার টুকরো বের করে বজরা সাজাবার হুকুম দিলেন। গঙ্গার বুকে জল-বিহার। মাতাপ্রসাদ তবলচীকে এত্তেলা পাঠানো হল। আলো দিয়ে সাজানো হল বজরা। বাঈজি পরল ফুলের গহনা। পরল না, রাজকৃষ্ণ নিজের হাতে পরালেন। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে জন দশেক।

সারা রাতের প্রোগ্রাম। সারা রাতই চলত, কিন্তু মাঝরাতে মারাত্মক দুর্ঘটনা। বাতির তারে কি গোলমাল হল। ছোট্ট এক স্ফুলিঙ্গ, তারপর দাউ দাউ করে সারা বজরা জ্বলে উঠল। সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে অনেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজকৃষ্ণবাবুর চলবার অবস্থা ছিল না। শেষ অবধি গ্লাস আঁকড়ে বসেছিলেন, হঠাৎ প্রচণ্ড এক ধাক্কায় অচেতন অবস্থায় ছিটকে পড়েছিলেন জলে! যখন জ্ঞান হয়েছিল, তখন বেলা অনেক। চারপাশে লোকের ভিড়। বেশ কয়েকজনের মৃতদেহ চড়ায় আটকে পড়েছিল। বাঈজিকে পাওয়া গিয়েছিল অর্ধদগ্ধ অবস্থায় বজরার পাটাতনের মধ্যে।

একেবারে শেষ অবস্থা। চোখ চাইবার উপায় নেই। দুর্নিবার যন্ত্রণায় মুখটা কুঁচকে কুঁচকে যাচ্ছে, তবু তার মধ্যেই অস্ফুট আর্তনাদ করে জিজ্ঞাসা করেছিল—রাজাবাবু, আমার রাজাবাবু ?

রাজকৃষ্ণবাবু বেঁচে আছেন শুনে আসগরীবাঈ তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। শেষ নিশ্বাস।

রাজকৃষ্ণবাবু আর বাড়ি ফেরেন নি। আসগরীবাঈয়ের দেহ সংকার করার অপেক্ষাও নয়। কোথায় যে গেলেন কেউ জানে না।

এক বছরের পর সাধু-সন্ন্যাসীর মেলায় রাজকৃষ্ণবাবু যখন ফিরলেন, তখন তাঁর আলাদা ভোল। আদ্দির পাঞ্জাবীর বদলে গৈরিক আলখাল্লা। আতরের বদলে বিভূতি। তপ্ত কাঞ্চনআভা তামাটে। কপালে গালে সময়ের হিজিবিজি আঁচড়। মুখে শিবস্তোত্র, বেদগান।

ঠিক যে জায়গায় আসগরীবাঈয়ের দেহ মাটি স্পর্শ করেছিল, সেখানে ডেরা বাঁধলেন। গঙ্গার দিকে মুখ করে শিবস্তোত্র, বেদগান করতেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত লাগল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়, বরং শেষ-জীবনে পাপকেই যেন আঁকড়ে ধরলেন রাজকৃষ্ণবাবু। অন্ততঃ পাপের স্মৃতিকে।

কাহিনী শোনার পরই ইচ্ছা হল আর একবার রাজকৃষ্ণবাবুর মুখোমুখি দাঁড়াব। তাঁকে আরও ভাল করে দেখব, কিন্তু মেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উধাও। আবার হয়তো পরের বছরে আসবেন।

হয়তো পরের বছর তিনি ঠিকই এসেছিলেন, কিন্তু আমার আর দেখা হয় নি। তার আগেই আমি কলকাতায় বদলি হলাম।

শরীরটা কিছুদিন ভাল যাচ্ছিল না। বিশেষ, এক দুপুরে হঠাৎ 'লু' লেগে যাওয়ার পর থেকে। সারারাত কাশি, বুকে ব্যথা। আমার ঘুম তো হতই না, সেই সঙ্গে অ্যাকাউণ্টেণ্টবাবুও উঠে বসে

থাকতেন। কোথা থেকে পুরোনো ঘি জোগাড় করে দিলেন কৃষ্ণপদ-বাবু। এই প্রথম বোধহয় পাখা ছাড়া অন্য কিছু জোগাড় করলেন, অবশ্য আমাদের দেওয়া সেই বীরপুঙ্গব মার্জারতনয়টি বাদে।

কলকাতার অফিসে চিঠি লিখলাম, এলাহাবাদের জলবায়ু আমার সহ্য হচ্ছে না, কলকাতায় ফিরে যেতে চাই।

কিছুদিন চিঠিপত্র চলল। অনুনয়, বিনয়, উপরোধ। লাহোর শহর আমার স্বাস্থ্যের অতীব অনুকুল, সে সম্বন্ধেও সেক্রেটারি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। ফল, মেওয়া আর দুধ কি অপর্যাপ্ত পরিমাণে সেখানে পাওয়া যায়, কত সুলভে—তার লোভনীয় বিবরণও পাঠালেন।

এদিকে আমার দ্রাক্ষাকুঞ্জেও ফল ধরেছে, গুচ্ছে গুচ্ছে নয়, গুটি দুয়েক। একেবারে হিসাব করে। একটি আমার, একটি অ্যাকাউন্টেন্টের। মুখে ঠেকিয়েই কথামালার শৃগালের পুনরুক্তি করলাম। মেওয়াফলে অরুচি ধরে গেল।

গোঁ ধরলাম, হয় কলকাতা, নয় চাকরির সুতো ছিঁড়ে একেবারে মুক্তপুরুষ।

এবার হেড অফিস রাজী হল। তবে ব্যাঙ্কে নয়, জেনারেল বীমা কোম্পানির সেক্রেটারি হিসাবে নিয়োগপত্র এল। তার সঙ্গে টিপ্পনী, এবার স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকতে পারবেন। মায়ের কোলছাড়া হতে হবে না।

নতুন অফিস। নতুন ধরনের কাজ। সব বুঝে নিতে মাস চার-পাঁচ সময় নিল।

ইতিমধ্যে দেশ জুড়ে মন্বন্তরের করাল ছায়া নামল। পথের বাঁকে বাঁকে মৃত অর্ধমৃত দেহের স্তূপ। সারারাত ফ্যান-প্রার্থীদের আর্তরোল। আকাশে বাতাসে চিতাধূমের গন্ধ। মন বিষিয়ে উঠল। মাঝে মাঝে কলম হাতে খাতা খুলে বসতাম। নতুন কিছু লেখার আশায়। রোমান্টিক কোন কাহিনী। কিন্তু জানালার ফাঁক দিয়ে

সামনের যে রাস্তার ফালিটুকু চোখে পড়ত, তার ওপরে রিক্ত, সর্বহারা মানুষের দল। মানুষ নয়, মানুষের প্রেতাত্মা। দুচোখে, কম্পমান অধর-ওষ্ঠে, প্রসারিত হাতে, সর্ব-অবয়বে স্পষ্টাক্ষরে লেখা—ক্ষুধা। সর্বনাশা এই ক্ষুধার তাড়নায় গোটা জাত যেন ছুটে বেড়াচ্ছে এক দ্বার থেকে দ্বারান্তরে।

খাতার পাতায় রোমান্টিক কাহিনী ফ্যাকাশে হয়ে যেত। মধুর সংলাপ নায়ক-নায়িকাদের মুখেই আটকে থাকত। কলম ফেলে ছুটে পালিয়ে যেতাম দু হাতে কান চেপে। খবরের কাগজে পড়লাম, এ আকাল নাকি মানুষের সৃষ্টি। জানি না তারা কে, কেমন মানুষ। এই নারকীয় প্রমত্ততায় কি আনন্দ। কিন্তু কেবল মনে হত, যারা নির্বিবাদে, নির্বিকারে, ভিক্ষাপাত্র বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে পথে-ঘাটে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করছে, তাদেরও কিছু বলার আছে। সাহিত্যের পাতায় তাদের বাণী ফোটাতে না পারলে কর্তব্যের হানি হবে। সাহিত্যিক হিসাবে ব্রতভঙ্গ হবে আমার।

হঠাৎ খাতার পাতায় এক কবিতা ফুটে উঠল, 'বন্যশকুন'। রিক্ত হৃতপল্লব অশ্বত্থের শাখায় বসে এক শকুন বাঁকানো ঠোঁটে শিশুর অন্ত্র ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছে আর পরম তৃপ্তিতে এদিক-ওদিক দেখছে। এই মরণ-মহোৎসবে তাদেরই উল্লাস অপরিসীম।

কবিতা তো লেখা হল। দু-একজন বন্ধুকে শোনানও হল, কিন্তু পত্রস্থ করা যায় কি করে। হাতে কাগজ বলতে মাত্র একটি। 'প্রবর্তক'। কিন্তু মনে হল সে কাগজে এ লেখা যেন চলবে না।

সুযোগ জুটে গেল। সারদাবাবু নামে এক ভদ্রলোক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছেন। নাম 'ভৈরব'। কাগজটি ভাল করার প্রাণপণ প্রয়াসও করছেন। প্রথম সংখ্যা থেকেই তারাশঙ্কর-বাবুর ধারাবাহিক উপন্যাস 'তামস তপস্যা', এ ছাড়া খ্যাতিমান কবি ও গল্পলেখকদের একাধিক কবিতা ও একটি করে গল্প প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে।

আশ্চর্য কাণ্ড, সারদাবাবু একদিন আমার কাছে এসে উপস্থিত। লেখার প্রত্যাশায়। বললেন, আপনি লেখেন-টেখেন শুনেছি, আমার কাগজে লেখা দিচ্ছেন না কেন ?

আমি হতবাক। জলজ্যান্ত সম্পাদক এভাবে লেখা প্রার্থনা করছেন ভাবতেও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম।

কিছু গৌরচন্দ্রিকা করার পর দিন তুয়েকের মধ্যেই 'বন্যশকুন' কবিতাটি তাঁর হাতে এনে দিলাম। কবিতাটি প্রকাশিত হল, অবশ্য শেষ পংক্তিটি বাদ দিয়ে। সারদাবাবু নিজে এলেন সংখ্যাটি হাতে নিয়ে। তুঃখ করলেন, শেষ স্তবকটি ছাপাতে পারেন নি বলে। ছাপালে নাকি পুলিশের বিষদৃষ্টিতে পড়তে হত।

খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। এমন জ্বালাময়ী ভাষা আয়ত্ত করেছি যে, সম্পাদকও পুলিশের থাবার ভয়ে সে ভাষা ছাপাতে সাহস করেন না। মনে মনে আওড়াতে লাগলাম কি ছিল সে রাহুগ্রস্থ রচনার অংশে। ঘরের ইঁতুর আর বাইরের ইঁতুরে মিলে আমাদের গোলাঘরে জমানো ধান নিঃশেষ করেছে, তাই আমাদের এই দীন অবস্থা, এমন একটা ইঙ্গিত ছিল। ইঙ্গিতটা সাধারণ বোধগম্য হবার অবকাশ না পেলেও যে সম্পাদক-বোধগম্য হয়েছে, তাতেই পুলকিত হলাম।

এরপর ইতস্ততঃ কয়েক জায়গায় লেখা দিলাম। আবর্ত, অলকা, বঙ্গশ্রীতে গল্প, একক, দীপালী, নিরুক্তে কবিতা। নিরুক্তের কবিতাটির নাম 'ফসল'। কবিতাটি যে ভাল হয়েছে এ কথা সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য নিজে চিঠি লিখে জানালেন।

তেরোশো বাহান্ন সাল। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বামপন্থী দলের এক অভিনয় দেখতে গেছি। সঙ্গে তু-একজন বন্ধুও ছিলেন। বিরতির পর সুশীল জানা একটি ভদ্রলোককে আমার কাছে নিয়ে এলেন। শান্ত, নিরীহ চেহারা। মিতবাক। পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীগোপাল হালদার। এঁর নামের সঙ্গে পরিচিত

ছিলাম। শনিবারের চিঠিতে ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় পড়েওছি এঁর সম্বন্ধে। চাক্ষুষ দেখা এই প্রথম।

গোপালবাবু আমার কাছে একটি গল্প চেয়ে বসলেন। 'পরিচয়' কাগজের জন্য। পরিচয় তখন উগ্র বামপন্থী কাগজ। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সবেরই এক সুর। বাংলাদেশের খ্যাতনামা অনেকেই লিখছেন। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সমিতিতেও আছেন অনেকে।

আমি খুব মৃদুকণ্ঠে বললাম, কিন্তু আমি যে-ধরনের গল্প লিখি, তা কি আপনাদের কাগজে চলবে?

কি ধরনের লেখেন আপনি?

একটু রোমান্টিক ধরনের।

ভদ্রলোক উচ্চহাস্য করলেন, রোমান্টিক লেখা আমরা ছাপি না—এ তথ্য আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? গল্প ভাল হলেই আমরা ছাপি। গল্পের উৎকর্ষ গল্পত্বে, অন্য কিছুতে নয়।

আশান্বিত হলাম। কিছুদিন পরে একটি গল্প দিলাম। 'উপকূল'। ব্রহ্মদেশ থেকে একটি বাঙালী যুবক আর তার বর্মী স্ত্রীর ভারতবর্ষে পালিয়ে আসার কাহিনী। ট্রিটমেণ্টটা পুরোপুরি রোমান্টিক।

গল্পটা দিলাম বটে, কিন্তু মনের মধ্যে ঠিক জানতাম লেখাটি ব্যুমেরাংয়ের মতন আমার কাছেই ফেরত আসবে।

মাস দুয়েকের মধ্যেই শ্রাবণ সংখ্যা পরিচয় আমার হাতে এসে পৌঁছলো। 'উপকূল' প্রকাশিত হয়েছে। আরো আশ্চর্যের কথা, গল্পটি উঠতি সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট আলোচিতও হল। দু-একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রশংসালিপিও পাঠালেন।

হৃদয়ে গর্বের কণামাত্রও জমে নি, একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। বরং মনে হল, এতদিনে বুঝি একটু কল্কে পেলাম। সাহিত্যিকদের পংক্তিভোজনে একেবারে কোণের দিকে হলেও একটা আসন এবার জুটল।

পরিচিত এক অধ্যাপক সংবর্ধনা জানালেন, ক্রমান্বয়ে ডাস্টবিন,

ফ্যান আর মিছিল পড়ে পড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, আপনার গল্পে নতুনত্বের স্বাদ পেলাম।

এটুকু বুঝলাম রোমান্টিক রচনার আবেদন চিরন্তন। মানুষ সব সময়েই চাঁদকে 'রোদে ঝলসানো রুটি' মনে ভাবে না। হেনা-বকুলের গন্ধও তাকে মাতাল করে।

শুধু লেখাই নয়, কিছু কিছু লেখকের সঙ্গেও যোগাযোগ হল।

কবি দিনেশ দাশ আর নরেন্দ্রনাথ মিত্র কাজ করতেন, ঠিক এক অফিসে নয় একই বাড়িতে। একজন ব্যাঙ্কে, একজন জীবনবীমা দপ্তরে। সময়-সুযোগ করে মাঝে মাঝে আমরা তিনজন কাজের অবকাশে গিয়ে জুটতাম পার্কে, কিংবা চায়ের দোকানে। কোন কোন দিন ফুটপাতে দাঁড়িয়েই সাহিত্য-পরিক্রমা হত।

তখন 'অলকা' কাগজটি বোধহয় দীনেশবাবু দেখাশোনা করতেন। দেখাশোনা মানে লেখা সংগ্রহ করা। এর আগে একবার আমার একটি গল্প প্রকাশিত করেছিলেন, এবার আর একটি গল্প চাইলেন।

দিলাম। প্রকাশিতও হল। আরও একটি অবাক কাণ্ড ঘটল। দিনেশবাবু একদিন আমার চেম্বারে এসে পকেট থেকে একটি দশটাকার নোট টেবিলের ওপর রাখলেন।

কি ব্যাপার ?

আপনার দর্শনী।

হিসাব করে দেখলাম এর আগে গল্প কবিতা মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সবই অ-মূল্য রচনা। লিখে দক্ষিণা পাওয়া যায় সেকথা শুনেছিলাম, আমার জীবনে ফলপ্রাপ্তি ঘটল এই প্রথম।

অর্থ নাকি মনে সাহস আনে। সাহস বাড়ল। মনে মনে ঠিক করলাম খেটে-খুটে একটা গল্প লিখে দেশ পত্রিকায় পাঠিয়ে দেব। বুক ঠুকে।

'দেশ' পত্রিকার আমি বহুদিনের গ্রাহক। ঠিক কথা বলতে

গেলে, বর্মায় থাকতে গ্রাহক ছিলাম, এদেশে অনুগ্রাহক। হকারের কাছ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করি। বেশ কাগজটি। পরিচ্ছন্ন, রুচি-স্নিগ্ধ। প্রায় প্রতিটি গল্পই শক্তির স্বাক্ষর বহন করে। নতুন লেখকের হলেও। এদেশের পত্রিকা-আকীর্ণ জগতে 'দেশ' বলিষ্ঠ এক অধ্যায়ের ধারক ও বাহক।

অনেক আগে, বর্মায় থাকতে দু'বার দেশ পত্রিকায় লিখেছিলাম। তখন সম্পাদক ছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। এবার শুধু সম্পাদকই নয়—কাগজের বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ দুইই বদলেছে। নতুন লেখার জোয়ার এসেছে। যারা এতদিন শুধু প্রতিশ্রুতির কুয়াশা ছিলেন, তাঁরা বলিষ্ঠতার বাণী, স্থায়িত্বের বাণী এনেছেন লেখার মাধ্যমে।

মনে গোপন আশা, তাদের লেখার পাশাপাশি যদি আমার নামটাও ছাপানো যায়।

অনেক ভেবে-চিন্তে একটা লেখা পাঠিয়ে দিলাম দেশ পত্রিকার দপ্তরে। ডাকযোগে। গল্পের নাম 'মাথুর'। অন্ধ বৈষ্ণবের কাহিনী।

অভিজ্ঞ বন্ধুরা সতর্ক করে দিলেন, মাস তিনেকের আগে যেন খোঁজ নেবেন না। রাশি রাশি লেখা আসে। সে সব দেখতে অনেক সময় নেয়।

এ ছাড়াও আরও গুহ্যতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করলেন, খোঁজ করলে সম্পাদকরা বিরক্ত হয়। স্পষ্ট বলে দেন, মনোনীত হয় নি।

দমে যাবার পক্ষে এ উপদেশ যথেষ্ট, কিন্তু মানুষের মনের মতন এমন বিচিত্র বস্তু আর নেই। যেখানে কাঁটাতারের বেড়া, নিষেধের রক্তচক্ষু, সেখানেই তার গোপন অভিসারের আকাঙ্ক্ষা।

মাসখানেক পরেই একবার টেলিফোন তুলে ধরলাম। ডাকলাম খোদ দেশ-সম্পাদককে।

তারের ওপার থেকে ভারী গম্ভীর কণ্ঠে ভেসে এল, বলুন কি চাই? বার-দুয়েক ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে ফোন করার উদ্দেশ্য বললাম।

আপনার নাম? এবার যেন কণ্ঠ আরও উগ্র।

বিয়ের আগে দেখতে আসা পাত্রের আড়াই-মণী জ্যাঠার সামনে পাত্রীর নাম বলার ভঙ্গীতে ভীত-কম্পিত স্বরে নামটা বললাম।

গল্পের নাম ?

তাও বললাম।

যাচ্ছে।

ছোট্ট কথা, কিন্তু মনে হল জগতের সমস্ত মাধুর্য চয়ন করে কথাটি সৃষ্টি হয়েছে। জগৎ মধুময় দেখছি। মধুবাতা ঋতায়তে। মধু ক্ষরন্তি সৈন্ধবঃ। উল্লসিত হবার মুখেই মনে পড়ল। যাচ্ছে তো, কিন্তু কোথায় ? দেশের পাতায়, না, বাজে কাগজের ঝুড়িতে ?

সুনিশ্চিত হবার জন্য আবার দ্বিধাভরে প্রশ্ন করলাম, কবে যাবে ?

নিশ্চল, নিষ্কল্প, উদাত্ত কণ্ঠস্বর, সামনের সপ্তাহের পরের সপ্তাহে।

নিতান্ত চাকুরিটা যাবে, না হলে চেম্বারের মধ্যে একবার নেচে নিতাম। বহু কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলাম, কিন্তু কে জানতো আরো বিস্ময় আমার জন্য জমা ছিল টেলিফোনের তারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

একদিন আসুন। এখানে বিকালের দিকে অনেক সাহিত্যিক জড় হন। আর আসার সময় একটা গল্প নিয়ে আসবেন।

কিছুক্ষণ পরে যখন খেয়াল হল যে, একটা ধন্যবাদ দেওয়া প্রয়োজন, তখন দেখলাম টেলিফোনের হাতলটা টেবিলের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে।

'মাথুর' প্রকাশিত হল। 'দেশ' অফিসে গিয়েওছি। গল্পও আর একটা দিয়ে এসেছি। সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাঁকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার অফিসে।

ইতিমধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। হিন্দু আর মুসলমানে। উগ্রতা দেখে মনে হল বহু যুগের বিদ্বেষবহ্নি বুঝি সঞ্চিত ছিল দুজনের হৃদয়ে। শুধু একটা বিশেষ ধর্ম কতখানি ঘৃণার উদ্রেক

করতে পারে, তার উদাহরণ দেখলাম প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে হত্যা করল, সহপাঠী সহপাঠীকে। যারা কীট-পতঙ্গের জীবনপাত করতে সঙ্কুচিত হত, তারা অনায়াস বিক্রমে নির্বিচারে ভোজালী বসাল নিরপরাধের বুকে। আকাশ আগুনে রক্তিম হল, ধরণী শোণিতে রক্তাক্ত।

অফিস যাবার উপায় নেই। অবস্থা সামান্য শান্ত, কিন্তু তখনও মিলিটারী টহল চলেছে। বারান্দায় পায়চারি করতে করতে হাজার লোকের মুখে হাজার গুজব শুনছি, এমন সময় নীচে সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ।

একটা 'দেশ' পত্রিকা ছুঁড়ে বারান্দায় ফেলে দিল।

পত্রিকাটা কুড়িয়ে নিয়েই মনে পড়ল, 'জোয়ার' নামে একটি গল্প দিয়ে এসেছিলাম, সেটাই বোধহয় ছাপা হয়েছে। সূচীপত্র উল্টে দেখলাম আমার ধারণাই ঠিক। দ্রুতহাতে পাতা উল্টিয়েই থেমে গেলাম। হাত থেকে পত্রিকাটা মেঝের ওপর পড়ে গেল। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল ঠক ঠক করে। অবসাদের ময়াল সাপটা পাক দিয়ে চেপে ধরল আমাকে।

'জোয়ার' প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সারাটা পাতা জুড়ে অল্প অল্প রক্তের ছিটে। পথের মাঝখানে নৃশংস এক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই হয়তো পিয়ন সাইকেল চালিয়ে এসেছে। রক্তের ছিটে এসে সাইকেলের ওপর রাখা পত্রিকাগুলোর ওপর পড়েছে।

দারুণ দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচলিত হবার মতন কিছু নয়, বিশেষ করে কলকাতা ক'দিন রক্তস্নান করে ওঠার পর, কিন্তু আমি কিছুতেই নিজের মনকে শান্ত করতে পারলাম না। কেবল মনে হতে লাগল, কলুষ শোণিতকণা সাহিত্যকেও স্পর্শ করেছে। সাহিত্যের শুচিতা, সৌন্দর্য, স্বাধীনতা সব অপবিত্র হয়ে গিয়েছে। সাম্প্রদায়িক হিংসার পঙ্ককুণ্ডে সাহিত্যকেও টেনে নামাবার অপপ্রয়াস চলেছে।

মনে আছে, বেশ কিছুদিন 'জোয়ার' গল্পটা পড়তে পারি নি। পত্রিকা খুলেই শিউরে উঠেছি। সরিয়ে রেখেছি নিজের লেখা।

অনেক পরে, অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে এলে ওই সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকা আবার কিনেছি। রক্তের ছিটে লাগা 'দেশ' পত্রিকাটি সন্তর্পণে বিসর্জন দিয়েছি আদিগঙ্গায়।

'দেশ' সম্পাদকই একদিন বললেন, বর্মা দেশে এত বছর কাটিয়েছেন, সে দেশকে, দেশের লোককে গভীরভাবে জানেন, সে দেশ নিয়ে, দেশবাসীদের নিয়ে বড় একটা কিছু লিখুন না।

বড় কিছু মানে উপন্যাস। কথাটা আমারও মনে লাগল। কয়েক দিনের মধ্যেই কাজে লেগে গেলাম। প্রথম প্রথম একটু দ্বিধা, একটু জড়তা, মনের মধ্যে ভয়ও যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু লিখতে লিখতে মনে সাহস এল, কলমে ভাষা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখোমুখি বর্মার সঙ্কটময় মুহূর্তগুলো কেন্দ্র করে উপন্যাসের জাল পাতলাম। আমার চোখে দেখা বহু চরিত্র ফুটে উঠল কলমের ডগায়। কানে শোনা বহু ঘটনা রূপ নিল। সব চেয়ে আশ্চর্য, নায়ক সীমাচলম যেন আমার দ্বিতীয় সত্তারূপে জন্ম নিল। আমার ধ্যান-ধারণা, অনুভূতি, আমার মানসপুত্রের সগোত্র। আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ বেদনা আবর্তিত হয়েছে তাকে ঘিরে। তার মধ্যেই আমি প্রচ্ছন্ন ছিলাম। কোরকের মধ্যে বীজের মতন, কিশলয়ের মধ্যে মহীরূহ সম্ভাবনার মতন আমারই অন্তরজাত এই চরিত্র ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। মনের গভীরে নেমেছে তার শিকড়, মস্তিষ্কের রৌদ্রালোকে তার শাখা-প্রশাখা তৃষিত জিহ্বা মেলে ধরেছে। আমার শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে দ্বিতীয় এক 'আমি' গড়ে উঠেছে।

সীমাচলম যে আমারই কিছুটা অংশ এ অনুভূতি আমার এসেছে অনেক পরে। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে আমাকে সচেতন করেছেন অন্য এক নারী।

এক গ্রন্থাগারিকের মাধ্যমে প্রথম পরিচয়। এমন তো কত মহিলার সঙ্গেই আলাপ হয়। সভা-সমিতিতে, পথে-ঘাটে, বাড়ির বৈঠকখানায়।

কিন্তু এক হিসেবে এই নারী অনন্য।

প্রথম আলাপের পরই স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিই তো সীমাচলম ?

সেই বর্ষণোন্মুখ সন্ধ্যায় নারীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠেছিলাম। এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন আগেও হতে হয়েছে, কিন্তু সে সব কণ্ঠে দ্বিধা ছিল, সংশয় ছিল, সঙ্কোচ ছিল। অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আচ্ছা, আপনিই কি সীমাচলম ? অনেকে বলেছেন, সীমাচলমের চরিত্রে আপনার কোন ছায়া পড়েছে ?

কিন্তু এ তো প্রশ্ন নয়, সিদ্ধান্ত। এ প্রশ্নের পাশ কাটানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনই স্বীকার করাতেও বিপদ আছে।

শোনা যায়, ডেভিড কপারফিল্ড রচনার পর বহু সমালোচক ডিকেন্সকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি আর ডেভিড কপারফিল্ড এক হয়ে গেছেন। এক দেহ, এক মন। তাই না ?

ডিকেন্স হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, ইয়েস, আই হ্যাভ চেঞ্জড্ সি. ডি. ইনটু ডি. সি.।

মনে হয় অলক্ষে, অবচেতন মনের অপরূপ প্রকাশে লেখকের মনের গতি-প্রকৃতি রীতিনীতি নিজের সৃষ্ট প্রিয় চরিত্রের ওপর আরোপিত হয়, ঠিক যেভাবে পূর্বপুরুষদের দোষ-গুণ ত্রুটি-বিচ্যুতি সঞ্চারিত হয় উত্তর পুরুষে।

এখনও মাঝে মাঝে সেই নারীর কথা মনে হয়। যাঁর নাম, ধাম, পরিচয় কিছুই সেদিন জানার সুযোগ হয় নি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে হয়তো এমন প্রশ্ন কোন নারীই আমাকে কোনদিন করেন নি। আমার হৃদয়ের নিহিত জিজ্ঞাসাই কলেবর নিয়েছিল আমার চোখের সামনে।

কিন্তু এটুকু বুঝেছি, সেদিনের সেই বলিষ্ঠ প্রত্যয়, নিঃসন্দেহ ঘোষণা আমার মনের ওপর ইন্দ্রজালের কাজ করেছে। যে সীমাচলম জন্মলাভ করেছে আমার মেধার মাধ্যমে, তাকে নতুন করে চিনেছি। আত্মজ হিসাবে নয়, তার চেয়েও বড় কথা আমার দ্বিতীয় সত্তা হিসাবে।

উপন্যাস শেষ হল। নাম দিলাম 'মোহানা'। এই নামেই 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে লাগল। মনে হল লেখাটি পাঠক-পাঠিকাদের অন্তর স্পর্শ করেছিল। আমার কাছে এবং 'দেশ-এর দপ্তরে প্রশংসাসূচক বহু চিঠি এসে জমা হল।

'দেশ-এর পৃষ্ঠায় একদিন বই শেষ হল। এবার পুস্তাকাকারে প্রকাশের পালা। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। একেবারে তিনজন প্রথম শ্রেণীর প্রকাশক উপন্যাসটির প্রকাশ-স্বত্ব চাইলেন।

প্রকাশ করলেন দিগন্ত পাবলিশার্স। রূপান্তরিত নাম 'ইরাবতী'। উৎসর্গ করলাম আমার একদা-সহপাঠী ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ও স্বাধীন বর্মার প্রথম শহীদ আ উং সানকে। বইটি যথেষ্ট খ্যাতি পেল। বিক্রিও মন্দ হল না। সকল শ্রেণীর পত্রিকায় সমালোচনাও বেরোলো প্রশংসাসূচক।

এমনই সময়ে 'দেশ' অফিসে ছোট্ট একটি ঘটনা আমি জীবনে ভুলব না।

'দেশ'-সম্পাদক নেই। শান্তি-নিকেতন গিয়েছেন। সে খবর জানা ছিল না, ফিরে আসছিলাম, হঠাৎ সিঁড়ির কাছে মৃদুকণ্ঠের আহ্বান, শুনুন।

ফিরে চাইলাম।

আধময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবী আর কাপড় পরা নাতিদীর্ঘ একটি মানুষ। সাধারণ চেহারা। শীর্ণকায়, কিন্তু উজ্জ্বল দুটি চোখ।

আমায় কিছু বললেন ?

হ্যাঁ, আপনার 'ইরাবতী' আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি 'দেশ' আর 'কৃষক' পত্রিকায় বইটির সমালোচনাও করেছি।

আরো একটু কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোকের টেবিলে এক গাদা প্রুফ। সেগুলো দু হাতে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন।

খুব আস্তে, প্রায় অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, আমারও অনেক দিনের ইচ্ছা এক নদীকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখি। আমার জানা এক নদী, খুব চেনা, কিন্তু একেবারে সময় পাচ্ছি না। কিছু কিছু লেখা হয়েছে।

এতক্ষণ ভাবছিলাম ভদ্রলোক সম্ভবতঃ প্রুফরিডার কিংবা আনন্দবাজার পত্রিকার কোন বিভাগের কেরানী, কিন্তু তিনি লেখক শুনে আরো কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। উজ্জ্বল দুটি চোখের নতুন অর্থ খুঁজে পেলাম।

আপনার নাম ?

টেবিলের দিকে চোখ রেখে খুব মৃদুগলায় উচ্চারিত হল, অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের দুটি হাত জড়িয়ে ধরলাম, আরে, আমি যে আপনার কবিতার খুব ভক্ত ছিলাম। 'ছোটদের লেখা' পত্রিকায় আপনার কয়েকটা কবিতা পড়েছি।

আমার হাতের মধ্যে ভদ্রলোকের হাতটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

তার অনেক পরে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

তার আগেই গ্রন্থকার লোকান্তরিত হয়েছিলেন। ক্ষয়রোগ দুর্বার এক প্রাণশক্তি, দুর্জয় এক প্রতিভাকে নিঃশেষিত করেছিল।

কয়েকদিন পর একদল সাহিত্যিক অফিসে এসে হাজির। এখন তাঁদের মধ্যে অনেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু তখন তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন উদীয়মান। শুধু সম্ভাবনা মাত্র।

নতুন এক প্রচেষ্টার বাণী তাঁরা বহন করে নিয়ে এলেন। সাহিত্যিকরা নিজেরা পত্রিকা প্রকাশ করবেন। নিজেদের কথা, নিজেদের ব্যথা রূপায়িত করবেন সেই পত্রিকায়। কোন পত্রিকার দলীয় নীতির যূপকাষ্ঠে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বলি দেবেন না।

উত্তম প্রস্তাব। শুধু আকাশচারী কল্পনা দিয়ে সবকিছু করা যায় না, যেমন যায় না আদর্শবাদের উনানে রুটি সেঁকা। অর্থ চাই, ব্যবসায়িক বুদ্ধি চাই, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করার দক্ষতা থাকা চাই।

সব ঠিক আছে। সাহিত্যিকরা কলরব করে উঠলেন। পত্রিকার নাম 'অভিবাদন'। উপদেষ্টা সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজী হয়ে গেলাম। আমার কাজ হবে বছরে কয়েকটা গল্প দেওয়া। বিনামূল্যে।

তিনটি গল্প লিখেছিলাম। রোদ ইঁদুর আর জাত সাপ। পত্রিকাটির প্রতি আমাদের সকলেরই বেশ একটু মমতাবোধ জেগে উঠেছিল। পত্রিকা প্রকাশের দিন গুনতাম। পত্রিকাটি হাতে পেলে রুদ্ধনিশ্বাসে পড়ে যেতাম মলাট থেকে মলাট। আলোচনা করতাম অন্যের রচনা নিয়ে। অন্য কেউ পত্রিকাটির সমালোচনা করলে শুধু ফণাই তুলতাম না, ছোবল দেবার চেষ্টাও করতাম।

আবার একদিন 'অভিবাদন'-এর কমকর্তারা এসে হাজির। এবার অফিসে নয়, বাড়িতে। সাহিত্যের ব্যাপার নয়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন 'অভিবাদন' গোষ্ঠিকে তার বাড়িতে। বৈকালিক জলযোগ সহযোগে সাহিত্য-আলোচনা। আহারের বিষয়ে আমার ঝোঁক চিরদিনই কম, উল্লসিত হলাম অন্য কারণে।

নিষ্ঠা ও মানবিক আবেদনে তারাশঙ্করের সাহিত্য অজেয়-কীর্তি। প্রত্যেকটি সৃষ্ট চরিত্র তাঁর হৃদয়রসনিষিক্ত। রূঢ় বাংলার রুক্ষ গৈরিক রূপের পাশাপাশি কোমল ফল্গুধারার মতন মেদুর নারী চরিত্রের অমিয় বিকাশ। তারাশঙ্কর আমার প্রিয় সাহিত্যিক। খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের ঘিরে থাকে উন্নাসিকতার বলয়, এমন একটা অপবাদ বহুদিন ধরেই শুনে এসেছি, তাই ইচ্ছা থাকলেও তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি নি।

তারাশঙ্কর নিজে ডেকেছেন আমাদের। কাছে যাব, বসব মুখো-মুখি এটুকু সঞ্চয়ও আমার পক্ষে কম নয়। এ যেন মহেশ্বরের জটায় সংগুপ্ত স্রোতোধারার সমতল ভূমিতে নেমে আসা। সাধারণের স্পর্শযোগ্য হয়ে।

বেশ একটু সাজগোজ করেই গেলাম। অফিসের পোশাক ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি অঙ্গে চড়িয়ে।

উত্তেজনা আর উৎসাহে একটু আগেই গিয়ে পড়েছিলাম। সাহিত্যিক সমাগম তখনও বিশেষ হয় নি। গুটি তিনচার ভদ্রলোক বসেছিলেন। আমার অচেনা।

গিয়ে বসবামাত্র ভিতরের দরজায় একটি ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। পরনে গেঞ্জি আর ধুতি। গেঞ্জির মধ্যে দিয়েও মালার আকারে পৈতাটা পরিস্ফুট। ঈষৎ তামাটে রং। খুব সাধারণ চেহারা, কিন্তু তবু হাজার মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতন নয়। তার কারণ দুটি চোখ। এ দৃষ্টি যেন শুধু ত্বকের আবরণেই শেষ হয় না, চর্মভেদ করে ভিতরের মানুষটাকে দেখার প্রয়াসী। শুধু মানুষই নয়, সমাজ, লোকাচার, তন্ত্র, মন্ত্র সব কিছু তন্ন তন্ন করে দেখতে চায়, তাই কবিয়াল, বাউল, তান্ত্রিক, বেদেনী, বাজীকর নতুন রূপে এসে ভিড় করেছে আমাদের সাহিত্যে। তাদের বাইরের পোশাকটুকু গৌণ, তাদের মানবসত্তা রূপে রেখায় সমুজ্জ্বল।

চোখ তুলে দেখলাম ভদ্রলোক আমার দিকেই চেয়ে রয়েছেন।

বুঝলাম সমবেত অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে, আমার পরিচয় চাইলেন।

পরিচয় করিয়ে দেবার মতন কেউ ছিল না, তাই নিজেই বললাম, আমি হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

আমি তারাশঙ্কর। তিনি স্মিত হাসলেন।

হেঁট হয়ে প্রণাম করতেই একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে আলিঙ্গনে কৃত্রিমতা নেই। তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ সঞ্চারিত করলেন আমার হৃদয়ে।

বললেন, এদিকে ওদিকে পড়েছি আপনার লেখা। বর্মাদেশ নিয়ে লিখছেন। ওদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে আপনার?

ঘাড় নাড়লাম, আমি শিশুকাল থেকেই বর্মাদেশে মানুষ। উনিশশো চল্লিশ সালে এদেশে ফিরেছি।

আপনার লেখা দেখেই মনে হয়, এসব চরিত্র আপনার চোখে দেখা। খুব ভাল কথা। যেটুকু জানেন, যতটুকু জানেন, সেইটুকুই লিখবেন। ফাঁকি দিতে গেলে সাহিত্যে ফাঁক থেকে যায়। সে ব্যবসায়ে শুধু পাঠক ঠকানোই নয়, নিজেকেও ঠকতে হয়।

মনে হল এ সব কথা তারাশঙ্করবাবুরই বলবার অধিকার আছে। সাহিত্য এঁর নিছক নেশা নয়, জীবনের সাধনা। তপস্যার সগোত্র। অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষকে নিংড়ে নির্যাসটুকু বের করে নিয়েছেন। এক সংঘাত থেকে আর এক সংঘাতের রূঢ় বাস্তবের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র, তাদের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, দীনতা, মহত্ব, অন্ধসংস্কার, ধর্মবিশ্বাস নিয়ে। তারাশঙ্করের ভূমিকা সূত্রধরের ভূমিকা নয়, তিনি প্রতিটি সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের বন্ধু তারাশঙ্কর, বিশেষ করে আর্ত, ব্যথিতের সহায়। এর চেয়ে বড় পরিচয় বুঝি সাহিত্যিক তারাশঙ্করের নেই।

কিন্তু সে সন্ধ্যায় সাহিত্যিক তারাশঙ্করের চেয়েও আরো কাছাকাছি পেয়েছিলাম মানুষ তারাশঙ্করকে। ভোগের অফুরন্ত আয়োজন।

তারাশঙ্করবাবু নিজে এসে দাঁড়ালেন প্রত্যেকের সামনে। গৃহস্থ যেমন দাঁড়ান নিমন্ত্রিতদের কাছে। অনুযোগ করলেন, পরিহাস করলেন, মাঝে মাঝে মধুর মন্তব্যও।

মনে হল সাহিত্যিকদের মধ্যে বয়সের ভেদাভেদ থাকে না, ধর্মেরও নয়, জাতেরও না। যে পথের প্রথমে তারাশঙ্কর, আমরা সে পথের একেবারে শেষ ভাগে, তবু দুস্তর সে ব্যবধান উধাও হয়ে গেল। সেতু-বন্ধন করল তারাশঙ্করের অমায়িক ব্যবহার।

উঠতে ইচ্ছা করছিল না, তবু উঠতে হল এক সময়ে।

তারাশঙ্করবাবুর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বললাম, একবার অনুগ্রহ করে পায়ের ধুলো দেবেন আমাদের বাড়ি। ঠিকানাও দিলাম।

সহাস্যবদনে ঘাড় নাড়লেন, হ্যাঁ যাব, নিশ্চয় যাব। একটা কাজ হাতে আছে, সেটা শেষ হলেই এদিক-ওদিক বেরোব।

অনেকদিন পর। সন্ধ্যার দিকে ছাদে ইজিচেয়ার পেতে একটা ইংরাজী শিকার-কাহিনী পড়ছি। লেখকের নামও হাণ্টার। রচনার গুণে শিকার-কাহিনীও কেমন সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ওঠে, হাতের নভেলটি বোধহয় তার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন। গণ্ডার-দম্পতির পূর্বরাগের কাহিনী পড়তে পড়তে কলকাতার পার্কে চুরি করে দেখা প্রণয়ী-যুগলের কথা মনে পড়ে যায়। হাতিকে যাঁরা বুদ্ধিহীন আখ্যা দেন, এ কাহিনী পড়লে তাঁরা নিজেদের বুদ্ধির স্বল্পতার কথা ভেবে লজ্জিত হবেন। প্যান্থারের বিরহ, চাঁদিনী রাতে জেব্রা-মিথুনের ভীরু প্রেম, কুরঙ্গ-কুরঙ্গীর মান-অভিমানের পালা নিপুণ রচনাপ্রসাদে চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ কলিং-বেলের শব্দ, সেই সঙ্গে গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, হরিনারায়ণ আছ ?

আমি তিনতলা থেকে নীচে নামবার আগেই আমাদের ভৃত্য দরজা খুলে বাইরের ঘরে ভদ্রলোককে বসিয়ে ওপরে আমাকে খবর দিতে আসছিল, মাঝপথে আমার সঙ্গে দেখা।

কে এসেছেন ?

কি জানি বাবু, নামটা কি বললেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সোফার ওপরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাকে দেখে হাসলেন, তোমাকে বলেছিলাম আসব, তা সময়ই করে উঠতে পারছি না। দশ রকমের ঝামেলায় জড়িয়ে থাকি।

এ আমার কল্পনারও অতীত। তাঁকে আসতে অবশ্য বলেছিলাম। সেটা নিতান্ত সাধারণভাবে। ভাবতেও পারিনি তিনি মনে করে এতটা পথ উজান বেয়ে আমার কাছে আসবেন। টালা থেকে টালিগঞ্জ, পথটা বড় কম নয়। গাড়ি থাকলেও।

আমার শ্রীমতীকে ডেকে আনলাম। প্রণাম করলাম দুজনে। তারপর কথক তারাশঙ্করকে ঘিরে নানা আলোচনা। সামান্য কথাও এমন মনোজ্ঞভাবে বলতে আর কোন সাহিত্যিক পারেন জানি না।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাপের বাড়ি কোথায় বৌমা ?

শ্রীমতী সুযোগ ছাড়লেন না। বললেন, আমার বাপের বাড়ি ভবানীপুর। খাস শহরে। টালিগঞ্জের কথা আর বলবেন না। আকাশে মেঘ করলেই পথ-ঘাট জল থৈ-থৈ করে। রাতে শিয়ালের ডাক। এ তো পাড়াগাঁ। অন্তত এতদিন পাড়া গাঁ-ই ছিল, সবে আধাশহর হতে শুরু করেছে।

তারাশঙ্করবাবু মুচকি মুচকি হাসলেন। শ্রীমতীর কথা শেষ হতে একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুলে বললেন, শোন বউমা তাহলে। চারপাশে রাংচিতার বেড়া, ছোট ছোট কুঁড়ে। মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল। চারদিকে এঁদো পচা ডোবা। ঘন বাঁশঝাড়। রাতের কথা ছেড়ে দাও, দিনেই শেয়াল ঘোরে। গৃহস্থের ঘরের আনাচে কানাচে। সরু মেটে পথ। একটা শুধু

পাকা শড়ক ছিল। এই হচ্ছে তোমার শহর ভবানীপুর। এ চেহারা আমাদের চোখে দেখা। আমি বহুদিন দক্ষিণ অঞ্চলে ছিলাম। ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে। তখন কালীঘাটের এদিকে বিশেষ বসতি ছিল না। কেউ আসতেও চাইত না।

গ্রাম-কলকাতার কাহিনী ফাঁদলেন তারাশঙ্কর, তাঁর অনন্থকরণীয় ভঙ্গীতে আর অপূর্ব ভাষায়।

মুহূর্তগুলো যেন ডানা মেলে উড়ে পালাল।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দুজনে বসে বসে শুনতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে কথাটা শ্রীমতীর মনে পড়ে গেল।

বললেন, দয়া করে পায়ের ধুলো যখন দিয়েছেন তখন আমার ছেলের একটা নাম দিয়ে যান।

তারাশঙ্কর সহাস্যে আমার দিকে চাইতেই বিপদ গুনলাম। আমার নিজের নামটি বিশেষ সুখশ্রাব্য নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কথাই মনে করিয়ে দেয়।

উত্তরকালে বহু পাঠক-পাঠিকার কাছে লজ্জায় পড়েছি। এই নাম নিয়ে।

লেখা পড়ে, ঠিকানা জোগাড় করে অনেকে বাড়িতে দেখা করতে এসে অপ্রস্তুত হয়েছেন। বলেছেন, আপনার নামটা শুনে আপনার বয়স একটু বেশিই মনে করেছিলাম।

তাঁদের চেয়েও বেশি অপ্রস্তুত হয়ে আমি বলেছি, আমার সাহিত্যের জন্য আমি যতটা দায়ী, আমার নামের জন্য ততটা নয়। ওটা রাম না হতে রামায়ণ রচনার ব্যাপার না হলেও আমার ভূমিষ্ঠ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নামকরণ হয়েছিল। নাম রেখেছিলেন আমার পিতামহী। বোধহয় আশা ছিল অন্তিমকালে এই নাম উচ্চারণ করে নাতীকে ডাকবেন, আর পরকালের পথও খোলসা করবেন। রথ দেখা আর কলা বেচার সামিল। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয় নি।

মারা গেলেন দুর্গাপূজার বোধনের দিন। বাড়িতে পূজা। মিস্ত্রিরা বাড়ি মেরামত করছিল। তাঁর নির্দেশ ছিল, রাত জেগেও কাজ শেষ করে দিতে হবে। পরের দিন পূজা শুরু।

· প্রদীপ দেখাতে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাচ্ছিলেন, ছাদের কিছুটা অংশ ভেঙে পড়ল মাথায়। নাতির নাম-স্মরণের আর অবকাশ পেলেন না। শুধু চিৎকার করে বললেন, ওরে তোরা একি করলি রে, মায়ের পূজা যে বাকি রয়ে গেল।

মারা গেলেন হাসপাতালে। মহাষষ্ঠীর দিন। ঠাকুমা আর প্রতিমাকে একসঙ্গেই বিসর্জন দেওয়া হল। সেই থেকে বাড়িতে পূজা বন্ধ।

দু একজন তরুণী পাঠিকা সংগোপনে নাম পাল্টাবার উপদেশও দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ আরও কয়েকটি খ্যাতিমান সাহিত্যিকের নজির দেখিয়েছেন। যাঁরা পুরনো নামের খোলস ছেড়ে আধুনিক নাম নিয়েছেন।

কিন্তু তাঁদের মনোরঞ্জন করতেও পারি নি। কারণ বোধ হয় নামটার মতন আমার মনটাও পুরোনো। হঠাৎ কোন পরিবর্তনে সাড়া দিতে নারাজ। ফলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতন নামটাও রয়ে গিয়েছে।

তাই তারাশঙ্কর আমার দিকে চাইতেই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কি জানি আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে যদি শিবনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ কিংবা বদ্রীনারায়ণ রেখে বসেন, তাহলে উত্তরকালে পুত্র আমাকে ক্ষমা করবে না। পিতার দুর্ভোগ তার ওপর গিয়ে পড়বে।

সেইজন্য বলেই বসলাম, দেখবেন, আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে যেন কিছু রাখবেন না।

তারাশঙ্কর হাসলেন, কেন, তোমার নামটা কি খারাপ?

খারাপ কিনা জানি না, তবে যুগের সঙ্গে, বয়সের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

কথাটা বলেই কথার অন্তঃসারশূন্যতাটুকু উপলব্ধি করলাম। বয়স একটা বিশেষ কোঠায় বসে থাকে না। বাড়ে। সেই জন্যই বয়সের সঙ্গে কোন নামই খাপ খায় না। খেতে পারে না। তাই দু'বছরের মেয়ের নাম হয় বুড়ি, আবার চল্লিশ বছরের পাঁচ ছেলে-মেয়ের মা-র নামও শুনি খুকি, বেবি। বাড়ির পাচকের নাম হৃদয়বল্লভ, বাড়ির বাবু অনাথকুমার।

যুগও পরিবর্তনশীল। তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হলে অহরহ নামও পাল্টাতে হয়। কিছুদিন আগেও এক বিপদে পড়েছিলাম। এক রবিবারের সকালে একটি বৃদ্ধ এসে হাজির। অবসরপ্রাপ্ত হাকিম। প্রায় অথর্ব, ভৃত্যের হাত ধরে এসেছেন।

তাঁর মেয়েদের মারফৎ আমার কিছু বই পড়েছেন, কারণ নিজের দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ।

আমাকে দেখেই ভদ্রলোক হতবাক। আপাদমস্তক বার কয়েক নিরীক্ষণ করে বললেন, হরিনারায়ণবাবু বাড়ি নেই?

বিনীত কণ্ঠে বললাম, আমিই হরিনারায়ণবাবু, কি দরকার বলুন?

আপনি? ভদ্রলোক ঢোঁক গিললেন। সামলে নিলেন নিজেকে। অন্য কথা পাড়লেন। বাংলা গল্প-উপন্যাসের কথা। আমার বেতারের ভাষণ ওঁর ভাল লাগে তাও বললেন। আসল কথাটা বললেন ওঠবার মুখে।

আমার ধারণা ছিল আপনি বেশ বয়স্ক লোক, সেইজন্য আপনার লেখার সঙ্গে আপনার বয়সটাকে মেলাতে পারছিলাম না। মেয়েদেরও সে কথা বলেছি, ভদ্রলোক এত বয়সেও অমন উগ্র রোমান্টিক কাহিনী লেখেন কি করে।

আমার আসল বয়স জেনে ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হয়তো আমাকে উপদেশ দিতেই এসেছিলেন। এই বয়সে ওই ধরনের রচনা ছেড়ে ধর্ম বিষয়ে লিখতে, গীতাভাষ্য কিংবা ঈশ্বরতত্ত্ব।

ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই তারাশঙ্কর উঠে দাঁড়ালেন।

চলি হরিনারায়ণ। অনেক রাত হয়ে গেছে। তোমার ছেলের নাম আমি চিঠিতে জানাব।

কিছুদিন পরেই চিঠি এল। ৮ই জুন উনিশশো তিপ্পান্ন সাল।

নানাকথার মধ্যে লিখেছেন, 'তোমার ছেলের নাম যেন চেয়েছিলে সেদিন। অভিজিত কেমন লাগে? নয়তো অজয় কি অশোক?'

সকলের অশোক নামটাই ভাল লাগল। ঐতিহাসিক নাম বলেই নয়, নামটা নাকি খুব সুলক্ষণযুক্ত। সিনেমা থেকে শুরু করে শিক্ষা-বিভাগের কৃতীলোকের ওই নাম।

কিছুদিন আগেই সস্ত্রীক বেড়াতে গিয়েছিলাম খড়গপুরে। অমিতা বৌদির কাছে। সেখানে এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-সভায় সভাপতিত্ব করলেন অশোক। অনুরূপা দেবীর পুত্র। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলেদের তালিকার মধ্যেও অশোক নামের প্রাধান্য বেশি। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কৃতবিদ্য কয়েকজনেরও ওই নাম।

সুতরাং গৃহিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। ছেলের নাম রাখা হল অশোক। সে কথা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো হল।

তিনি পত্রের উত্তর দিলেন সতেরোই জুন।

লিখলেন, ছেলের নাম অশোক রেখেছ। সুখী হয়েছি। অশোক অভয় এই দুটি মানুষের জীবনে পরম অমৃত। তোমার ছেলের জীবনে ওই দুটির স্পর্শ সঞ্চারিত হোক।

তারপর বহুবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। যতবার কাছে গেছি, বুকে টেনে নিয়েছেন। বাড়ির সকলের খোঁজ করেছেন। তাঁর অনেক বই নাম-সই করে দিয়েছেন আমাকে। আরো আশ্চর্যের কথা, মতামত জিজ্ঞাসা করেছেন।

কাগজে দেখলাম 'আরোগ্য নিকেতন' পুরস্কার পেয়েছে; বইটা তিনি আগেই আমাকে দিয়েছিলেন। কেমন লেগেছে, জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নিজের বিদ্যা এবং বুদ্ধি অনুযায়ী মতামতটা তাঁকে জানিয়েও ছিলাম।

ভাবলাম, পুরস্কার-প্রাপ্তিতে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা চিঠি লিখি। লিখলামও তাই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কোন উত্তর এল না।

এর আগে চিঠি লেখার সাত দিনের মধ্যেই উত্তর আসত। কোনদিন এর ব্যতিক্রম হয়নি। ভাবলাম, আমার মত লোকের পক্ষে তাঁকে অভিনন্দন জানাবার চেষ্টা হয়তো ধৃষ্টতাই হয়েছে, তাই তাঁর এই নীরবতা। কিংবা হয়তো তিনি এসব পছন্দ করেন না। সাহিত্যিক একান্তে বসে তাঁর সাহিত্য রচনা করেন, বুকের রক্ত দিয়ে। এ রচনা তাঁর প্রাণের জিনিস। তাঁর নিভৃতের সাধনা। একে টেনে হাটের মাঝখানে নিয়ে এসে হৈ-চৈ করাটা অনেকে অপছন্দ করেন। সাহিত্যিকের সবচেয়ে বড় পুরস্কার তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগা, বাইরে থেকে সম্মানের বোঝা চাপানোটা তাঁরা তপস্যার ব্যাঘাতের সমগোত্রীয় বলে মনে করেন।

দিন কয়েক চিন্তা করলাম—তারপর তাঁকে আর একটা চিঠি দিলাম।

এবার উত্তর এল। খুবই তাড়াতাড়ি।

আমার প্রীতি-সম্ভাষণ গ্রহণ কর। তোমার দ্বিতীয় পত্র পেলাম। প্রথম পত্র পাই নি। তাতে আপশোষ অবশ্যই আছে, কিন্তু তা নিয়ে দুঃখ নেই, কারণ, আমি তো তোমাকে জানি। তুমি যে খুশি হবে এতে আমার সংশয় নেই। আমার জন্য যারা সত্যি চোখের জল ফেলবে একদিন, তুমি যে তাদের একজন।

এ চিঠির তারিখ ১৯শে এপ্রিল, উনিশশো পঞ্চান্ন।

আটই শ্রাবণ তারাশঙ্করের জন্মদিন। এই দিনটিতে তাঁর টালার বাড়ি তীর্থে পরিণত হয়। সকাল থেকে অনুজ সাহিত্যিক আর ভক্তদের আনাগোনা। অনেক রাত পর্যন্ত বাড়ি সরগরম। যাঁরা এই পুণ্যতীর্থে এই সমাগমে যোগদান করেছেন, তাঁরাই জানেন এই প্রীতি আর ভক্তির উৎস কত অকৃত্রিম।

আমি নিজে এই দিনটিতে তারাশঙ্করের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো একটা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি। শুধু জন্মদিনে এক মনীষীকে সংবর্ধনা জানানোই নয়, তাঁর পূতস্পর্শে নতুন করে প্রেরণা লাভ। এই নিরলস, নিরহঙ্কার, নিষ্ঠাবান, সাহিত্যব্রতীকে আমার আদর্শপ্রতিম বলে মনে করি, তাই বার বার তাঁকে ছুঁয়ে নিজের সাহিত্যজীবন শুরু করতে ইচ্ছা হয়।

এই রকম নিরহঙ্কার, শিশুচিত্ত আর একটি সাহিত্যিককে দেখেছিলাম। শুধু একটিবারের জন্য।

শেয়ারের ব্যাপারীদের যেমন শেয়ারমার্কেট, জুয়াড়ীদের যেমন রেসের মাঠ, লেখকদের তেমনি কলেজ স্ট্রীট। এটা প্রায় আমাদের জমিদারী। ইদানীং বহুবাজার স্ট্রীট থেকে গ্রে স্ট্রীট পর্যন্ত ছড়ান। নামী অনামী অসংখ্য প্রকাশক। পাঠ্যপুস্তকের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকজন সাহিত্যের কেতাবেও মনোযোগী হয়েছেন। সাহিত্যিকদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়িয়ে বই জোগাড় করেন, তারপর অবশ্য সাহিত্যিকদের তাঁদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হয় দর্শনীর জন্য। আশার কথা, এঁদের সংখ্যা অল্প।

আবার অনেক বনেদী প্রকাশক আছেন, যাঁদের কাছে সাহিত্যিকরা সাগ্রহে বই দেন। বইয়ের কাটতি আর রুপোর চাকতি দুটোর সম্বন্ধেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তার ওপর প্রকাশকদের ভদ্র ব্যবহার তো উপরি পাওনা।

মিত্র-ঘোষ এই ধরনের এক অভিজাত প্রকাশক। তখনও আমার সঙ্গে তাঁদের বিশেষ যোগাযোগ হয়নি।

আমার সম্বল মাত্র 'ইরাবতী'। প্রকাশ করেছেন দিগন্ত পাবলিশার্স। তাঁদের ছাউনী কলেজ স্ট্রীট থেকে বহু দূরে।

কেবল বাজার দেখার উদ্দেশ্যেই কলেজ স্ট্রীটে গেছি। সঙ্গে আছেন কল্লোল যুগের এক খ্যাতনামা কবি। সনেটে যাঁর অপ্রতিহত প্রতাপ।

এ দোকান সে দোকান ঘুরে মিত্র-ঘোষের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট তরী। কিছু লোক উপচে পড়ছে বাইরে। দেখলাম লম্বা টেবিলের ওপর ঈষৎ স্থূলকায় একটি ভদ্রলোক বসে। গলায় খবরের কাগজ আঁটা। একটি নরসুন্দর ক্ষৌরকর্ম করে যাচ্ছে। তাতে ভদ্রলোকের কোন অসুবিধা নেই। সামনে আশপাশের লোকের সঙ্গে গল্প করে যাচ্ছেন।

সঙ্গের কবি আঙুল দিয়ে দেখালেন, চেনেন ওঁকে?

ঘাড় নেড়ে বললাম, না।

সে কি! উনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের উঁকি-ঝুঁকি বিভূতিবাবুর চোখ এড়াল না। তিনি ইশারায় নাপিতকে থামিয়ে বললেন, কি ব্যাপার, বাইরে কেন, ভিতরে আসুন।

ভিতরে মানে সিঁড়ির ধাপ অবধি যাওয়া চলে।

বিভূতিবাবু কবির দিকে ফিরে বললেন, ইনি কে? অর্থাৎ আমি।

আমার পরিচয় দেওয়া হল।

এবার বিভূতিবাবু সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কোথায় থাকেন?

নিবাস বললাম।

ও পাড়ায় তো আমাদের কালিদা থাকেন। শ্রীকালিদাস রায়।

বললাম, হ্যাঁ। আমি তাঁর কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকি।

তাই নাকি, বেশ। আমি মাঝে মাঝে যাই কালিদার বাড়ি। এবার গেলে আপনার ওখানেও যাব।

বিস্মিত হলাম। বিভূতিবাবু খ্যাতনামা লেখক। এ দেশের প্রথম শ্রেণীর একজন। আমি প্রায় অখ্যাতনামা, অন্ততঃ তখন তো বটেই। তিনি নিজে আসতে স্বীকার করলেন আমার বাড়ি, এ আমার চিন্তারও অতীত।

বললাম, যদি আসেন দয়া করে কৃতার্থ হব।

কৃতার্থ-টিতার্থ নয় ভাই। তেলমাখা মুড়ির বন্দোবস্ত রাখবেন। চায়ের সঙ্গে খুব জমবে। এক রবিবারের সকালে বসে সাহিত্য করা যাবে।

ইতিমধ্যে বোধহয় নাপিতটি অন্য গণ্ড আক্রমণ করেছিল, বিভূতি-বাবু ক্ষেপে উঠলেন, তুমি কি আরম্ভ করেছ কি? তোমার জ্বালায় কি ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলতে পারব না?

নাপিতের মুখের অবস্থা দেখে মনে হল বেচারী বোধহয় বহুক্ষণ ধরে ক্ষৌরকর্ম শেষ করার চেষ্টা করছে, অনর্গল কথা বলার জন্য সুবিধা করে উঠতে পারছে না। কোনরকমে একটা গাল শেষ করে এনেছে, অন্য গাল ভর্তি সাবানের ফেনা।

বলুন তো ভাই আপনার ঠিকানাটা। দাঁড়ান, ডায়েরীটা বের করি।

পাঞ্জাবীর পকেট হাতড়ে ছোট একটা ডায়েরী বের করলেন। কড়ে আঙুলের মাপের একটা পেন্সিল। ঠিকানাটা টুকে নিলেন।

আমার আর দাঁড়াতে সাহস হল না। নাপিতের সামনে ব্রহ্ম-রক্তপাত হবে, এই ভেবে বিদায় নিয়ে সরে এলাম দোকান থেকে।

আশা করেছিলাম, তারাশঙ্করের মতন বিভূতিভূষণও একদিন পায়ের ধুলো দেবেন। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে।

বাড়িতে মুড়ি খাওয়ার খুব রেওয়াজ ছিল না, তাও মুড়ি কিনে রেখেছিলাম। দু-একজন সাহিত্যিক বন্ধুদের বলেও রেখেছিলাম। রবিবার সকালে সাহিত্য মজলিসের ব্যাপারটা।

বিভূতিভূষণ হয়তো আসতেন। তাঁর মত সরল, নিরহঙ্কার মানুষ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন না, কিন্তু এই ঘটনার কিছু পরেই আরো দূরের ডাক পেয়ে বিভূতিভূষণ রওনা হয়ে গেলেন। কাছের ঠিকানায় আসা আর তাঁর হয়ে উঠল না।

সাল মনে নেই, স্থান বর্মা আর চীনের এক সীমান্ত শহর। নাম টাউনজী। পরীক্ষা শেষ করে বেড়াতে এসেছি। হাতে অফুরন্ত সময়। কাটতে আর চায় না।

অন্ধকার নামলেই আর জ্ঞান থাকে না। এই বন আর পাহাড়ের দেশে অন্ধকারটা একটু তাড়াতাড়িই নামে। কেলেমাজিদির ঝোপে ঝোপে জোনাকি জ্বলার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে পড়ি। দ্রুতপায়ে এগিয়ে যাই। লক্ষ্য চৌধুরী মেডিকেল হল।

বড় রাস্তার ওপর ছোটখাটো দোকান। যতগুলো আলমারি ওষুধ সেই অনুপাতে অনেক কম। ডাক্তার চৌধুরী এ নিয়ে আক্ষেপও করেন। এমন দেশে এসে দোকান পাতলুম মশাই, যে রোগ বালাইয়ের নাম নেই। কারুর একটু মাথা পর্যন্ত ধরে না। দশ বছর আছি, দু-মাইলের মধ্যে কাউকে কাশতে শুনিনি।

সন্ধ্যা হলেই সেখানে বেশ একটু ছোটখাট ভিড়। রোগী কেউই নয়, সবাই আসে কাগজের লোভে। বাংলা কাগজ। বিকেলের বাসে কাগজ দিয়ে যায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাগাভাগি হয়ে যায়। এক একজনের হাতে এক একটা পাতা। আবার অনেক সময়ে একটা পাতার ওপরও একাধিক লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

কাগজ পড়ার লোভ আমার ষোল আনা, কিন্তু ঠেলাঠেলিতে দারুণ বিতৃষ্ণা। সেই জন্যই সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামলে তবে এখানে এসে দাঁড়াই। উদ্দেশ্য ততক্ষণে বুড়োদের খবরের কাগজ পড়া শেষ হয়ে যাবে।

সেদিন কিন্তু অবস্থা চরমে। বোধহয় কংগ্রেসের কোন জোর খবর ছিল। নেতারা মাথা পেতে দিয়েছেন পুলিসের লাঠির সামনে কিন্তু মাথা নিচু করেন নি। কিংবা হয়তো ঝুলি থেকে ইংরেজ নতুন কোন রঙে-চঙে খেলনা বের করে দেখাচ্ছে ভারতবাসীদের, যাতে কিছুক্ষণের জন্যও তারা হৈ-চৈটা বন্ধ রাখে। প্রত্যেকটি চেয়ার ভর্তি। বুড়োরা কাগজ আঁকড়ে বসে আছেন। রাতের মধ্যে

ছাড়বেন, এমন আশা কম। তু একবার কাগজের দিকে উঁকি দিতে গিয়ে কয়েকজনের রোষকষায়িত দৃষ্টির মুখোমুখি পড়লাম।

সরে গিয়ে কোণে রাখা বেঞ্চটার ওপর বসলাম। কাচভাঙা আলমারি ঠেস দিয়ে। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কি এমন জরুরী খবর কাগজের পাতায় পাতায় জানতে না পারলে সুনিদ্রা হওয়ার ভরসা কম।

কিছুক্ষণ বসে থেকে আলমারির দিকে চোখ ফেরালাম। এ পাশে গোটা চারেক ওষুধের শিশি। নানা রঙের। ও পাশে গোটা তুয়েক বই পাশাপাশি রাখা। পাল্লা খোলার দরকার হল না, ভাঙা কাঁচের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মোটা বইটা বের করে নিলাম। মেটিরিয়া মেডিকা। তার নিচে কাশীরামের মহাভারত। মাঝখানে মলাট ছেঁড়া বিবর্ণ একটা পত্রিকা।

তখন বাংলা বইয়ের ব্যাপারে আমি সর্বভুক্। বাছ-বিচার নেই, জাত বিচারও নয়। টেনে পত্রিকাটা বের করলাম। কয়েক পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ল অদ্ভুত নামের একটি গল্প। ফার্স্টবুক ও চিত্রাঙ্গদা। ফার্স্টবুক শেষ করেছি অনেক বছর আগে, চিত্রাঙ্গদা ধরবার বয়স, কাজেই গল্পের নামেতেই মজে গেলাম। তারপর আধ ঘণ্টা আর জ্ঞান নেই। দ্রুত নিশ্বাসে একটা লাইন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছি অপর-লাইনে। পাতা ওল্টাবার দেরীটুকুও যেন অসহ্য। একেবারে শেষ লাইনে এসে যখন থামলাম তখন আমি বেঞ্চ-চেয়ার-আলমারী ঘেরা ছোট প্রকোষ্ঠে আর নেই। খবরের কাগজ নিয়ে ভাগাভাগি করে পড়ার মনটুকুও উধাও। রূপ আর রস, বর্ণ আর গন্ধের আর এক জগতে তখন গিয়ে পৌঁচেছি। পশু মাস্টারের বেদনা সঞ্চারিত হয়েছে আমারও বুকে। তাই বিড়বিড় করে বার বার উচ্চারণ করলাম,

One night when the wind was high a small bird flew into mv room.

পশু মাস্টারের স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গ।

বুড়োদের কাগজ পড়া তখনও শেষ হয়নি। না হোক, খবরের কাগজের ওপর আর আমার একটুও লোভ নেই। সেই জরাজীর্ণ পত্রিকাটি যেন কৌস্তুভ মণি এইভাবে বুকে আঁকড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

ডাক্তার চৌধুরী সামনের রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছিলেন, কারণ তাঁর চেয়ারটিও বেদখল। কাছে গিয়ে মৃদু গলায় বললাম, এই পত্রিকাটা নিয়ে যাচ্ছি। কাল সকালে ফেরত দেব।

পুরু চশমার ফাঁক দিয়ে তিনি প্রথমে আমাকে দেখলেন, তারপর পত্রিকাটি। আমার হাত থেকে পত্রিকাটি টেনে নিয়ে দু একপাতা উল্টিয়ে দেখে বললেন, কি কাগজ এটা? অ, প্রবাসী, ঠিক আছে নিয়ে যাও, এটা আর তোমাকে ফেরত দিতে হবে না।

পত্রিকাটি হাতে নিয়ে তীরবেগে ছুটলাম। কী জানি ডাক্তার চৌধুরী যদি হঠাৎ মত পরিবর্তন করেন।

বাড়ি এসে খাওয়া-দাওয়ার পরে আবার পড়লাম গল্পটা। দ্রুতশ্বাসে নয়, বিলম্বিত লয়ে। ভাল লাগা জায়গাগুলো থেমে থেমে দু-তিনবার করে পড়লাম। বিশেষ করে সেখানটায়—স্টেশনের মরচে-ধরা ওজনের কলটির ওপর পশুপতি, আর ঠিক তার পিছনে কাচের চুড়ির রুনঝুন। বুঝতেও পারল না পশুপতি মাস্টার সদ্যকেনা সামর্থ্যেরও অতিরিক্ত দামের বইটা মেয়েটির হাতে তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও অলক্ষে মরচেধরা কলটিতে তার ওজন লেখা হয়ে গেল। স্থূল দেহের ওজন নয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনের বিচিত্র সত্তার পরিমাপ। আরো ভাল লাগল সেই জায়গাটি যেখানে বর্ষামথিত দুর্যোগের রাতে আচমকা পশুপতি মাস্টারের স্বল্প-পরিসর ঘরে হংস মিথুনের প্রবেশ, তাদের কলকাকলি। যার স্মৃতি-সৌরভ অধ্যয়ন-সর্বস্ব মাস্টারকেও উন্মনা করে তুলল ক্ষণেকের জন্য। ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার পাতার ওপরই শুধু নয়, পশুপতি মাস্টারের শুকনো পাঁজরের ওপর রোমান্সের চড়া রংয়ের স্পর্শ।

পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই, ঘুম ভেঙে গেল আতরের গুরু গন্ধে। চমকে বিছানার ওপর উঠে বসলাম। ড্রেসিং টেবিলের ওপর অগুরুর শিশিটা ছিল, কখন বুঝি হাল্কা হাওয়ায় মেঝেয় পড়ে ভেঙে গিয়েছে।

বাতি জ্বালানোই ছিল। হারিকেনের শিখাটা উসকিয়ে দিলাম। না, ঠিক আছে অগুরুর শিশি। তবে, তবে চারদিকে এ কিসের গন্ধ? তন্ন তন্ন করে বিছানার চারপাশ খুঁজলাম। কোথাও কিছু নেই। তারপরই হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এ আতর আমার নয়, লীলা তোরঙ্গ থেকে শাড়ি-জামা বের করার সময় অসাবধানে আছড়ে ফেলেছে আতরের শিশি। আমার সারা ঘরে তারই সুবাস।

আশ্চর্য লাগল। গল্পের আতর পাঠকের ঘরে, পাঠকের মনে ছড়িয়ে দিতে পারেন এমন অনায়াস-কৃতিত্ব কার? পত্রিকাটা বালিশের তলায় ছিল। উঠে বাতির কাছে বসলাম। লেখকের নাম দেখলাম মনোজ বসু।

আর এক ছুটির বন্ধে কলকাতায় এসেছি। ইতিমধ্যে সংগ্রহ করে আরো লেখা পড়েছি। নরবাঁধ, বনমর্মর। আবার নতুন করে পড়েছি ফাস্ট´বুক আর চিত্রাঙ্গদা। প্রত্যেকটি গল্পেরই সৌন্দর্য-প্রোজ্জ্বল পরিবেশ, ব্যঞ্জনাবহ ভাষা, মধুর সংলাপ।

মুরুব্বি পাকড়ালাম খুড়তুতো ভাইকে। বয়সে আমার চেয়ে ছোট হলে হবে কি কলকাতার অলিগলি তার নখদর্পণে। পাড়ার ছেলেদের জুটিয়ে একটা হাতে-লেখা পত্রিকাও সম্পাদনা করতে শুরু করেছে।

শেষ পর্যন্ত তাকেই ধরলাম।

এই, কাগজ তো বের করেছিস, সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

ভাই প্রশ্নটাকে খুব আমল দিল না। পাশ কাটানোর ভঙ্গীতে বলল, আলাপ করে লাভ নেই। বড্ড ঘোরায়। আজ দেব কাল

দেব করে, লেখা দেয় না। একটা আশীর্বাণী দেবে তাও চুয়ান্ন রকমের বায়নাক্কা।

শোন, শোন, তাকে ফেরালাম, মনোজ বসুকে চিনিস? বনমর্মর, নববাঁধ যাঁর লেখা?

ভাই ফিরে দাঁড়াল। মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। আমার নির্বুদ্ধিতার ওপর অসীম করুণা, এই রকম একটা ভাব।

চিনি না মানে? তিনিই তো আমাদের বাংলা পড়ান।

বাংলা পড়ান মনোজ বসু? সাউথ সুবার্বনে?

আমার মাথায় হাত চাপড়ানো বাকি। পৈতৃক বাড়ি কেদার বসু লেনে। মাঝখানে ছ ফিট শড়ক। এ পাঁচিল থেকে ও পাঁচিলে পা রাখা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। আমাদের উঠানের আম গাছের সঙ্গে স্কুলের প্রাঙ্গণের বটগাছের অবাধ মিতালি। ছেলেদের ড্রিল আরম্ভ হলে মাঝে মাঝে ছাদের ওপর বসে দেখছি। দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের কোলাহলে কান পাতা দুষ্কর। সব ছুটেছে ক্লাসের দিকে। শুধু ছাত্ররাই নয়, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফেনার ঝালরের মতন শিক্ষকরাও আছেন। হাতে ছাতা, ত্রস্ত গতি, আত্মভোলা মানুষের দল। দধিচির সগোত্র। প্রায়ই দেখেছি মাস্টারদের আনাগোনা, কে জানত তাদের মধ্যে মনোজ বসুও ছিলেন! অজানা এক স্টেশনে অচেনা এক মেয়ের হাতে চিত্রাঙ্গদা যিনি তুলে দিয়েছিলেন। পরের দিন থেকে একটা কাজ বাড়ল। রোজ সকালে ছাদের ওপর গিয়ে বসি। আম-পাতার আড়ালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে। খুড়তুতো ভাইকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সম্মানে বাঁধল। তা ছাড়া নিজের মনেও অহঙ্কারের একটু ছিটে ছিল বৈকি। একটা সাহিত্যিককে চিনতে পারব না ভিড় থেকে আলাদা করে? বিশেষ করে 'রাত্রির রোমান্স'-এর দাম্পত্য কূজন গুঞ্জনের লিপিকারকে, কিংবা 'একদা নিশীথকালে'র মকরকেতনের কৌতুক রস-স্রষ্টাকে?

আসল মানুষটাকে চিনতে পারলাম না, কিন্তু তাতে অসুবিধা হয়নি। প্রত্যেক দিনই এক একজনকে মনোজ বসু ভেবে নিলাম। যাঁরা মরালশুভ্র পাঞ্জাবি আর স্বল্পকুঞ্চিত কেশের মালিক, তাঁরা তো নির্ঘাৎ ধরা পড়লেন আমার মানস-জালে।

হঠাৎ যেদিন খেয়াল হল, সেদিন আর সময় নেই। বিছানাপত্র সব বাঁধা। পরের দিন সকালে স্টিমার। মনোজ বসুকে না দেখেই ফিরে এলাম বর্মায়।

আরো কিছুদিন পর। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের চারপাশে ঘোরাফেরা করি, সন্ন্যাস নেবার অভিপ্রায়ে নয়, আনকোরা বই পড়বার লোভে। অবৈতনিক গ্রন্থাগার, কাজেই খদ্দের অনেক। সময়মত নতুন বই পাওয়া দুর্ঘট। তারই মধ্যে একজন ব্রহ্মচারী সুনজরে দেখলেন। ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্য। পরে স্বামী ত্যাগেশ্বরানন্দ হন। বাছা বাছা বই হাতে তুলে দিতে লাগলেন। শুধু তুলে দেওয়া নয়, বই পড়ার পরে রীতিমত আলোচনা করতে হত তাঁর সঙ্গে। ভালমন্দ বিচার।

একদিন লাইব্রেরিতে যেতে একটু দেরি হয়ে গেছে। মাঠে খেলা দেখে প্রায় ছুটতে ছুটতে যখন গেলাম, তখন লাইব্রেরি বন্ধ করে ব্রহ্মচারী নেমে আসছিলেন, আমাকে দেখে বললেন, কিরে এত দেরি? তোর জন্য একটা বই রেখেছি।

দু হাতের অঞ্জলিতে বইটা নিলাম। বইয়ের নাম, 'ভুলি নাই'। লেখক মনোজ বসু।

রেঙ্গুন শহর থেকে বাড়ি ছিল মাইল পাঁচেক দূরে। ট্রেনে ফিরতে হত। ট্রেনে উঠেই বইটা খুলে বসলাম। শুরু করবার আগে আর একবার বইটার নামটা উচ্চারণ করলাম। ভুলি নাই। মনগড়া একটা অর্থও করে নিলাম। হাতে হাত রেখে কোন নায়ক-নায়িকার প্রতিশ্রুতি পালনের ইতিকথা। প্রথম যৌবনের বহুউচ্চারিত অমৃত-ভাষণ। পরস্পরকে বিস্মৃত না হওয়ার অলীক প্রতিজ্ঞা।

কয়েক পাতা পড়ার পরেই ভুল ভাঙল। নিছক হৃদয় দেওয়া-

নেওয়ার ব্যাপার নয়, অগ্নিক্ষরা দিনের সংগ্রামের এক অধ্যায়। লঘু জীবনের ললিত বিলাস নয়, শিকল ভাঙার ভয়াল ভৈরবী। ট্রেনের চাকায় চাকায় আবর্তনের যান্ত্রিক ছন্দ। ইস্পাতে ইস্পাতে ঠোকা-ঠুকি। তার মাঝখান থেকে নতুন এক সুরের আভাস। দু কানে ঝরে পড়ল একটি নাম। কুন্তলদা, কুন্তলদা।

বই যখন শেষ হল, তখন নামবার স্টেশন পার হয়ে এসেছি অনেক আগে। তা হোক, ক্ষতি নেই। উল্টোপথে আবার ফিরে যেতে হবে। মনকে বোঝালাম, শুধু তো নামবার একটা স্টেশন ছেড়েছি। সব না ছাড়লে কখনও সব পাওয়া যায়।

বাড়ি গিয়ে বসে বসে ভাবলাম। অদ্ভুত মাদকতা ভরা দুটি শব্দ। এত অল্প কথায় অগ্নিস্রাবী লাভা-স্রোতের এমন জ্বলন্ত পরিচয় আর কোন নামে দেওয়া সম্ভব, মনে হল না। বিস্মিত হলাম লেখকের ভাষার সৌন্দর্যে। পাঠককে অভিভূত করার দুরূহ মন্ত্র লেখকের করায়ত্ত। শুধু রোমান্সের সফরী-সন্তরণ নয়, জীবন-বোধের গভীরতর উপলব্ধি, হৃদয়ের প্রত্যন্ত-প্রদেশের অতলান্ত অনুভূতি। আতরের সুবাসের বদলে এবার বারুদের গন্ধ।

আরো পরের কথা। বিদেশের বাস উঠিয়ে এদেশের উপকূলে এসে পৌঁছলাম। সারা বিশ্বে তখন ঘরভাঙার খেলা চলেছে। নতুন চাকরির সুতো গোটা ভারতে ছড়ানো ছিল। সেই সুতোয় জড়াতে জড়াতে একদিন কলকাতায় এসে বসলাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যচর্চাই শুধু নয় হাতে কলমেও সাহিত্য করছি। ইতস্ততঃ কবিতা আর কিছু কিছু গল্প। দু একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। মনোজ বসুর আরো অনেক বই পড়েছি। বকুল, নবীনযাত্রা, শত্রুপক্ষের মেয়ে, পৃথিবী কাদের। নতুন নাটকও হাতে এসেছে। নতুন প্রভাত, প্লাবন, রাখিবন্ধন।

তখনও কিন্তু মানুষটার সঙ্গে দেখা হয়নি।

প্রথম দেখা অনেক পরে।

অফিসে কাজ করছি, সাগরময় ঘোষের টেলিফোন এল।

বিকেলে অফিসের পরে একবার মনোজ বসুর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?

মনোজ বসুর সঙ্গে? বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

দেখা হলেই জানতে পারবেন।

কোন্ ঠিকানায় দেখা করতে হবে?

বেঙ্গল পাবলিশার্স। চোদ্দ, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট।

ছুটি হবার মিনিট দশেক আগেই উঠে পড়লাম। খুঁজে খুঁজে বের করলাম চোদ্দ নম্বর। স্বল্প পরিসর কামরা, বুঝি পশুপতি মাস্টারের আস্তানার চেয়েও ছোট। সামনে গুটি দুয়েক কর্মচারী বই গুছিয়ে তাকের ওপর রাখছে। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেই ভিতর দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

পাশাপাশি দুটি চেয়ার। একটিতে বন্ধগলা কোট শীর্ণ চেহারার একটি ভদ্রলোক। কোলের ওপর বইয়ের গোছা। আর একটি চেয়ার খালি।

দাঁড়াতেই প্রশ্ন করলেন, কাকে চাই?

বললাম, মনোজ বসুকে।

আমি মনোজ বসু, কি দরকার বলুন?

স্তূপাকার বইয়ের আড়াল থেকে একটি ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। পরনে সাদা পাঞ্জাবি, বুকের গোটা দুয়েক বোতাম খোলা, মসৃণ প্রশস্ত ললাট, মুখে অনাবিল হাসি।

পরিচয় দিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। হাত ধরে টেনে চেয়ারে বসালেন। মিনিট দশেকের মধ্যে আপনির কাঁটাতার সরিয়ে তুমির অন্তরঙ্গ প্রাঙ্গণে নামলেন। সেই সময় 'দেশ'-এ আমার একটি ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছিল। পটভূমি বর্মাদেশ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে-দেশ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন।

আমি লেখার সঙ্গে লোকটাকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম। লেখার মতনই সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী, কথাবার্তায় তেমনি প্রচ্ছন্ন কৌতুক, বলার গুণে সামান্যও অনায়াসে অসামান্য হয়ে ওঠে। দেশকে ভালবাসেন, শুধু দেশের বঞ্চিত, মূঢ় মানুষগুলোকেই নয়, তার অবহেলিত প্রাকৃতিক সম্পদ, বাদাভূমি, নোনাজল। তার অন্ধ সংস্কারঘেরা হাজার অলৌকিক কাহিনী।

কথা বলতে বলতেই থেমে গেলেন। হেসে বললেন, কি খাবে বল? চা না কফি?

আমি কিছু বলবার আগেই কফি এল।

কাপটা টেনে নেবার আগে আর একবার লোকটির দিকে চেয়ে দেখলাম। খেয়াল নেই। কথা বন্ধ ক'রে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে চেয়ে রয়েছেন। সে দৃষ্টি রাজপথ আর চলমান জনতার দিকে নিবদ্ধ মনে হলেও আমি বুঝতে পারলাম মনোজ বসুর দৃষ্টি ফেরো-কংক্রিটের কঠিন আবরণ ভেদ করে আরো অনেক দূরে চলে গেছে। সবুজ কিংখাবে মোড়া হাঙরমুখো ঝালরদার শিবিকার পাশে রায়রায়ান, রাজারামের পরিত্যক্ত বিধ্বস্ত গড়, জলজঙ্গলের মায়াবী পরিবেশ, আংটি চাটুজ্জের ভাই, সর্বস্বহারা নটবরের বৌ সৌদামিনী, অন্ধ গহর, তরঙ্গিনী সব ভিড় করে দাঁড়িয়েছে উদাস দৃষ্টির সামনে।

কাপে ঠোঁট ঠেকাতে গিয়েই থেমে গেলাম।

সংবিত ফিরে পেলেন মনোজ বসু। বললেন, কি হল, কফি খাও না বুঝি? তা হলে থাক, চা আনতে বলি?

ঘাড় নেড়ে কফিতে চুমুক দিলাম।

সেদিন কি হয়েছিল লজ্জায় বলতে পারিনি। আজ বলছি। কফিতে ঠোঁট ছোঁয়াতে গিয়েই চমকে উঠেছিলাম। কফিতে আতরের গন্ধ।

এক থিয়েটার পার্টি এসেছে মফস্বল শহরে। এসেই বিপত্তি।

যে মহিলা হিরোইন সাজবেন, তিনিই জ্বরে কাত। ম্যানেজার মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। উপায়। দলের আর যারা ছিল, তাদের দিয়ে চলবে না। একজন বেরোলেন হিরোইন খুঁজতে। আধা-গৃহস্থ পাড়ায়। মিলেও গেল। বয়স কম। চেহারায় চেকনাই আছে। আগে কোনদিন থিয়েটার করে নি বটে, কিন্তু মনে হল শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে ঠিক উৎরে যাবে। মহলা শুরু হল। নতুন মেয়েটি মন দিয়ে পার্ট করতে লাগল। ভারি শক্ত পার্ট। কি হবে। কথায় কথায় চোখের জল ফেলতে হবে। বস্তির দু একজন ধরল মেয়েটিকে। তাদের থিয়েটার দেখাতে হবে। দলের একজন সেজে-গুজে রাণী সাজবে, আর তারা দেখতে পাবে না তা কি হয়। মেয়েটি আশ্বাস দেয়। হবে, হবে, সময়ে সব হবে। ম্যানেজার-বাবুকে বলে ঠিক পাশ জোগাড় করে দেবো। মেয়েটি দিনরাত পার্টের কথা ভাবে। যেমন করেই হোক, ভাল তাকে করতেই হবে। এ বিষয়ে চুপি চুপি নায়ক তাকে কি কথা বলেছে, তাও বন্ধুদের জানাতে ভোলে না।

তোমাকে পেয়ে বাঁচলাম। আগে যে তোমার পার্টটা করত, তার চেহারা যেন আলকাতরার বোতল। তার সঙ্গে প্রেমের পার্ট করতে গিয়ে বুকের ভেতর গুরু গুরু করত। ভাষা ফুটত না মুখে।

কেমন দেখতে রে নায়ককে ?

মেয়েটির চোখে-মুখে লজ্জার রক্তাভা ফুটে ওঠে। মাটির দিকে চেয়ে বলে, চমৎকার। এক জায়গায় নায়ক আমার পায়ে ধরতে আসবে, আর আমি পালকের মুকুট দুলিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে চলে যাব। সেখানটা আমার এমন কষ্ট হয় নায়কের জন্য।

থিয়েটারের দিন এগিয়ে এল। হঠাৎ মেয়েটি দেখল, পুরনো নায়িকা চেয়ারে এসে বসেছে। তার অসুখ কম। একদিন ম্যানেজার বলেও দিল যে, পুরনো নায়িকাই নামবে, নতুন মেয়েটিকে আর

দরকার হবে না। তবে ম্যানেজার অকৃতজ্ঞ নয়। নতুন মেয়েটিকে থিয়েটারের পাস দিলেন একটা। বলেও দিলেন, যেন মনে করে থিয়েটার দেখতে ঠিক আসে। দুচোখ বেয়ে মেয়েটির জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। একটা গ্লানি, অপমানই শুধু লুকিয়ে রয়েছে এমন নয়, বুকের মাঝখানে তীব্র একটা ব্যথা। পার্টের সঙ্গে সে একান্ন হয়ে গিয়েছিল। আলাদা কোন সত্তা তার ছিল না। মেয়েটি ভেবেছিল, নায়ক হয়তো প্রতিবাদ জানাবে। আলকতারার বোতলের সঙ্গে অভিনয় করতে সে রাজী হবে না, কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, প্রেমের দৃশ্য সম্পূর্ণ আবেগ দিয়েই নায়ক অভিনয় করে গেল। মেয়েটি হয়তো বোঝে নি, অভিনয় করতে করতে অভিনয়টা এদের রক্তের মধ্যেই মিশিয়ে যায়।

গল্পের নাম 'ইতি'। ঠিক স্মরণ নেই গল্পটি বোধহয় প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতবর্ষে'। এটুকু বেশ মনে আছে, সেই মেয়েটির দুঃখে বেশ ক'দিন মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল। মেয়েটির স্বপ্ন আর সাধনার এভাবে ইতি হওয়াতে খুবই আঘাত পেয়েছিলাম। গল্পটি বার তিনেক পড়েছিলাম। লেখকের নাম প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। নামের বৈচিত্র্যের জন্য। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। যে ধরনের নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত, এ নামটি তার ব্যতিক্রম। এর আগে এই লেখকের কবিতা বোধহয় পড়েছি।

অশ্রুজল ফেলিও না।
জান না কি অশ্রুজল ওষ্ঠপুটে ঠেকে বড় নোনা।

সমুদ্র পার হয়ে এদেশে এসে এই লেখকের অনেক গল্প-উপন্যাস পড়েছি। লিখনচাতুর্য আর বিষয়-বৈচিত্র্যের জন্য এঁর রচনা মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে যেত। মনে গোপন বাসনা ছিল, লোকটিকে দেখব। কিছু দিন পর সুযোগ জুটে গেল।

এক উকিল-আত্মীয়ের বাড়ি বসে আছি, একটি ভদ্রলোক এলেন। বর্ণ ঘনশ্যাম, কুঞ্চিত কেশ। মুখের ভাব কিছু রুক্ষ। আত্মীয়টি

আলাপ করিয়ে দিলেন। ইনি অচিন্ত্যবাবু, আমাদের কোর্টে প্র্যাকটিশ করেন।

বিগলিত হয়ে নমস্কার করলাম। বললাম, আপনার ওকালতির কথা জানি না, কিন্তু আপনার লেখার ওপর আমার অশেষ অনুরাগ।

আপনিও কি ওকালতি করেন?

এক সময়ে করেছি। বিদেশে। কিন্তু এখানে ছাড়পত্র পাচ্ছি না।

ভদ্রলোক মোটা চশমার কাঁচের মধ্য দিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখলেন। বললেন, আমার লেটেস্ট বইটা পড়েছেন? ওটা ইতি-মধ্যেই খুব চালু হয়েছে। সকলের হাতে হাতে দেখতে পাই।

একটু বিব্রত হলাম। ঠিক কোন্ বইটা তাঁর লেটেস্ট, মনে করতে পারলাম না। লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়ি, কাজেই কোনটা তাঁর নতুনতম, সে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ছিল না। তাই বললাম, আপনার কোন্ বইটা লেটেস্ট বলুন তো?

ভদ্রলোক নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, বেঙ্গল টেনেন্সি অ্যাক্ট।

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়। বুঝলাম, কোথাও একটা মারাত্মক ভুল হয়েছে। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার পুরো নামটা কি?

অচিন্ত্যকুমার ভড়। এল. এলবি.।

আসল অচিন্ত্যকুমারের দেখা পেলাম অনেক পরে। ছুটির দিন। দিবানিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। ভৃত্য এসে জানাল দুটি ভদ্রলোক ডাকছেন।

সর্বনাশ! এই নিদাঘ-মধ্যাহ্নে। নীচে গেলাম। দেখলাম দুজন বসে আছেন। একজন আমার পরিচিত। অজিত দত্ত। কবি এবং আমার 'ইরাবতী'র প্রকাশক। সঙ্গের লোকটি ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। প্রশস্ত ললাট, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। অজিতবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি অচিন্ত্যকুমার।

একবার ঠকেছি, তাই বললাম, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত?

হ্যাঁ, কল্লোল যুগের।

উল্লসিত হলাম। কিন্তু কি ব্যাপার! দিকপাল সাহিত্যিক আমার বাড়িতে! এমন সময়ে! আসার কারণ অচিন্ত্যকুমার নিজেই বললেন—আপনার কাছে পুরোন কল্লোল দু-একটা সংখ্যা আছে শুনলাম। দেখাবেন একবার?

দু'মাসের কল্লোল একসঙ্গে বাঁধানো ছিল। আলমারি খুলে নিয়ে এলাম। অচিন্ত্যকুমার উল্টেপাল্টে দেখে বললেন, না, এগুলো আমার কাছে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

বললেন, কল্লোলযুগ নিয়ে একটা বড় বই লিখছি, তাই পুরোন সংখ্যা কল্লোলগুলো একবার নেড়ে-চেড়ে দেখবার দরকার হয়েছিল। অজিতের কাছে শুনলাম, আপনার কাছে কয়েক সংখ্যা কল্লোল আছে, তাই চলে এলাম।···সেদিন একথা-সেকথা নানা কথা হল। সব সাহিত্য সম্পর্কে নয়। অচিন্ত্যকুমার বাড়ির ঠিকানা দিলেন। যাবার আমন্ত্রণও জানালেন। বললেন, টেলিফোন করে আসবেন। নানা কাজে ঘুরতে হয়। যদি বাড়িতে না থাকি।

অনেকদিন পরে একবার ফোন করলাম। শুনলাম অচিন্ত্যকুমার কলকাতায় নেই। বাইরে কোথায় বদলি হয়েছেন।

এ ব্যাপারের আরও অনেকদিন পর। অফিসের কাজে আসানসোল যেতে হল। এক মোটর লরীর দুর্ঘটনা। বীমা কোম্পানির তরফ থেকে ক্ষতির পরিমাণ দেখতে গিয়েছিলাম। কাজ শেষ হতে অনেক সময় নিল। খুব পরিশ্রান্ত বোধ করছিলাম। ঠিক করলাম, রাতটা বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন ভোরে কলকাতায় ফিরব। রিটায়ারিং রুমে ডেকচেয়ার পেতে চুপচাপ শুয়েছিলাম। একটু দূরে জন দুই ভদ্রলোক কথা বলছিলেন, তাঁদের কথার টুকরো কানে ভেসে আসছিল। হঠাৎ পরিচিত একটা নাম কানে যেতে উঠে বসলাম। একজন বলছিলেন, অচিন্ত্যবাবু যে শুধু সুবিচার করেন তাই নয়,

ইনি একজন সুলেখক। বাংলা ভাষার প্রথম পংক্তির সাহিত্যিক। ঔৎসুক্য দমন করতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, অচিন্ত্যবাবু কি এখানে আছেন?

হ্যাঁ, তিনি এখানকার সাবজজ। আপনি চেনেন নাকি তাঁকে?

বললাম, সামান্য আলাপ আছে। তাঁর ঠিকানাটা জানেন?

ঠিকানাটা পাওয়া গেল। সব ক্লান্তি-অবসাদ ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়লাম। এত কাছে এসে দেখা না করে যাওয়াটা ঠিক হবে না। বিশেষ করে, দেখা করার আমন্ত্রণ যখন করেই রেখেছেন। যেতে যেতে একটা কথা ভাবলাম, কোন রকম খবর না দিয়ে যাওয়াটা সমীচীন হবে কিনা। শুধু সাহিত্যিক নন, বিচারকও। যে কোন দর্শন-প্রার্থীর পক্ষে তাঁর মোলাকাৎ হয়তো অনায়াসলভ্য নয়। খোঁজ করে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনের ঘরেই দাঁড়িয়েছিলেন। সাজ-পোশাকে মনে হল বোধহয় বাইরে বেরোবার উপক্রম করছেন।

চিনতে পারছেন?

ঘুরে দাঁড়ালেন। পলকের দ্বিধা। তারপরই সহাস্যবদনে বললেন, আরে, আপনি এখানে? আসুন আসুন।

বসলাম। বললাম, একদিনের আলাপ। ঠিক চিনতে পেরেছেন?

অচিন্ত্যকুমার উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, স্মৃতিশক্তিটা প্রখর হয়ে কম মুশকিলে পড়েছি! কত কথা ভুলতে পারি না, যেগুলো অন্ততঃ ভোলা প্রয়োজন ছিল।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ছিলাম। অবাক হয়ে শুনছিলাম অচিন্ত্য-কুমারের কথা। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে কি অনায়াস-সঞ্চরণ। সাহিত্যের প্রতিটি শাখা সম্বন্ধে কি গভীর জ্ঞান। আমার সাহিত্য-চর্চার বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। বললেন, লিখে যাও। মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করব, তা ভাবলে লেখা চলে না। বরং লেখা বন্ধ হয়ে যাবে। ওরই মধ্যে যদি থাকার কিছু থাকে, মহাকাল সেগুলো বাঁচিয়ে রাখবে। সে চিন্তা তোমার নয়।

ইতিমধ্যে এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। সম্ভবত অচিন্ত্যকুমারের সতীর্থ। এঁর সঙ্গেই বৈকালিক ভ্রমণে বেরোবার কথা ছিল।

কি, খুব ব্যস্ত ?

অচিন্ত্যকুমার বললেন, হ্যাঁ, একটু। আজ আর বেরোব না।

কলকাতার বন্ধু নাকি ?

হ্যাঁ, কলকাতার তো বটেই, তার ওপর সাহিত্যিক বন্ধু।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি ঘণ্টা তুয়েক পরে উঠলাম। ওঠবার মুখে বললাম, কি ব্যাপার, আপনার ঘরে সব বেতের ফার্নিচার ?

হাসলেন, বদলির চাকরি কিনা, তাই ভারি কিছু সংগ্রহ করার চেষ্টা করি নি! সবই হাল্কা, এমন কি মনটা পর্যন্ত। যখন দরকার হবে, তুলে নিয়ে যাব।

তারপর বহুবার অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। পথে, ঘাটে, সভাপ্রাঙ্গণে। তাঁর ওজস্বিনী ভাষণ শুনেছি মুগ্ধ হৃদয়ে। বাংলা ভাষাকে পরিপুষ্ট করেছেন নতুন বাক্য-সম্ভারে। তেজ দিয়েছেন। উদ্দীপনাও। চিঠিপত্রেও এই ভাষার আমেজ পাওয়া যায়।

এক চিঠিতে লিখলেন—তুমি একদিন এসো। তোমার আগমন সর্বদাই নন্দনবর্ধন।

বহুদিন আগের কথা, কবি অজিত দত্তের বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ। উপলক্ষ নলিনীকান্ত সরকারের কমিক গান। নিমন্ত্রণ করার সময়ে অজিতবাবু বললেন, এ এক নতুন জিনিস। আপনারা এ জিনিস কোনদিন শোনেন নি। অবশ্য সত্যি কথা। ভেবেছিলাম সচরাচর জলসায়, রেকর্ডে যে ধরনের হাসির গান শুনি, এও হয়তো সেই জাতীয় কিছু হবে।

গিয়ে অবাক হলাম। নলিনীবাবু গানগুলো রচনাও করেছেন এবং গাইবার যে পদ্ধতি, কানে না শুনলে বুঝিয়ে বলা যায় না।

তাঁর কণ্ঠস্বরের আরোহ-অবরোহ, মুখের ভঙ্গী, শ্রোতাদের দিকে কৌতুকমিশ্রিত দৃষ্টি—সব মিলিয়ে তাঁর পরিবেশন উপভোগ্য।

প্রায় জন বিশেক লোক জমায়েৎ হয়েছিলাম। দু-একজন সমবয়সী সাহিত্যিকও ছিলেন। একেবারে কোণের দিকে বসেছিলেন একটি ভদ্রলোক। নাতিদীর্ঘ, উজ্জ্বল শ্যাম। তীক্ষ্ণ আয়ত দুটি চোখ। একরাশ অযত্নলালিত কেশগুচ্ছ। তিনি মাঝে মাঝে নতুন গানের ফরমাস দিচ্ছিলেন।

পাশের পরিচিত সাহিত্যিক-বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কে?

সাহিত্যিকবন্ধু সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে উত্তর দিল, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র।

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে চিনতাম। বহু আগে থেকে। মানুষটাকে নয়, তাঁর রচনা। সুদূর বর্মাদেশে থাকতেও তাঁর লেখা পড়েছি। আমার কাছে তাঁর প্রথম পরিচয় কবি হিসাবে নয়, ছোট গল্পকার হিসাবে। ছোটগল্পের রীতিনীতি আঙ্গিক ঠিক কি হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে এখনও যাঁদের মনে দ্বিধা আছে, জিজ্ঞাসা আছে, তাঁরা প্রেমেন্দ্র মিত্রের অতিখ্যাত গল্পগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিতে পারেন। সেই বছর 'দিগন্ত' বার্ষিকীতে প্রেমেনবাবুর একটা গল্প প্রকাশিত হয়েছে 'স্টোভ'। একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে আর একজন সাহিত্যিকের দেখা হলেই 'স্টোভে'র প্রশংসা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা বিষয়-প্রধান নয়, আঙ্গিক-প্রধান। প্রচুর চরিত্রের ভীড় নেই, মানুষ দুটি একটি, কিন্তু সংলাপের তীক্ষ্ণতায়, আঙ্গিকের কারুকার্যে মহত্তম সৃষ্টি। স্বল্প জলে তালে তালে দাঁড় বেয়ে নৌকাকে তীরে নিয়ে যাওয়ার মতন, কখন যে গল্পটি সমাপ্তির উপকূলে আসে, প্রায় পাঠকদের অগোচরে, ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

আলাপ হল। বোধহয় অজিতবাবুই আলাপ করিয়ে দিলেন। আমার নমস্কারের উত্তরে প্রতিনমস্কার আর একটু স্মিত হাসি। প্রথম আলাপে এই মিতবাক লোকটিকে মনে হয়েছিল মানুষের

অরণ্যে যেন হারিয়ে গেছেন। পৃথিবীতে এত কোলাহল, এত বঞ্চনা, এত সামাজিক উৎপীড়ন—এ যেন তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দু চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। কিছুটা অসহায়তারও। এরপরেও এমনি অসহায় দৃষ্টি তাঁর চোখে দেখেছিলাম। ট্রামে পাশাপাশি বসেছিলাম। তিনি যাচ্ছিলেন স্টুডিওতে, আমি বাড়ি।

টিকিটের জন্য কণ্ডাক্টরের হাতে নোট দিলেন। বাকি পয়সা ফেরত নিয়ে পকেটের মধ্যে রাখলেন।

বললাম, প্রেমেনদা, পয়সা গুনে নিলেন না।

কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, নয়া পয়সার হিসাবটা আজও শিখতে পারলাম না ভাই। ও শেখাও যায় না। এক একবার হিসাব করলে এক এক রকম হয়। তাই আর গুনি না। পকেটে রেখে দিই। হয়তো ঠকছি, কিন্তু হিসাব করে পৃথিবীর ক'টা ঠকানো আর বাঁচানো যায় বল ?

আর একদিনের ব্যাপার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ি গেছি। এক রবিবার সকালে। প্রেমেনদা তখন সাহিত্য-গঙ্গা থেকে সিনেমা-যমুনায় ঝাঁপ দিয়েছেন। বসবার ঘরে ভীড়ও সিনেমা-সংক্রান্ত লোকদের।

ধীরাজ ভট্টাচার্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। প্রতি রবিবারেই তাঁকে এখানে দেখা যেত। সেদিন গিয়ে দেখলাম ধীরাজবাবু খুব উত্তেজিত।

কি করলি বল তো ? অত চমৎকার একটা পার্টি পাঠিয়ে দিলাম। শাঁসালো লোক। তুই একটু বললেই রাজী হয়ে যেত।

প্রেমেন্দ্রবাবু তক্তপোষে বসে কতকগুলো কপি-করা কবিতা গুছোচ্ছিলেন, বোধহয় কোন প্রকাশককে দেবার কথা। ধীরাজবাবুর কথায় মুখ তুলে একবার মুচকি হেসে আবার কবিতা গোছানোয় মন দিলেন।

ধীরাজ ভট্টাচার্য আরো ক্ষেপে উঠলেন। সম্ভবত ওই মুচকি হাসিতে।

একবার বললেই সে এ লাইনে টাকা ঢালতে চায়। আর তুই তাকে বললি, এ লাইন মারাত্মক লাইন। দর্শক যে কি চায় আর কি চায় না, তা জানা শিবের বাপেরও অসাধ্য। কোন্ বই রাজা করবে, আর কোন্ বই ফকির, তা কেউ বলতে পারে না। রুপোলী পর্দা মানেই লোকের সঞ্চিত রুপো গলিয়ে পর্দা। প্রেমেনবাবু আবার হাসলেন। শুধু হাসি নয়, কথাও বললেন, আরে ভাই, এসব কি আর ওকে বুঝিয়েছি, বুঝিয়েছি নিজেকে। অষ্টপ্রহর নিজেকে যা বোঝাচ্ছি, ভদ্রলোককেও তাই বলছিলাম।

সমবেত সবাই হেসে উঠলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার দিকে ফিরে বললেন, হরিনারায়ণ কি লিখছ বল ?

ধীরাজ ভট্টাচার্য সশব্দে তক্তপোষের ওপর বসে পড়লেন।

বুঝলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্রের হিসাবের সঙ্গে আর কারো হিসাব মিলবে না। নয়া পয়সার হিসাবই শুধু নয়, ব্যবহারিক জগতের হিসাবও।

নতুন গল্প-গ্রন্থ প্রকাশিত হল। শঙ্খলিপি। উৎসর্গ করলাম প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। অবশ্য তাঁর অনুমতি নিয়ে। বইটা প্রকাশিত হবার সময়ে অফিসের কাজে দার্জিলিং যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ঘুরে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। ফিরেই প্রকাশকের কাছে গেলাম বইয়ের সন্ধানে। সেখানেই শুনলাম প্রেমেন্দ্র মিত্র এসে বই নিয়ে গেছেন। বলেছেন, কই, হরিনারায়ণ বই আমাকে উৎসর্গ করল, কিন্তু বই তো দিল না।

আমার বাইরে যাবার খবর প্রকাশকের জানা ছিল না। তিনি কিছু বলতে পারলেন না। লজ্জিত হলাম। ঠিক করলাম পরের দিনই ফোনে ব্যাপারটা প্রেমেনদাকে বুঝিয়ে বলব।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তখন বেতার-অফিসে সংশ্লিষ্ট। টেলিফোন করলাম। বললাম, অফিসের কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল, তাই সময়মত বইটা তাঁর হাতে দিতে পারি নি। অনুযোগ করলাম, কেন তিনি প্রকাশকের কাছ থেকে বই নিতে গেলেন? আমি তো দিতামই।

আরে, তাতে আর কি হয়েছে। বই পাওয়া নিয়ে কথা।

বললাম, উঁহু, তা হবে না। আমি নাম লিখে বই দিয়ে আসব। ও বই নিয়ে আসা মঞ্জুর নয়।

হাসলেন। বললেন, বেশ তাই হবে।

সেদিনই বিকালে রেডিও অফিসে শঙ্খলিপি দিলাম প্রেমেনদার হাতে। পাশে লীলা মজুমদার বসেছিলেন। তিনি বইটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে বললেন, বাঃ, বাইরেটা তো বেশ সুন্দর।

প্রেমেন্দ্রবাবু বললেন, ভেতরটাও ভাল। আমি কয়েকটা গল্প পড়ে ফেলেছি, বিশেষ করে অভিসারিকা গল্পটি। আমার স্ত্রীরও খুব ভাল লেগেছে।

কোঁচড় পেতে রইলাম। এইটুকুই আমাদের সঞ্চয়। পূর্বসূরীদের প্রশংসা। তাঁদের আশীর্বানী।

উনিশশো তেতাল্লিশ সাল। উত্তরবঙ্গে কোথায় দারুণ বন্যা হয়ে গেছে। সংবাদপত্র খোলার উপায় নেই। বীভৎস সব চিত্র। সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন। ভবানীপুরে আমাদের আদি বাড়ি। সেখানকার ছেলেরা এসে ধরল আমরা বেরোব। টাকা-পয়সা কাপড়-চোপড় যা কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। আপনিও থাকবেন আমাদের সঙ্গে।

এত লোক থাকতে হঠাৎ আমার ওপর এত করুণা কেন ভাবতে গিয়েও থেমে গেলাম। ব্যাপারটা মনে পড়ল। আমারই হঠকারিতার ফল। লক্ষ্ণৌয়ে থাকতে মেদিনীপুরের ঘূর্ণিবাত্যার সাহায্যকল্পে নগদ একশো এক টাকা পাঠিয়েছিলাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে টাকাটা সংগৃহীত করেছিলাম। টাকাটা প্রাপ্তি-স্বীকার করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলেন। সেটা সযত্নে রেখে দিয়েছি। এখনও আছে। সম্ভবত কোন এক উদার মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধবদের কার্ডটা দেখিয়ে থাকব। তারাই রটনা করেছে আমার মতন বন্যাসেবক এ যুগে দুর্লভ। কাজেই আমাকে দলে নেওয়া উচিত।

তখনকার দিনে লরী এত সহজলভ্য ছিল না। পদব্রজেই দরজায় দরজায় ঘুরতে আরম্ভ করলাম। ভোর থেকে শুরু করেছিলাম, বেলা বারোটা বাজতে আমাদের অবস্থা প্রায় বন্যার্তদের মতনই। তারা উৎকণ্ঠিত জল থেকে উদ্ধার পাবার জন্য, আমাদের উৎকণ্ঠা একবিন্দু জলের জন্য। বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করেছিলাম, কিন্তু ইন্দ্র রায় রোডে এসে আর পারলাম না। এক বাড়িতে একটি প্রৌঢ়া কিছু পুরোনো জামা-কাপড় দিলেন, হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে বললাম, একটু জল দেবেন, বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।

প্রৌঢ়া একবার মুখ তুলে দেখলেন, তারপর ভিতর দিকে চেয়ে বললেন, অরুণা, বাইরে এক গ্লাস জল দিয়ে যা তো।

অরুণা এলেন কাঁসার গ্লাসে জল নিয়ে। সুশ্রী সুগঠিতা কিশোরী। এক মাথা কুঞ্চিত কালো চুলের রাশ। স্বপ্নময় দুটি চোখ। দীর্ঘাঙ্গী।

কাকে দেব ঠাকুমা? কণ্ঠস্বরও মধুময়।

আমরা দুজন ওপরে উঠেছিলাম। প্রৌঢ়া আমার দিকে দেখিয়ে বললেন, একে দাও।

জল পান করলাম। গ্লাসটি মেঝেয় নামিয়ে রেখে এক চোখ প্রৌঢ়ার দিকে আর এক চোখ কিশোরীর দিকে রেখে বললাম, আর একটু জল।

ঈশ্বর জানেন প্রৌঢ়া আমার দৃষ্টির কি অর্থ বুঝলেন। নাতনীকে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। ফিরলেন একলা। হাতে জলের গ্লাস। এত বিস্বাদ জল বোধহয় এর আগে পান করি নি।

সেই বছরেই শেষের দিকে। বাড়িতে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। প্রায় একদিন অন্তর মা চলেছেন মেয়ে দেখতে। ভাইকে নিয়ে। আমি সুবোধ বালকের মতন আগেই বলেছিলাম, মেয়ে আমি দেখতে যাব না। তোমাদের পছন্দই আমার পছন্দ। মনে মনে অবশ্য ভেবেছিলাম, বাইরে থেকে একটা মেয়েকে দেখে কতটুকুই বা বোঝা যায়।

শুনলাম এক জায়গায় মা-র মেয়েটিকে খুব পছন্দ হয়েছে। রূপে গুণে আলো করা মেয়ে। বংশমর্যাদাও কম নয়।

সন্ধ্যাবেলা শুয়ে মাসিকপত্রিকা পড়ছি, হঠাৎ বৌদি ঘরে ঢুকলেন। আপন বৌদি নন, আমাদের ভাড়াটে। অনেকদিন থাকাতে অন্তরঙ্গতা হয়ে গিয়েছিল। বৌদি কাছে এসে একটা ফটো বইয়ের ওপর ফেলে দিলেন। বললেন, মেয়েটিকে কেমন লাগে বলুন? আমাকে আবার আপনার মা-র কাছে রিপোর্ট দিতে হবে।

দেখব না, দেখব না করে আড়চোখে ফটোর দিকে একবার চেয়েই চমকে উঠলাম। এ যে চেনা মেয়ে। অনেক আগে এক তৃষ্ণার্তের পিপাসা মিটিয়েছিলেন।

বিয়ের পরে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম।

তুমি প্রথমবার জল নিয়ে গেলে, পরেরবার আর এলে না কেন বল তো?

মহিলা মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, ঠাকুমা বললে, তোর আর গিয়ে দরকার নেই। তুই গেলে সহজে তেষ্টা মিটবে না! কত আর জল জোগাব!

এরপরেও একবার বেরোতে হয়েছিল বন্যাত্রাণের ব্যাপারে। আসামে বন্যা। এবারের আয়োজন রাজকীয়। লরী ছিল, মাইক ছিল। সঙ্গে ছিলেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত, কাজী আব্দুল ওদুদ, দিনেশ দাশ প্রভৃতি। গৃহিনী বেরোবার মুখে সাবধান করে দিয়েছিলেন, জলতেষ্টা পেলে সোজা বাড়ি চলে এস। অন্য কোথাও যেও না।

মনে মনে বলেছিলাম, আবার।

আবৃত্তিতে ছেলেবেলা থেকেই শখ ছিল। নিখিল ব্রহ্ম সাহিত্য সম্মেলনে পুরস্কারও পেয়েছিলাম পর পর তিন বছর। সাহিত্যিকরা অভিনয় করলেন 'ভাড়াটে চাই'। তাতে আমার কবির ভূমিকা ছিল। একটা দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি। আমার কবিতা আবৃত্তি করার ধরন শৈলজানন্দের ভাল লেগেছিল। ভাল যে লেগেছিল জানতে পারলাম রেডিও থেকে এক চুক্তিপত্র আসতে। শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে আবৃত্তির আয়োজন করা হয়েছে। অংশগ্রহণে প্রবোধকুমার সান্যাল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ডক্টর সদানন্দ ভাদুড়ী ও আমি।

লোকমুখে শুনেছিলাম, প্রবোধকুমার খুব চমৎকার আবৃত্তি করেন। মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর। বিশুদ্ধ উচ্চারণ। অপূর্ব বাচনভঙ্গী। যিনি বলেছিলেন, তিনি আবৃত্তি সম্বন্ধে খুব ওয়াকিবহাল লোক। তাঁর মতামতের ওপর আমার অসীম শ্রদ্ধা।

প্রবোধকুমারের আবৃত্তি স্বকর্ণে শুনে মনে হল, তিনি একটুও অতিরঞ্জিত করেন নি। কণ্ঠসম্পদে, পরিমিত আবেগে এ আবৃত্তি তুলনাহীন।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আলাপ করিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য কাণ্ড, প্রবোধবাবুকে কিছু বলার আগে, তিনিই বললেন, আপনার গলাটি ভারি মিষ্টি। উচ্চারণও জড়তাশূন্য।

প্রোগ্রাম শেষ হতে ট্যাক্সিতে একসঙ্গে ফিরলাম। মাঝখানে আমি। একপাশে প্রেমেন্দ্র মিত্র, আর একপাশে প্রবোধকুমার সান্যাল। সারাটা পথ কল্লোলের আমলের গল্প শুনতে শুনতে এলাম, কল্লোলযুগের দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যিকের কাছ থেকে। এরপরে মাঝে মাঝে প্রবোধকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। মিত্র-ঘোষ প্রকাশনীতে। যেতেই দু হাত প্রসারিত করে আহ্বান করেছেন। সে আসর ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে নি।

এই কিছুদিন আগেও দেখা হয়েছে। ব্রিটেনেশ্বরীর ভারত-

সফরের সময়। রাণী কলকাতা আসছেন দমদম থেকে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু দিয়ে আসছেন। ওই পথের পাশেই আমার অফিস। সকাল থেকেই লোক এসে জড় হচ্ছে আমার কামরায়। ফোনে অনবরত খোঁজ নিচ্ছে পরিচিত লোকেরা। আর স্থান পাবার আশা আছে কি না। বাধ্য হয়েই তাদের নিরুৎসাহ করেছি।

আবার ফোন। তুলতেই উদাত্তস্বর কানে এল।

হরিনারায়ণ!

কণ্ঠস্বরেই মানুষটাকে চিনলাম।

আমি প্রবোধকুমার সান্যাল।

বুঝতে পেরেছি প্রবোধদা। কি ব্যাপার বলুন?

তোমার ওখান থেকে কি রাণীকে দেখা যাবে?

বললাম, সামনের পথ দিয়েই তো যাবেন।

বললেন, তোমার অফিস ক' তলায়?

তিনতলায়। তিনতলার রাস্তার ধারেই জানলা।

অত ওপর থেকে রাণীর মুখ দেখতে পাব? প্রবোধকুমার সংশয় প্রকাশ করলেন।

বললাম, রাণী যদি মুখ তুলে চান, দেখতে পাবেন।

তারের ওপার থেকে বলিষ্ঠ এক হাসির তরঙ্গ শোনা গেল। তরঙ্গ থামলে কণ্ঠস্বর কানে এল, আমি স্ত্রী আর মেয়েদের নিয়ে আসছি। তুমি জায়গা রেখো।

একটু পরেই প্রবোধকুমার এলেন। স্ত্রী আর কন্যাদ্বয় সমভি-ব্যাহারে। ঘণ্টা তিনেক ছিলেন। ভীড়ের জন্য নামতে পারেন নি।

রাণী এলেন ও গেলেন। মধুর টিকা-টিপ্পনী সহযোগে রাণীর সফর উপভোগ করলাম।

দীর্ঘ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। সব সময়ে পাঞ্জাবীর বুকের বোতাম খোলা, কোনরকম বন্ধনে রাজী নন। প্রাণ খুলে হাসেন, কথা কন চিৎকার করে, কাছে টানেন অকৃত্রিম আবেগে। কাউকে ভাল

লাগলে সোজা ভাষায় বলেন। এই প্রবোধ সান্যাল। দুরন্ত বেদুইন, ভুল করে বাঙালীর ঘরে জন্মেছেন।

নায়িকা নিয়ে বিভ্রাটে পড়েছিলাম।

তন্বী, সুন্দরী, শিক্ষিতা। রাগ করে স্বামীর ঘর ছেড়ে এসেছে। পুরাতন প্রেমিকের আস্তানায় গিয়ে দেখে ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী। প্রায় গোটাচারেক সন্তান-সন্ততি নিয়ে জমজমাট সংসার। উঁকি দিয়ে দেখেই নায়িকা ছুটে চলে এসেছে পথে। সেই থেকে পথে পথেই ঘুরছে। কোন একটা ব্যবস্থা করতে পারছি না।

সমাধানের জন্য সহধর্মিনীর শরণ নিয়েছিলাম। তিনি বিরক্ত-কণ্ঠে বললেন, যেখানে ইচ্ছা ঘুরুক। খবরদার, নিজের বাড়িতে এনে তুলতে পারবে না।

মহা সমস্যা। প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলাম, ভৃত্য এসে জানাল, নীচে কে একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী।

নাম কি ?

তা তো জিজ্ঞাসা করি নি। একজন মহিলা !

মহিলা। খাতাপত্র তুলে উঠে পড়লাম। বুঝলাম, স্বাক্ষর-শিকারিণী কিংবা নতুন কোন কাগজের সম্পাদিকা।

বসতে বল, আসছি।

একটু পরে নীচে নামলাম। কোথাও কেউ নেই। সোফা কৌচ খালি।

কি ব্যাপার ? অপেক্ষা করে মহিলা কি চলে গেলেন ?

একটু এগিয়ে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম। দরজার ওপাশে আলো-আঁধারে অস্পষ্ট শ্বেতবসনা এক মূর্তি।

কে ? ভিতরে আসুন।

সাদা কাপড়ে সর্বাঙ্গ আবৃত। নাতিদীর্ঘ চেহারা। ঘোমটার জন্য মুখটা দেখা গেল না।

আশ্চর্য হলাম। ঠিক এ ধরনের অসূর্যম্পশ্যা ব্রীড়াময়ী নারীরা তো আমার কাছে আসেন না। অন্তত এর আগে আসেন নি।

যাঁরা এসেছেন তাঁরা আলোকপ্রাপ্তা। ধরনটা সেই রকম। হাতের অটোগ্রাফ খাতাটা এগিয়ে দিয়ে সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বলেছেন, আপনার একটা সই। শুধু সই নয়, কিছু একটা লিখেও দেবেন।

আবার অনেকে আলোচনা করেছেন সন্ত-প্রকাশিত উপন্যাস নিয়ে। রচনার রীতিনীতি, চরিত্র-চিত্রণ, বিষয়বস্তু। সব সময়ে যে অবিমিশ্র প্রশংসা এমন নয়, সমালোচনার হুলও ছিল। চুপ করে শুনেছি। বিগলিত হইনি, বিচলিতও নয়।

কিন্তু ইনি কে?

মহিলা বসলেন না। কৌচের ধার ঘেঁসে দাঁড়ালেন।

বললাম, বসুন। কি দরকার বলুন?

ঘোমটা একটু সরে গেল। খুব সামান্য। কাজল কালো দুটি চোখ। ম্লান, নিস্তেজ কণ্ঠস্বর।

আপনি হরিনারায়ণবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহিলার বোধহয় সন্দেহ হল। চেহারাটা ঠিক সাহিত্যিক-জনোচিত নয় হয়তো, কিংবা তাঁর মনে গড়া মূর্তিটার সঙ্গে আমার কাঠামো মিলল না।

আবার প্রশ্ন করলেন, সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়?

হ্যাঁ। একটু-আধটু লিখি। কিন্তু বসুন আপনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা হয়?

মুহূর্তের দ্বিধা আর জড়তা। মহিলা খুব চেষ্টায় যেন সঙ্কোচের কাঁটাতার সরিয়ে ফেলছেন। আস্তে আস্তে কৌচের ওপর বসলেন। ঘোমটার পাশ খোলা—চুলের রাশ দেখা গেল।

আমিও বসলাম। সামনাসামনি।

চকিতের জন্য কথাটা মনে হল। কোন দুঃস্থ সাহিত্যিকের স্ত্রী নন তো? এরকম দু-একজন আজকাল আসেন। তবে একলা নয়। সঙ্গে স্বামীও থাকেন।

হঠাৎ চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল মহিলার আকস্মিক রূঢ় কণ্ঠে।

আপনি আমার এ সর্বনাশ কেন করলেন?

সর্বনাশ? অবাক হলাম। জ্ঞানত কখনও কারো অনিষ্ট করেছি বলে তো মনে হয় না। সাহিত্যিকদের তো নয়ই, সহ-কর্মীদেরও নয়। নিজেকে সর্বদা গুটিয়ে রাখি। শামুকের খোলের মধ্যে আত্মগোপন। যেখানে অশান্তির আঁচ, পারতপক্ষে সেদিকে যাই না। এর জন্য অসুবিধাও কম ভোগ করতে হয় নি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন হঠাৎ-নাম করা সাহিত্যিকের আত্মশ্লাঘার দামামা দু কান পেতে শুনতে হয়েছে, শুনতে হয়েছে কূটনীতিবিদ সম্পাদকের নির্লজ্জ প্রচার কাহিনী, অসাধু প্রকাশকের ব্যঙ্গস্তুতি।

আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

এবার মহিলা ঘোমটা সম্পূর্ণ অপসারিত করলেন। অবগুণ্ঠন যেন খোলস। সরে যেতে গুটি পোকা রূপান্তরিত হল প্রজাপতিতে।

সুগৌর বর্ণ, আয়ত কাজল দুটি চোখ, রক্ত অধর, সীমন্তে সিঁদুরের অস্পষ্ট বিন্দু।

আপনি অজয়দাকে চেনেন?

কোন্ অজয়দা?

অজয় বসাক। কলেজের লেকচারার?

মহিলা কলেজের নামটাও বললেন।

এদেশের স্কুল কলেজের সঙ্গে পরিচয় খুব কম। চিরদিন বিদেশেই লেখাপড়া করেছি। স্কুলের প্রথম ক্লাশ থেকে কলেজের শেষ শ্রেণী পর্যন্ত। এখানে পড়াশোনা করলে হয়তো যে সব সহপাঠীরা অধ্যাপনা করতেন কিংবা শিক্ষকতা, তাঁদের সঙ্গে

যোগাযোগ থাকত। নিছক গল্প উপন্যাস লিখি। নির্ভেজাল কথা-সাহিত্য। পাঠ্যপুস্তক কিংবা অর্থপুস্তকের রচয়িতা হলে হয়তো অধ্যাপকদের সঙ্গে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষির প্রয়োজন হত।

কাজেই বললাম, না চিনি না।

চেনেন না? মহিলা বঙ্কিম ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, দু চোখে সন্দেহের ঝিলিক। অপ্রত্যয়ের জোনাকি!

বুঝলাম মহিলা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না।

না। এদেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশিদিনের নয়। আমি চিরকাল বিদেশে মানুষ।

আপনি কোনদিন কোচবিহারে ছিলেন?

না। কোচবিহারে অফিসের কাজে গিয়েছি, কিন্তু একরাতের বেশি থাকি নি।

বিব্রত বোধ করলাম, কিছুটা বিরক্তও; এত কৈফিয়ৎ তলব করার কি আছে? বসে বসে আমার নাম ধাম, গোত্র কুলুজি বলে যেতেই বা হবে কেন?

স্বরে অল্প কাঠিন্য মিশিয়ে বললাম, কিন্তু এত সব প্রশ্ন কেন করছেন বলুন তো? কি আপনি জানতে চান?

মহিলা মুখ তুললেন। দুটি চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি আমার উপর রেখে বললেন, জানতে চাই, আমি আপনার কি করেছি, কেন আপনি আমার এই চরম সর্বনাশ করলেন?

তখন থেকে সর্বনাশের কথাটা বলছেন, কিন্তু কি সর্বনাশ আপনার আমি করেছি সেটা না জানলে উত্তর দিই কি করে? আমি সামান্য সাহিত্যিক, অসামান্য জ্যোতিষী যে নই, সেটা আশা করি জানেন।

শুনুন তাহলে।

মহিলা একটু সহজ হয়ে বসলেন। আরম্ভ করার আগে ঘাড় ফিরিয়ে একবার খোলা দরজার দিকে চেয়ে বললেন, দরজাটা বন্ধ

করে দেওয়া যায় না? যে কথাগুলো আপনাকে বলব সেগুলো শুধু ব্যক্তিগতই নয়, একান্ত গোপনীয়।

ক্রমেই সবকিছু রহস্যময় হয়ে উঠেছে। উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। বাইরের দরজাটা। ভিতরের দিকের দরজাটায় ভাল করে পর্দা টেনে দিলাম।

ফিরে কৌচে বসে বললাম, বলুন কি বলতে চান।

মহিলা শুরু করলেন।

গ্রামের নাম কাঞ্চনপুর। ব্রজবল্লভবাবু পুরোনো মোক্তার। এককালে নাম, অর্থ, প্রতিপত্তি সবই ছিল, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি কমে এল। শুধু দেহের নয়, অর্থোপার্জনেরও। সঞ্চয়ী ছিলেন না। ফলে শেষ বয়সে সমর্থ অবিবাহিতা মেয়েকে নিয়ে মুস্কিলেই পড়লেন। স্ত্রী গত হয়েছিলেন বছর চারেক আগে। গোটা তিনেক মেয়ের বিয়ে দিতেই স্বল্প সঞ্চয় তলানিতে এসে ঠেকেছিল। একটি মাত্র ছেলে। মানুষ হয় নি। এক মাড়োয়ারীর গদিতে খাতা লিখত। মাড়োয়ারীর কাছে পাওয়া টাকা নিবেদন করত বিহারী এক রমণীর পায়ে। তার আশ্রয়েই থাকত। ব্রজবল্লভবাবু বলতেন, আমার ছেলে নেই। যে আছে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে!

বাড়ির দেয়াল না থাকলে যেমন আব্রুরক্ষা পথচারীর কৃপার ওপর নির্ভর করে, তেমনি বাড়িতে মা না থাকলে, বাড়ির উঠতি বয়সের মেয়ের সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্বও পাড়ার ছেলেদের ভদ্রতার ওপর ন্যস্ত হয়। তাই হল। খিড়কির পুকুরে জল নিতে যাবার সময় মেয়েটির গায়ে পাকানো কাগজ এসে পড়ত। ঝোপঝাড় থেকে রসিকতা, কান লাল করা টিটকারি। মুখ বুজে সব সইতে হত। এসব কথা অথর্ব বাপকে বলা মানে তাঁর জ্বালা বাড়ানো।

কিন্তু মেয়েটি পার পেল না। সব সময় সব মানুষকে এড়ানো

যায় না। মনেরও অগোচরে রহস্যলোকে কার জন্য আসন পাতা থাকে বোঝা যায় না। শুধু একটু দৃষ্টি বিনিময়, ত্ব-গালে রক্তের সঞ্চার, বুকের স্পন্দন দ্রুততর। অলঙ্ঘ্য অতনুর বাঁধনে তুটি হৃদয় বাঁধা পড়ে।

তেমনই হল।

স্নান সেরে জলভরা কলসি কাঁখে নিয়ে মেয়েটি বাড়ি ফিরছিল। একটু বুঝি অন্যমনস্কও ছিল, হঠাৎ ঝোপের পাশ থেকে একটা সাইকেল। তীব্র গতিতে একেবারে সামনে এসে পড়ল।

আর একটু হলে কাঁখের কলসী মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে যেত। জল চলকে বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিল। বাবলাগাছের ডাল ধরে টাল সামলাল।

মুখটা তুলে সামনে চাইতেই আর চোখ নামাতে পারল না।

এ গাঁয়ের কেউ নয়। দীর্ঘ সুশ্রী চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত তুটি চোখ। অপ্রস্তুত গলায় বলল, মাপ করবেন। দোষ আমার। একটু সাবধান হয়ে চালানো উচিত ছিল।

মেয়েটির তখন উত্তর দেবার মতন অবস্থা নয়। চোখের পাতায় রাজ্যের লজ্জা এসে নেমেছে। বুকের কাপড় ভিজে খেয়াল হতে শুধু সে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

এইখানে মহিলা একটু থামলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, কি, মনে পড়ছে ?

বিস্মিত হলাম, কি মনে পড়বে ? বললাম, কি মনে পড়ার কথা বলছেন, বলুন তো ?

এ ধরনের গল্প লেখেন নি আপনি ?

সম্পাদকের তাগিদে, নিজের হৃদয়ের তাগিদে গল্প বড় কম লিখি নি। সব গল্প নিজেরই মনে নেই। তাই বললাম, আর একটু বলুন, তা হলে বুঝতে পারব।

মহিলা বললেন, সেই প্রথম দেখা, কিন্তু শেষ নয়। মেয়েটির

স্নান করতে যাবার কিংবা ফিরে আসার সময়ের সঙ্গে ছেলেটির ওখান দিয়ে যাবার সময়ের অদ্ভুত মিল দেখা যেতে লাগল। কোন কথা নয়। শুধু ভীরু দুটি চোখ তুলে দেখা, মেয়েটির পক্ষ থেকে। আর ছেলেটির তরফে মুচকি হাসি।

একদিন মেয়েটি ঘরের মধ্যে রান্নায় ব্যস্ত ছিল, বাপের ডাকে বাইরে বেরিয়েই থমকে দাঁড়াল।

বাপের পাশে ছেলেটি বসে আছে।

ডাকলে বাবা?

হ্যাঁরে। তুই অজয়কে চিনিস? বাপ পাশে বসা ছেলেটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

মেয়েটি কিছু বলল না। চেনা মানে কি শুধু পরিচয় জানা! নাম, ধাম, গোত্র! যার পায়ের শব্দে বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে, সমস্ত শরীরে ছন্দ নামে, জীবন একটা সঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়, তাকে শুধু চিনি বললে কতটুকু বলা হয়!

বাপই বললেন, তুই চিনবিই বা কি করে? আমাদের বেহারীবাবুর ছেলে। বেহারীবাবু আবার সম্পর্কে আমার দাদা হন। খুব দূর সম্পর্কে অবশ্য। অজয় এবার এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে গাঁয়ে এসেছে। ছুটিতে। পরীক্ষার ফল বেরোলেই চলে যাবে।

অজয় এবার কথা বলল, অনেক আগে একবার তোমাকে দেখেছিলাম। তখন তুমি খুবই ছোট।

মেয়েটি চুপচাপ। শুধু মনে মনে হিসাব করল। কবে দেখা হয়েছে! কত আগে। এ জন্মে না বিগত জন্মের কোন শুভলগ্নে? জন্মজন্মান্তরের পরিচয় না হ'লে দেখার জন্য সমস্ত হৃদয় কেন এমন উন্মুখ হয়ে থাকে?

এরপর মাঝে মাঝে অজয় এসেছে। অনেক সময় বাপ বাড়িতে থাকতেন না। মেয়েটি রান্নাঘরে ব্যস্ত। অজয় চৌকাঠ চেপে বসেছে। একটানা গল্প করেছে। মেয়েটির হাতের তৈরি চা খেয়ে তারিফ করেছে।

তারপর একদিন মোক্তারবাবুর কাছে কথাটা পেড়েছে।

বিয়ের কথাবার্তা যেমন চলছে চলুক। সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াটা করে যেতে আর কি ক্ষতি।

কথাটা মোক্তারবাবুর মনে লেগেছে। বইপত্র এসেছে। কিছু মোক্তারবাবু কিনেছেন। কিছু অজয় যোগাড় করেছে। সকালে মেয়ের সময় নেই। রান্নাবাড়া সংসারের কাজ করতেই সময় কেটে যায়। বিকেলে পড়তে বসেছে। একপাশে অজয়, অন্য পাশে মেয়েটি, মাঝখানে বই খাতার স্তূপ। কিন্তু সেই স্তূপীকৃত বইখাতা পার হয়ে একটি হৃদয়ের আর একটি হৃদয় ছুঁতে কোন অসুবিধা হয় নি।

মাস দুয়েকের মধ্যেই দুজনে বুঝতে পারল একজনকে ছাড়া আর একজনের জীবন অর্থহীন। আর ঠিক সেই সময়েই দুজনের খেয়াল হ'ল, অজয় কায়স্থ, মোক্তারবাবুরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু তখন এই ছোট্ট বাঁধ উদ্দাম উচ্ছ্বসিত জলধারাকে রোধ করতে পারল না। কূল ছাপিয়ে, বুক ছাপিয়ে সে স্রোত আবর্তের সৃষ্টি করল।

তারপর আঘাত এল একেবারে আচমকা।

অজয়ের এম. এ. পরীক্ষার খবর বের হল। সঙ্গে সঙ্গে চাকরির সন্ধানও এসে গেল। বেসরকারি কলেজে অধ্যাপকের পদ। সম্ভবত অজয় দরখাস্ত করেছিল।

মেয়েটির দুটি হাত ধরে অজয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল সে ফিরে আসবে। মেয়েটি যেন প্রতীক্ষা করে।

কিন্তু অজয় আসবার আগে আর একজন এল।

এইখানে মহিলা একটু থামলেন। বললেন, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন? গলাটা শুকিয়ে এসেছে।

নিশ্চয়।

ওপরে উঠে এলাম। সহধর্মিনীর একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলাম।

কি ব্যাপার? কে এসেছেন?

একটি মহিলা।

তাতো শুনেছি, কিন্তু এতক্ষণ কি কথা ?

মহিলা বোধ হয় তাঁর জীবনী শোনাচ্ছেন। হয়তো বলবেন এই নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে।

শুধু জল দেবে ?

জল ছাড়া এ বাড়িতে আর কিছু স্পর্শ করবেন বলে মনে হয় না।

কেন ?

আমি নাকি ওঁর সর্বনাশ করেছি।

সর্বনাশ !

প্রথমেই তো তাই বললেন। সেই সর্বনাশের ফিরিস্তিই শোনাচ্ছেন।

জল নিয়ে নেমে এলাম।

গ্লাসটা টিপয়ের ওপর রেখে বললাম, বাড়িতে শুধু জল দিতে ইতস্তত করছিল। জলের সঙ্গে কিছু—

মহিলা কোন কথা বললেন না। জ্বলন্তদৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চাইলেন, তারপর গ্লাসটা তুলে এক নিশ্বাসে পান করলেন।

শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে আবার শুরু করলেন ঃ

বিরাট চেহারা। মসীবর্ণ। ভাঁটার মতন ছুটি চোখ, চামর গোঁফ। বয়সও নিন্দার নয়।

দাদা সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

মেয়েটি আশ্চর্য হল! মোক্তারবাবুও। সাত জন্মে এ পথ মাড়ায় না, অবশ্য এ ভিটেয় পা দিক তাও চান না মোক্তারবাবু, সেই ছেলে হঠাৎ এসে হাজির।

দরজা বন্ধ করে বাপ আর ছেলেতে কথা হল। লোকটি বসে রইল বাইরের দাওয়ায় তারপর বন্ধ ঘর খুলে বাইরে এসে মোক্তার-বাবু লোকটিকে প্রায় রাজোচিত আপ্যায়ন শুরু করলেন।

ভিতরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি হতবাক।

একটু একটু করে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।

মসীকৃষ্ণ লোকটির পাটের ব্যবসা। রুপোবরণ পাট তার সিন্ধুকে সোনার রূপ নেয়। অর্থ প্রচুর হলে হবে কি, বিধাতা সুখ লেখেন নি কপালে। প্রথম স্ত্রী গত হয়েছে, আড়াই বছর। ছেলেপুলে নেই, সংসার মরুভূমি। মোক্তারবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে তাঁর মেয়েটিকে উঠানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। সেই থেকেই মনস্থির করে ফেলেছে আর একবার দারপরিগ্রহ করা খুব প্রয়োজন। মোক্তারবাবুর ছেলের সঙ্গে ব্যবসার ব্যাপারে আগেই আলাপ ছিল, কিন্তু সে যে এ বাড়ির ছেলে সে-পরিচয় পেল অনেক পরে।

এখন মোক্তারবাবুর যদি মত হয়, মেয়েটিকে ঘরে তুলতে পারে। শুধু চাঁদ নয়, মোক্তারবাবু যেন নামকরা সব গ্রহ-উপগ্রহগুলোকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলেন। দু হাত জোড় করে বিগলিতকণ্ঠে বললেন, আমার মেয়ের মহাভাগ্য, তোমার মতন লোকের হাতে পড়বে।

সে রাত্রেই মেয়েটি অজয়কে চিঠি লিখল। সব জানিয়ে। ভোরবেলা পূজার ফুল তোলবার অছিলায় চিঠিটা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে নিজে গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এল।

চিঠি এল না। মানুষটা এল। কিন্তু নিতান্ত অসময়ে। ছাঁদনাতলা থেকে মেয়েটি বরের পিছন পিছন বাসরঘরের দিকে চলেছে। আঁচলে চাদরে বাঁধা। হঠাৎ মুখ তুলতেই চোখাচোখি হ'ল।

ম্লান, বিষণ্ন মুখ। নিস্তেজ, দীপ্তিহীন দুটি চোখ। বিবর্ণ অধর। এলোমেলো চুলের রাশ।

ছেলেটি বলল, কিংবা মেয়েটির মনে হ'ল ছেলেটি যেন বলল, দেরী হয়ে গেছে। আমার একটু দেরী হয়ে গেছে। চিঠিটা ঠিক সময়ে পেলে কিন্তু একটা ব্যবস্থা করতাম।

মেয়েটি চোখে আঁচলচাপা দিয়ে বাসরঘরে ঢুকল। বিয়ের আগে লোকটাকে যতটা অর্থবান বলে মেয়েটি শুনেছিল, সংসারে ঢুকে দেখল অর্থ হয়তো অনেক নেই কিন্তু লোকটার হৃদয় আছে। মেয়েটিকে নিয়ে যে কি করবে ভেবেই পেল না। প্রথমা স্ত্রীর একটা ফটো টাঙানো ছিল দেয়ালে, লোকটি সসঙ্কোচে মেয়েটিকে বলল, তুমি যদি বল এটা খুলে রাখি।

না না, খুলে রাখবার কি দরকার। থাক না দিদির ফটোটা। রোজ প্রণাম করব।

আদরে যত্নে, সোহাগে স্নেহে তু দিনে লোকটা অজয়দাকে আড়াল করে দাঁড়াল। ব্যবসায় লাভ হলে কিংবা হঠাৎ কোথাও থেকে টাকা এসে গেলে লোকটি কখনও খালি হাতে আসত না। মেয়েটির জন্য শাড়ি, গয়না কিংবা প্রসাধনদ্রব্য নিয়ে আসত। মেয়েটি বারণ করলেও শোনে নি। বলেছে, তুমি পয়মন্ত, তোমার জন্য এসব পাচ্ছি। কাজেই দেবীকে সন্তুষ্ট করাই প্রধান কর্তব্য।

লোকটা বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে কাটাত। কাজের জন্য মফস্বলে মফস্বলে ঘুরে বেড়াতে হত। সেই সময়টা মেয়েটি একেবারে একলা। একটি কথা বলারও সঙ্গী নেই। চুপচাপ বসে থাকত জানালার ধারে, কিংবা কিছু বুনতো।

কে জানত অলক্ষ্যে আর একজন তার ভাগ্যের জাল বুনছে।

এমনি এক নিঃসঙ্গ তুপুরে পোস্টম্যান এসে দরজায় দাঁড়াল। হাতে চিঠি।

মেয়েটি ভাবল তার বাপের চিঠি, কিন্তু চিঠিটা হাতে নিয়েই বুঝতে পারল অপরিচিত লোকের লেখা। মুক্তার অক্ষরে মেয়েটির নাম লেখা।

কম্পিতহাতে মেয়েটি চিঠি খুলল। একবার, তুবার করে অনেকবার পড়ল। অজয়দার চিঠি। যাকে ঘিরে সমস্ত যৌবন স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল, যার স্পর্শে কোরক শতদলে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেই অজয়দা।

চিঠিটা কোলে নিয়ে মেয়েটি অনেকক্ষণ বসে রইল। কি করবে সে এখন ?

অজয়দা উত্তর চেয়েছে। একদিন যে কাছে আসতে চেয়েছিল, অজয়দার জন্য অপেক্ষা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার উত্তর।

এই পরিপূর্ণ সংসারের মধ্যে বসে স্বামীর ভালবাসায় আচ্ছন্ন মনকে কি করে মেয়েটি আর একজনের করপুটে তুলে দেবে ? এক প্রতিশ্রুতি রাখতে কি করে ভাঙবে আর এক প্রতিশ্রুতি ?

সারারাত মেয়েটি বিছানায় ছটফট করল। বিস্বাদ লাগল স্বামীর স্পর্শ। তার দেওয়া উপহার উৎকোচ বলে মনে হল।

পরের দিন মেয়েটি নিজের মন গুছিয়ে নিল। তার জীবনে অজয়দাই প্রথম পুরুষ। আর একজন সংস্কৃত মন্ত্রের ছলনার মধ্য দিয়ে কাছে আসার চেষ্টা করেছে। প্রাচুর্যের বিনিময়ে কিনতে চেয়েছে তার হৃদয়কে। এ প্রেম নয়, প্রেমের বিকার।

মেয়েটি তার অজয়দাকে দীর্ঘ এক চিঠি লিখল। অন্তরের সমস্ত বেদনা উজাড় করে। স্বীকার করল তার নতুন সংসার অজয়দাকে আড়াল করে রাখতে পারে নি। সংসারের নতুন মানুষটিও নয়।

তারপর শুরু হল প্রতীক্ষা। পত্রই যেন প্রিয়তম হয়ে উঠল। এইখানে মহিলা একটু থামলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন—কি মনে পড়ছে ?

ঘাড় নেড়ে বললাম, না।

সত্যিই মনে পড়ে নি। প্রেমের ত্রিভুজ নিয়ে কিছু গল্প রচনা করেছি। তৃতীয় এক পুরুষ কিংবা তৃতীয়া এক নারী না থাকলে ভালবাসার স্তূপ নির্লবন।

মহিলা আঁচল দিয়ে কপালের জমে ওঠা ঘামের বিন্দু মুছে নিলেন। কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, সাহিত্যিকের চেয়ে সুবিধাবাদী বোধ হয় পৃথিবীতে কেউ নেই।

উত্তর দিলাম না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু ভাবলাম, সত্যিই যদি সাহিত্যিকরা সুবিধাবাদী হতে পারত! পারত যদি সব সুযোগ-গুলোর সদ্ব্যবহার করতে, তা হলে এ ভাবে নিজেদের নিষ্পিষ্ট করে, নিশ্চিহ্ন করে নিজেদের সৃষ্টি লোকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করত না। অর্থের বদলে বিবেক বিক্রি করতে পারে না বলেই তাদের এই জীবন্মৃত অবস্থা।

এসব কথা মহিলাকে বলে লাভ নেই। সমবেদনার মন নিয়ে তিনি আসেন নি। এসেছেন অভিযোগ নিয়ে, আক্রোশ নিয়ে, তাঁর সর্বনাশ যে করেছে উদ্ধত ভঙ্গীতে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে।

চিঠি বিনিময় চলতে লাগল। তৃষিত দুটি হৃদয়ের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খা সাদা কাগজের বুকে কালির আঁচড়ে ফুটে উঠল। মেয়েটির এই ভাবান্তর বাড়ির মানুষটার নজর এড়াল না। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, সহানুভূতি নিয়ে সে আরো কাছে আসার চেষ্টা করল।

তোমার কি হয়েছে বল তো? শরীর খারাপ নাকি?

মেয়েটি উত্তর দিল না। বাড়ির লোকের সঙ্গ তখন তার বিষবৎ মনে হয়েছে। বার বার মনে হয়েছে এক দৈত্য এসে তার দয়িতের স্থান দখল করেছে!

কিছুদিন পরেই মেয়েটির স্বপ্নভঙ্গ হল।

এবার অজয়দার চিঠিতে লোভের সুর। স্বার্থপরতার ছিটে।

কে একজন ধনী পাটের ব্যবসায়ী নতুন এক কলেজ খোলার ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছেন। অনেক টাকা ঢেলে বিরাট এক কলেজের পত্তন করছেন। মেয়েটির স্বামীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক। পাটের কারবারের মাধ্যমে। সেই কলেজে অজয়ের একটা চাকরির প্রয়োজন। এটুকু কি অজয় আশা করতে পারে না মেয়েটির কাছে? যদি এই লোভনীয় চাকরিটা জুটিয়ে দিতে পারে, তবেই বোঝা যাবে তার প্রেমের পরিমাপ।

মেয়েটি হতাশ হল। এই বুঝি ভালবাসার পরীক্ষা। এর

চেয়ে যোগ্যতর কোন নিরিখ অজয়দা খুঁজে পেল না। প্রিয়তমকে চাকরি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে প্রেমের গভীরতা!

মেয়েটির সন্দেহ হল। চিঠি লেখার সূত্রপাতই এই উদ্দেশ্যে কিনা কে জানে! মেয়েটি হয়তো গৌণ, আসল লক্ষ্য লোভনীয় চাকরি।

মেয়েটি থেমে গেল। কোন উত্তর দিল না। পর পর দুটি স্মারক-লিপি আসা সত্ত্বেও।

তারপর অজয়দার মুখোশ খুলে গেল।

একদিন বাড়িতে এক পত্রিকা এসে হাজির।

মেয়েটির স্বামীর নামে।

মেয়েটি রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল, লক্ষ্য করে নি।

লক্ষ্য যখন করল, তখন চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে।

বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে লোকটি মেয়েটির বাক্স খুলে লাল ফিতে বাঁধা চিঠির স্তূপ নিয়ে বসেছে বিছানার ওপর।

মেয়েটি ছুটে বাধা দিতে গিয়ে লোকটির ধাক্কায় ছিটকে চৌকাঠের ওপর পড়ল। কপাল বেয়ে রক্তের ধারা। কিন্তু সে স্রোতে পাপ মুছল না, কলঙ্কও না।

ঘৃণিত দৃষ্টি ফিরিয়ে লোকটি শুধু বলল, ছি।

পাশে রাখা পত্রিকাটা ছুঁড়ে মেয়েটির পায়ের কাছে ফেলে দিল। কণ্ঠে তীব্র বিষ ঢেলে বলল, এই লেখক আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। আশ্চর্য কাণ্ড, নাম ধাম বয়স মিলে গিয়েছে! এমন কি চিঠিগুলো কোথায় পাওয়া যাবে সে জায়গার নির্দেশ পর্যন্ত। খুব সম্ভব তোমার অজয়দাই বোধ হয় ছদ্মনামে লিখেছেন গল্পটা। তাঁর খেলা শেষ, তাই সব কিছু জানাতে আর দ্বিধা নেই।

একটু থেমে লোকটি আবার বলল, আমি পাটের ব্যবসায়ী। ন্যায্য দাম দিয়ে পাট কিনতে সর্বদাই রাজী, কিন্তু পাটের মধ্যে কেউ যদি মেস্তা মিশেল দেয়, আসল জিনিসের বদলে ভেজাল চালাবার চেষ্টা করে, তার সঙ্গে কারবার করি না। তুমি শুধু আমারই নয়,

বিয়ের পবিত্রতার অসম্মান করেছ। তোমাকে এ-গৃহে স্থান দিলে আমি ধর্মে পতিত হব। অন্য কোন বাইরের ধর্মে নয়, মানুষের ধর্মে, যে ধর্ম বিবেক-প্রধান।

মেয়েটিকে সে আশ্রয় ছাড়তে হল। চোখের জলে, অনুনয়ে, উপরোধে পাষাণ গলল না। স্নেহে, মায়ায়, মমতায় যে মানুষ দূর্বার মত কোমল ছিল, মেয়েটির বিশ্বাসঘাতকতায় সেই লোকই অঙ্কুশের মতন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

মেয়েটি ঘর ছাড়ার সময় একটি জিনিসও নিয়ে আসে নি, কেবল সেই পত্রিকাটি বুকে করে এনেছিল। সে গল্পটি কার লেখা আশা করি তা বলে দিতে হবে না।

কার লেখা ?

আপনার। অজয়দার প্ররোচনায় আপনি লিখেছেন। আমার সংসার ভেঙে, আমাকে নিরাশ্রয় করে অজয়দা প্রতিশোধ নিয়েছে। আপনি তাকে সাহায্য করেছেন। অজয়দা মেয়েটির ঠোঁটের সামনে বিষপাত্র তুলে ধরেছে, সে বিষ যুগিয়েছেন আপনি।

কিন্তু বিশ্বাস করুন, ও ধরনের কোন গল্প আমি লিখি নি। আপনি পত্রিকাটা বরং নিয়ে আসুন একদিন।

এতক্ষণ পরে এই প্রথম মহিলাটি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, রাগের মাথায় সে পত্রিকা আমি খণ্ড বিখণ্ড করেছি। পত্রিকার নামটাও আমার মনে নেই, কিন্তু আপনার নাম আমার মনে আছে। যতদিন বাঁচব আপনার নাম আমি ভুলব না। কেন আপনি আমার এ সর্বনাশ করলেন ? আপনার কোন ক্ষতি তো আমি করি নি !

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে মহিলা তীরবেগে বেরিয়ে গেলেন।

বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে রইলাম। অযথা অপরাধের গুরুভার মহিলা আমার ওপর চাপিয়ে গেলেন। ও গল্প যে আমার লেখা নয়, এ কথা আমার চেয়ে ভাল করে আর কে জানে।

কৌচের ওপর মহিলার মাথার একটা কাঁটা। দোমড়ানো নিষ্প্রভ। একটা অভিশপ্ত জীবনের প্রতীক।

নির্নিমেষ নেত্রে সেই দিকে চেয়ে রইলাম।

বিখ্যাত তিনজন সাহিত্যিক বাংলার বাইরে থাকেন। একজনের সঙ্গে কালে-ভদ্রে দেখা হয়। তুজনকে কোন দিনই দেখিনি। যার সঙ্গে দেখা হয়, তিনি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সরস গল্পের জাতুকর। একটি গল্পের নাম দীন্নু রক্ষিত। ট্রেনের কামরায় দারুণ ভীড়। এক কাবুলীর সঙ্গে কৃশকায় বাক্-সম্বল এক বাঙালীর বচসা। কাবুলী দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, সাহসে বাঙালীটির কাছে দৈত্য বিশেষ। কাজেই সে নির্বিবাদে যতটা সম্ভব জায়গা দখল করল। দারুণ অবহেলা আর উপেক্ষাভরে গোটা কামরার দিকে চেয়ে অবজ্ঞার হাসি হাসল। দীন্নু রক্ষিত, সেই দীন বাঙালীটির নাম, যে শাসাল, আসুক অণ্ডাল, সেখানে সে খাঁ সায়েবকে একবার দেখে নেবে।

কামরাশুদ্ধ লোক এ আস্ফালনে হতবাক। কি ব্যাপার! এই শীর্ণ পাঁজরা-প্রকট লোকটি কোন গুণ্ডাদলের সর্দার নাকি? কিংবা কোন গোপন রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসবাদী সভ্য। অণ্ডালে খাঁ সায়েবের কি অবস্থা হয়, দেখবার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে রইল।

গাড়ি অণ্ডাল এল। দীন্নু রক্ষিত জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে প্লাটফর্মের উল্টোদিকে কিছুক্ষণ কি খুঁজল, তারপর চিৎকার করে ডাকল, খাঁ সায়েব, ও খাঁ সায়েব।

পাশে দাঁড়ানো গাড়ি থেকে এক কাবুলী উঁকি দিল। চেহারা রোঁয়া-ওঠা বিলিতী কুকুরের মতন। শীর্ণকায়। কোটরগত চক্ষু, পাংশু মুখ, করুণ চেহারা। বীররসের ছিটে-ফোঁটাও নেই। না আকৃতিতে, না প্রকৃতিতে।

এ গাড়ির কাবুলীর সঙ্গে ও গাড়ির কাবুলীর মোলাকাৎ হল দীন্নু রক্ষিতের মাধ্যমে। তু একটা বাত-চিত, ব্যস, এ গাড়ির

আস্ফালনকারী কাবুলী তীরবেগে গাড়ি থেকে নেমে উল্টোদিকের গাড়িতে গিয়ে বসল।

কামরাশুদ্ধ লোক বিস্মিত। কি ব্যাপার? কি এমন শুনল কাবুলী যে, এমন নক্ষত্রবেগে একেবারে উল্টোদিকের গাড়িতে চেপে বসল।

দীনু রক্ষিত মুচকি মুচকি হাসল। তারপর বলল, দেখলেন না ও গাড়ির খাঁ সায়েবের অবস্থা! ম্যালেরিয়ায় ওই হাল হয়েছে। দুই বন্ধুতে ওই কথাই তো হল। বাংলায় গেলে চুপসে কি দশা হবে, তাই দেখেই এ গাড়ির খাঁ সায়েব প্রাণভয়ে পালালেন দেশের দিকে।

নিটোল, নিখুঁত গল্প। রসোচ্ছল। এমন একটি গল্পের লেখককে দেখার ইচ্ছা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মনে মনে তাঁর একটা ছবিও এঁকেছিলাম। হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। সদাহাস্য-বদন।

একদিন দেখাও হয়ে গেল। বাস থেকে বিভূতিবাবু নামছিলেন। সঙ্গের এক বন্ধু বললেন, উনি বিভূতিভূষণ। তখন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকান্তরিত হয়েছেন, কাজেই পদবীটা বলার প্রয়োজন হল না।

আমি হতাশ হলাম। একাহারা চেহারা। ভ্রূকুটি-রেখাঙ্কিত মুখ। দর্শনের অধ্যাপক যেন কান্টের রিগরিজম নিয়ে চিন্তা করছেন, এমন ভাব। ইনি গণশা, ঘোঁৎনা, রাজেনের স্রষ্টা মনে করতেও ভাল লাগল না।

পরে অবশ্য বুঝেছি রসের মতন রসস্রষ্টাও দ্বিবিধ। কয়েকজন রসগোল্লা জাতীয়। সারা অবয়ব বেয়ে উপচে পড়ে রসের স্রোত। শিবরাম চক্রবর্তীকে দেখে আমার এই কথাই মনে হয়। আর এক রসিক ইক্ষুদণ্ড প্রতিম। বাহ্যিক শুষ্ক কাঠামোর অন্তরালে রসের ফল্গুধারা। বিভূতিভুষণ এই রসের কারবারী। অনেক পরে আলাপ

হয়েছিল। সংযতবাক গম্ভীর প্রকৃতির লোক। দেখা হলেই কুশলবার্তা, শরীরের খবর। আমার সঙ্গে আলাপের মাত্রা এর বেশি এগোয় নি।

যে দুটি সাহিত্যিককে বহুদিন পরে দেখেছিলাম, তাঁরা বনফুল আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুনেছি, প্রথমদিকে বনফুল একটা পোস্টকার্ডে ছোটতম গল্প লিখে পাঠাতেন। কয়েক লাইনের সে গল্প আঙ্গিকে, রচনা-পারিপাট্যে, বিষয়-বৈচিত্র্যে মুক্তার মত নিখুঁত। ধারণা করা যায় না, এই কয়েক লাইনের ছোট গল্পের লেখকের লেখনী থেকেই রূপ নিয়েছে এপিকধর্মী উপন্যাস—স্থাবর, জঙ্গম। এ ছাড়া কবিতাতেও এঁর অপূর্ব দক্ষতা। ব্যঙ্গ কবিতাতে তো বটেই। মাঝে মাঝে শুনি, তিনি কলকাতায় আসেন। আমি যে প্রকাশককুলের কাছে যাই, তাঁরও যাওয়া-আসা তাঁদেরই কাছে।

এক সন্ধ্যায় ডি. এম. লাইব্রেরিতে যেতেই গোপালবাবু বললেন, দেখা হল বনফুলের সঙ্গে ?

বললাম, কই না। কোথায় তিনি ?

একটু আগে দোকান থেকে নামলেন। পঞ্জাবীপরা লম্বা-চওড়া চেহারা।

না, দেখিনি তো।

নিজের ওপর রাগ হল। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কলকাতার জনারণ্যে মানুষটা কোথায় হারিয়ে গেল। খুঁজে পেলাম না।

দেখা অবশ্য হল আর এক প্রকাশকের দোকানে। গিয়ে দেখলাম, প্রকাশকের পাশে একটি দীর্ঘদেহ লোক বসে আছেন। প্রস্থও উপেক্ষার নয়। মাথায় খুব ছোট ছোট চুল। সাধারণ পোশাক। মনে হল উনবিংশ শতাব্দীর এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছবি। তাঁর পাশে স্যুটপরিহিত একটি তরুণ।

আমি গিয়ে বসার একটু পরেই প্রকাশক তাঁদের দুজনকে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রকাশকের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচয় ছিল। কর্মপন্থার সঙ্গেও। যখনই কোন গোপনীয় কথার প্রয়োজন হত, তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে, ভদ্রলোক প্রথম ব্যক্তিকে বলতেন, আসুন এদিকে।

অতঃপর বাইরে দাঁড়িয়ে গোপনীয় কথা শেষ হত। এমনকি কোন লেখকের কত বই বিক্রি হয়েছে, তা পর্যন্ত অন্য লেখকের সামনে কদাচ উত্থাপন করতেন না। বুঝলাম বারান্দায় সেরকম কোন ব্যাপারই চলছে।

এই প্রকাশনার মাধ্যমে স্কুল-কলেজের বহু পাঠ্যপুস্তকও প্রকাশিত হত। সেই সূত্রে অনেক স্কুল-শিক্ষক, অধ্যাপকেরও সমাগম হত। আমার নিশ্চিত ধারণা জন্মাল, ধুতি-পাঞ্জাবী-পরিহিত ভদ্রলোকটি কোন স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক, কিংবা কলেজে দেবভাষার অধ্যাপনা করে থাকেন, তাঁর সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল রইল না।

প্রকাশকের সঙ্গে তাঁরা ফিরে এলেন। গোপন কথা শেষ করে। আমি প্রকাশকের টেবিলে রাখা গুটিকয়েক বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, হঠাৎ একটি কথা কানে যেতেই চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

আপনি ভাগলপুরে ফিরছেন কবে? প্রকাশকের প্রশ্ন।

ভাগলপুরে বনফুল থাকেন, শুনেছিলাম। আড়চোখে, ভদ্রতা বজায় রেখে যতটা সম্ভব, ভদ্রলোককে দেখছিলাম। প্রকাশক বোধহয় আমার এই কৌতূহলটুকু লক্ষ্য করে থাকবেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ নেই?

আমি ঘাড় নাড়লাম। নেতিবাচক।

ইনি বনফুল।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে প্রণাম করলাম। ভদ্রলোক দু হাতে আমাকে বুকে চেপে ধরে প্রকাশককে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি?

প্রকাশক পরিচয় দিলেন।

বনফুল পাশের তরুণটির দিকে চেয়ে বললেন, এর কথাই তো আজ বাড়িতে হচ্ছিল।

তরুণটি, পরে জানলাম তিনি বনফুলের পুত্র, আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনার 'চিহ্ন' গল্পটির মা খুব প্রশংসা করছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার দোল সংখ্যায় ওই নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। বৃদ্ধ মৃত স্বামীর দেহ আগলে বৃদ্ধা পত্নী বসে আছেন। দেহের ব্যবস্থা করতে লোক গেছে। তারা ফিরে না আসা পর্যন্তই সময়। এই সময়টুকু স্ত্রী একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন মৃত স্বামীর দিকে। মাঝে মাঝে স্পর্শ করে দেখছেন। অলীক কল্পনা করছেন, হয়তো মানুষটা জেগে উঠবে। প্রথম যৌবন থেকে শুরু করে পরমায়ুর শেষদিন পর্যন্ত সামান্যতম ঘটনার ছবিও বৃদ্ধার চিত্তপটে প্রতিফলিত হচ্ছে।

তিনি ভাবতে লাগলেন, স্বামীর দেওয়া কোন চিহ্ন তো তার নেই। শাঁখা, সিঁদুর, লালপাড় শাড়ি স্বামীর আয়ুর প্রতীক এখনই সরিয়ে নেবে সবাই। বর্ণহীন থান পরিয়ে দেবে। শুরু হবে ক্লিষ্ট বিধবার জীবন। স্বামীর স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেবার মত কি রইল তাঁর শরীরে!

হঠাৎই তাঁর মনে পড়ল, কিছুদিন আগেই রাগের মাথায় পীড়িত স্বামী ওষুধের গ্লাসটা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তাঁর দিকে। আঘাত লেগে কপালের অনেকখানি কেটে গিয়েছে। সেই দাগ তো রয়ে গেছে।

বৃদ্ধা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলেন। ঠিক বুঝতে পারলেন না। তখন ধীরে ধীরে উঠে আয়নার সামনে গিয়ে বসলেন। ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে খুঁজতে লাগলেন চিহ্নটি। না, কোথাও নেই। হাজার বলিরেখার মধ্যে চিহ্নটি কোথায় হারিয়ে গেছে। বয়স যেমন এক এক করে সব কিছু সরিয়ে নিয়েছে তাঁর কাছ থেকে, তেমনি স্বামীর দেওয়া শেষ চিহ্নটিও অবলুপ্ত করেছে।

এই কাহিনীটি বললাম এই কারণে, এটি আমার চোখে-দেখা একটি ঘটনা। একরাত্রে বাড়ি গিয়ে শুনলাম, আমার একটি বৃদ্ধ প্রতিবেশী মারা গিয়েছেন। ছুটে গেলাম। দেখলাম তাঁর মৃতদেহ আগলে তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী বসে আছেন। নিষ্পলকনেত্রে চেয়ে আছেন স্বামীর দিকে, একটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে আছেন। কোন চেতনা নেই। বাহ্যজ্ঞানরহিত।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম। শুনেছিলাম ভদ্রমহিলার যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স নয়, স্বামীর বয়স পনেরো। আজ মহিলার বয়স প্রায় পঁচাত্তর। এতদিন ধরে মাধবীলতার মতন যে সহকার তরুটিকে বেষ্টন করেছিলেন, তার আয়ুশেষ। অসহায়, ক্লান্ত, সর্বস্ব হারানোর সেই ছবিটি দেখতে দেখতে গল্পটি মনে এসেছিল।

বনফুল কলকাতার বাসার ঠিকানা দিলেন। ভাগলপুরে যদি যাওয়ার সুযোগ হয়, নিশ্চয় যেন দেখা করি। সেই একদিন। তারপর আর দেখা হয় নি বনফুলের সঙ্গে।

ছাদে ডেকচেয়ার পেতে শুয়ে আছি। মাথার ওপর নির্মেঘ অনন্ত আকাশ। নক্ষত্র আকীর্ণ। নক্ষত্রের জাল যেন ছড়ানো রয়েছে অসীম নীলে। মানুষ যেমন চিনি না, তেমনি গ্রহ-নক্ষত্রও চিনি না। ওরা অনেক দূরের কেউ ভাবতে ভাল লাগে না। তাই জানতে চাই না, কোনটা পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা। একই তারা প্রদোষে সন্ধ্যাতারা হয়ে ভোরের শুকতারা হয় কি না, সে তথ্য উদ্ঘাটনে বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই। সন্ধ্যাবেলার চামেলীই ভোরের বেলার মল্লিকা কি না, তাতে আমার উৎসাহ কম।

শুয়ে শুয়ে ভাবি। নিজের জীবনের গতি-প্রকৃতি, নিজের জীবনের রহস্য।

কয়েকমাস আগে 'দেশ' পত্রিকায় গিয়েছিলাম। দেখলাম এক অতি দীর্ঘ-দেহ ভদ্রলোককে ঘিরে গল্পের আসর বসেছে। তিনি

বলছেন, অপরূপ ভঙ্গীতে। আর সকলে শুনছেন। মুখের কথা নয়, যেন পাতার পর পাতা লেখা গল্প পড়ে যাচ্ছেন। সেই ভাষা, সেই ভঙ্গী। একই বিস্ময় আর মোহ নিয়ে শ্রোতারা শুনছেন।

পরিচয় দেবার আগেই বুঝলাম কথক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচয়ও হল। 'বেতার জগৎ'-এ একটা অতি সাধারণ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, শরদিন্দুবাবুর জানি না কেন, সে গল্পটি খুব ভাল লেগে গেছে।

পাছে তাঁর কাহিনী বন্ধ হয় বলে বাধা দিলাম। বললাম, গল্প থামাবেন না।

তিনি থামালেন না। প্রায় দেড়ঘণ্টা পর পাশের ভদ্রলোকটি তাঁকে কোথায় যাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। শরদিন্দুবাবু হেসে বললেন, তুমি তো কখন থেকে কনুইয়ের গুঁতো দিচ্ছ, কিন্তু আমি এ চাঁদের হাট ফেলে যাই কি করে! আমাদের পরে এরাই তো আসছে।

যুগ যুগ ধরে তাই চলেছে, জীর্ণ, শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডের মধ্য থেকে নতুন উদ্ভিদ জেগে ওঠে, পুরোনো মানুষের পরিবর্তে নতুন প্রাণ, নতুন প্রেরণা, নতুন উদ্দীপনা।

নক্ষত্র-জগতেও কি তাই হয়। আবার ওপরে চেয়ে দেখলাম। নীলাম্বরীতে অজস্র চুমকির মতন ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য নক্ষত্র।

চেয়ে চেয়ে দেখলাম একটা দীপ্তি কক্ষচ্যুত হল। শিথিল হল নক্ষত্রের জালের একটা গ্রন্থি। পুরোনো নক্ষত্র খসে গেল, হয়তো নতুন নক্ষত্র আসবে সেখানে।

এই নক্ষত্রের রাশ শুধু সৌরজগতের কয়েক মুঠো আলো, কিছু দীপ্তি, কিছু ভস্ম ভাবতে ভাল লাগে না। মনে হয়, ওরা পৃথিবীর লোকান্তরিত আত্মা। সারাজীবন যারা পৃথিবীর মানুষকে আলো দেখিয়েছে, পথ দেখিয়েছে, নিজেদের প্রতিভার দীপ্তিতে মানুষকে নবজীবনের সন্ধান দিয়েছে, মরদেহ পরিত্যাগ করার পরেও বুঝি

তারা স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে নি। তাই নক্ষত্র হয়ে ফুটে উঠেছে আকাশে। আলো দেখাতে মানুষকে, দিক্‌ভ্রান্ত নাবিককে পথের নির্দেশ দিতে।

সাহিত্যিকরাও কি নক্ষত্র হবে? আলো দেখাবে, ভুল পথ থেকে মানুষকে ফেরাবে, যুগ যুগ ধরে।

নইলে আর কি হতে পারে সাহিত্যিকরা? আর কি তাদের কাম্য?